কলিকাতার ইতিহাস

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর-এর
The Early History and Growth of Calcutta
অবলম্বনে—ইংরেজী-বাংলা অভিধানের সংকলক
শ্রী সুবল চন্দ্র মিত্র
সঙ্কলিত

সপ্তর্ষি

সপ্তর্ষি
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশকের কথা

বছর কয়েক আগে বিনয়কৃষ্ণ দেবের Early History and Growth of Calcutta—আবার ছাপা হয়ে বেরিয়েছে। আমরা শুনেছিলাম এই বইয়ের বাঙলা অনুবাদও ছাপা হয়েছেল। বিনয়কৃষ্ণের এই রচনা কলকাতার ইতিহাস জানার পক্ষে অপরিহার্য। পরবর্তীকালে আরও বই লেখা হয়েছে কলকাতা নিয়ে। কিন্তু বিনয়কৃষ্ণ কলকাতার যে সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরেছিলেন, পুরনো হয়ে গেলেও, আজও তা গুরুত্ব হারায়নি। সেকারণে বাঙলা সংস্করণের পুনর্মুদ্রণের জন্য আমরা বইটির খোঁজ করতে থাকি। এ সময়ে সাহিত্যক শ্রীশ্যামল গঙ্গো-পাধ্যায় আমাদের বইটি সংগ্রহ করে দেন। বইটি ছিল শ্রীকমল চৌধুরীর কাছে। তিনিও বেশকিছুকাল কলকাতা নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁর একটি দীর্ঘ রচনা বর্তমান সংস্করণের ভূমিকা হিসাবে ব্যবহার করা হল। প্রাচীনকাল থেকে সম্প্রতিকালের কলকাতার একটি রেখাচিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। আমাদের আশা, কলকাতা সম্পর্কে উৎসাহী পাঠক ও গবেষকদের কাছে এই সংস্করণটি সমাদৃত হবে। বইটিকে বর্তমান সময়োপযোগী করার জন্য ভূমিকাংশে বেশ কিছু নতুন তথ্য দেওয়া হয়েছে।

সূচি ঃ

[৩৩নং পৃষ্ঠায় মুদ্রিত টাইটেলটি ১৩১৪ সালে মুদ্রিত মূল গ্রন্থের টাইটেলের অনুকরণে]

ভূমিকা

'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহানগরী কলকাতা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন :

'আজব শহর কলকেতা।
রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি
মিছে কথার কি কেতা।
হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে
বলিহারী ঐক্যতা।"

তারপর কলকাতা অনেকখানি পথ পরিক্রমা করেছে, অনেক জল গড়িয়ে গেছে। রাজনীতি ও অর্থনীতির টানাপোড়েনে কলকাতার রূপবদল ঘটেছে। সেদিন সারা ভারতের মধ্যে কলকাতার ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। জীবন ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছিল। শহর এগিয়ে চলেছিল নতুন সত্যের সন্ধানে। এমন কোন মানুষ ছিল না এই শহরে যারা সেদিনের সাংস্কৃতিক ভাঙা-গড়ার পালায় অংশীদার ছিল না। বহু মানুষের ত্যাগ ও শ্রমের বিনিময়ে জন্ম এই শহরের। প্রতিটি বাঙালী সেদিন গড়ে তুলেছিল এই শহরকে। এই শহর সৃষ্টি ইংরেজের নয়—তারা প্রভুত্ব করেছিল ঠিকই ; কিন্তু রাজমিস্ত্রীর কাজের ভূমিকা ছিল বাঙালীর।

কেবলমাত্র পশ্চিমবাঙলার রাজধানী নয়, পূর্বাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র শহর কলকাতা অতুলনীয়। এমন দেশের লোক নেই, যাদের দেখা যাবে না কলকাতায়। এমন কোন দেশের জিনিস নেই, যা পাওয়া যায় না এখানে। বেশী দামে মোটা লাভে যে-কোন জিনিস এখানে বিক্রি হবেই। যে-কোন রকমের কাজ একটা জুটে যাবেই। কলকাতায় কাজের খোঁজে এসে ফিরে গেছে, এমন মানুষ বিরল। পৃথিবীর অন্যতম এই মহাগরীতেই সম্ভবতঃ পাওয়া যায় টাটকা শাক-সব্জি।

কলকাতা কলকাতাই। কলকাতা ও হাওড়া গঙ্গার দুকূলে গড়ে-ওঠা দুই জনপদ। মাত্র তিন শ বছরের শহর। অথচ এমন ঝরঝরে জরাজীর্ণ আর পঙ্গু শহর খুঁজেও পাওয়া কঠিন। প্রায় পাঁচশ বর্গ মাইলের এই বিস্তৃত অঞ্চল—ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডিস্ট্রিক্ট নানাসমস্যায় জর্জরিত। বিপুল আয়তন, সম্পদ প্রাচুর্য, কর্মচঞ্চল এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সত্ত্বেও মহানগরী কলকাতা সংকটের শহর হয়েই আছে। এই মেট্রোপলিটন কমপ্লেক্সের মানুষ অনন্ত সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। শহরের লক্ষ মানুষ রাস্তায় আর বস্তিতে রাত কাটায়। রোগের আক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে গ্রাস করে শহরকে।

শহরতলীর লক্ষ লক্ষ মানুষ আসছে প্রতিদিন জীবিকার সন্ধানে। সেই সঙ্গে আছে ভিন রাজ্যের মানুষের দল। পানীয়জলের অভাব, ময়লা জল ও আবর্জনার স্তূপ, স্কুল-হাসপাতাল-পার্ক জনাকীর্ণ। খোলাজায়গা নেই, ব্যাপক বেকার সমস্যা, জনাকীর্ণ ও সঙ্কীর্ণ রাস্তা। অচল পরিবহণ ব্যবস্থা, বাসযোগ্য বাড়ির অভাব, বস্তির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। ক্রমবর্ধমান জমির দাম ও ভাড়া, বাজার করার হাজার ঝামেলা, নিত্য লোডশেডিং-এ বিপর্যস্ত অর্থনীতি ও জনজীবন—সব মিলিয়ে কলকাতা মানেই সমস্যা। যেখানে রয়েছে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের পর্বত-প্রমাণ ঘাটতি।

রাজ্যের অর্ধেকের বেশি হাসপাতাল এই শহরে—কিন্তু সমগ্র পূর্ব ভারত তার ওপর নির্ভরশীল। ফলে মহানগরীর নিজস্ব স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। এক-তৃতীয়াংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা পায় না। গত দু'শ বছরে সমস্যা সমাধানের অনেক কমিটি হয়েছে। কাজ হয়নি। যা হয়েছে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে—ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যায় তা অপরিযাপ্ত। যা ছিল তার সুষ্ঠু সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণও ঘটেনি; এমন কি জনবৃদ্ধি ঘটলেও বাসযোগ্য জমির বিকাশ ঘটেনি। জমির সংকট বেড়েছে। অর্থনীতি ও জীবনধারণের মান বিপযস্ত। শহর বিকাশে বিভিন্ন প্রবাহে ছিল না সামঞ্জস্য। ফলে নগরবাসের উপযোগী সুযোগ-সুবিধা অবশিষ্ট থাকল না। পূর্ব ভারতের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র—বাঙালী সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছে ধ্বংসের পথে।

রাস্তার ধারে ফেলে-রাখা আবর্জনার স্তূপ। ছেড়া ময়লা কাপড় জড়ান ভিখিরির দল খাবার খুটে খাচ্ছে। বিয়েবাড়ির ফেলে-দেওয়া পাতা কুড়িয়ে খেতে জমে শত শত কাঙালী। রাস্তার ধারের ময়লা জলে বস্তির মেয়েরা মাথা ঘসছে, শিশুদের স্নান করাচ্ছে, খাওয়ার বাসন ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রকাশ্য রাস্তার ধারে বসে প্রস্রাব করা সরকারী আইন করেও বন্ধ করা সম্ভব হয়নি—ফুটপাথ উপচে পড়ছে দোকান-পাটে।

জনসংখ্যার স্ফীতি, শহরের অ-পরিকল্পিত বিস্তার, খোলাজায়গার অভাব, যানবাহনের ঘাটতি, শহরের কেন্দ্রস্থলে ব্যবসা ও শাসন-কেন্দ্র এবং আরো নানা কারণে শহরের স্বাস্থ্যকে জটিল করে তুলেছে। ইংরেজ আমলে কলকাতার বিকাশ ঘটেছিল ব্যবসাকেন্দ্র হিসাবে। ব্যবসার প্রসার ঘটেছে, আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় হয়েছে। য়ুরোপীয় বণিকরা এসে জমা হয়েছে। সেই সঙ্গে জীবিকার সন্ধানে এসেছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ। ১৯৪১ খ্রীঃ যেখানে কলকাতার জনসংখ্যা ছিল ৪৩ মিলিয়ন, পরের তিন দশকে তার সঙ্গে যোগ হল আরও চার মিলিয়ন। এই শতকের শেষে বেড়ে হবে ১০ মিলিয়ন।

জবচার্ণক ১৬৯০ খ্রীঃ কলকাতায় এলেন। তখনকার কলকাতায় লোক ছিল কত! কোন হিসেব নেই। অনুমান করা যায়, দু' তিনশ হতে পারে। তাও সুতানুটি, কলকাতা, গোবিন্দপুর—এই তিনটি গ্রাম মিলিয়ে। পাঁচশ বছর পরে।

১৭১৬ খ্রীঃ শহরে লোকসংখ্যা হল বার হাজার। সিরাজ কলকাতা আক্রমণ করলেন ১৭৫৬ খ্রীঃ। শহরে তখন চার লক্ষ মানুষের বাস। কোনটাই তথ্য-ভিত্তিক নয়। অনুমান মাত্র। কলকাতায় ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপনের পর থেকেই আকারে বাড়ছিল। মাত্র ত্রিশ বছরেই আয়তন দাঁড়ায় ১,৬৯২ একর—গোবিন্দপুর থেকে সুতানুটি এবং হুগলির তীর থেকে সল্টলেক। ব্যবসায়ীরা আসছিল। শহর গড়ে উঠছিল ভালভাবে। কলকাতার তখন দুটো ভাগ। সাহেবপাড়ায় সাজান বাগান। গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক অর্থাৎ ডালহৌসি স্কোয়ার ঘিরে ওরা ব্যবসা চালাত। চৌরঙ্গীতে ছিল তাদের বাড়ি-ঘর চোখ খুলে দেখার মত। ব্ল্যাক টাউনে দেশীয়দের আস্তানা।

শহর গড়ে উঠেছিল অপরিকল্পিত ভাবে। এমনভাবে মানুষের বসতি গড়ে ওঠে যে রোগের প্রাদুর্ভাব বা ম্যালেরিয়া তো লেগেই ছিল। মানুষের চাপ বাড়ছিল। ফলে কলকাতার আয়তনও ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়ে পড়ছিল। সতের শতকের শেষে চব্বিশ পরগনা ও পঞ্চাশটি গ্রাম অন্তর্ভুক্ত হল কলকাতায়। উনিশ শতকের শেষে কলকাতার আয়তন হল প্রায় আঠারো বর্গমাইল অর্থাৎ ১১,৯১৪ একর। ১৮৭২ খ্রীঃ প্রথম লোকগণনায় দেখা গেল শহরে ছয় লক্ষ তেত্রিশ হাজার মানুষ এসে গেছে। পঞ্চাশ বছর পরে, ১৯১২ খ্রীঃ সেই সঙ্গে জুড়ে গেল আরও দু'লক্ষ তেত্রিশ হাজার। এবার কিন্তু দেখা গেল কলকাতার জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু একটি প্রবন্ধে বেশ কয়েক বছর আগে লিখেছিলেন : "...উনবিংশ আর এই বিংশ শতাব্দীতে, গ্রামীণ জনস্রোত মাঝেমাঝেই এই শহরের দিকে ধাওয়া করছে। শহরবাসের হেতুটা এক্ষেত্রে একটু আলাদা। শুধু লাভের আশায় এরা কলকাতায় আসে নি, অন্যান্য কারণও ছিল। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে আর বিংশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরে, কলকাতার কাছাকাছি জেলাগুলিতে কৃষির অবস্থা খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। বারবার দেখা দেয় ম্যালেরিয়া-মহামারী; রোগটা শেষপর্যন্ত শিকড় গেড়ে বসে। গ্রামীণ মানুষদের অধিকাংশই তখন এই মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে। এদেশে আগে যে সেচ-ব্যবস্থা ছিল, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ফাঁকোরা বার নিয়ে তার প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু সেচের সেই ব্যবস্থা ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। এইসব কারণে, যাদের সাধ্য ছিল, গ্রামাঞ্চল থেকে দলে দলে তাঁরা কলকাতায় এসে ভিড় জমাতে লাগলেন। কলকাতা তখন ক্রমেই বেড়ে উঠেছে। আগন্তুকরা তাই ভেবেছিলেন, জীবন সম্ভবতঃ এখানে আরও সহজ হবে। আর কিছু না হোক, চিকিৎসা, শিক্ষা আর চাকরি-বাকরির সুযোগ এখানে তখন গ্রামের তুলনায় অনেক বেশি। গ্রামাঞ্চলের আর্থিক স্বাস্থ্যও ইতিমধ্যে প্রায় বিনষ্ট হয়েছিল।"

দু' দুটো বিশ্বযুদ্ধ পেরিয়ে গেল। ১৯৪৭ খ্রীঃ ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তি ভারত ছাড়ল। ভাগ হল বাঙলা। সাম্প্রদায়িক কারণে পূর্বপাকিস্থানের শহর ও

গ্রামের চাষী, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য শ্রেণীর হিন্দু এসে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আশ্রয় নিতে থাকে। শহরের পার্শ্ববর্তী জলাজমি, অনুর্বর ভূখণ্ড, পরিত্যক্ত এলাকায় ভরে গেল মানুষ। শহরে তিল ধারণের জায়গা থাকল না। যার ফলে ১৯৬১ খ্রীঃ কলকাতার জনসংখ্যা হল উনত্রিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার। তখন বোম্বাই ও দিল্লীর লোকসংখ্যা ছিল যথাক্রমে সাতাশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার এবং কুড়ি লক্ষ বাষট্টি হাজার। ১৯৭১ খ্রীঃ কলকাতার পৌর এলাকায় জনসংখ্যা ছিল একত্রিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার আর বৃহত্তর কলকাতার জনসংখ্যা ছিল সত্তর লক্ষ পাঁচ হাজার। এই সময়ে বৃহত্তর বোম্বাই শহরে বাস করত উনষাট লক্ষ উনসত্তর হাজার মানুষ। কলকাতার সত্তর লক্ষ পাঁচ হাজার মানুষের মধ্যে পুরুষ একান্ন লক্ষ আঠার হাজার এবং নারী আঠাশ লক্ষ আশি হাজার। অর্থাৎ প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ছিল মাত্র সাত শত এক। এখন বৃহত্তর কলকাতার ৫৬৩ বর্গমাইল এলাকার জনসংখ্যা ৮৩ লক্ষ। ১৯৮৬ খ্রীঃ এই শহরের জনসংখ্যা হবে ১ কোটি ২০ লক্ষ। আর ২০০০ খ্রীঃ এই সংখ্যা হবে এক কোটি ষাট লক্ষ। পঁচিশ বছর পরে এই শহরের বাসস্থান পথঘাট, যানবাহন, সম্ভবতঃ কোটি মানুষের উপযোগী থাকবে না। তখন কি পরিস্থিতি দাঁড়াবে?

ভবতোষ দত্ত 'কলকাতা আজ আর আগামী কাল' নিবন্ধে কলকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধিসংক্রান্ত পরিস্থিতি আলোচনায় বলেছেন: "কোনরকম পরিসংখ্যানের মধ্যে না গিয়েও কলকাতার যে সমস্যা সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে, সেটা হল জনসংখ্যা। থাকবার বাড়ি নেই; রাস্তায় পথচারীর ভিড়ে এবং বাস-ট্রামের স্বল্পতায় চলাচল পর্যুদস্ত; দোকানপাট, কেনা-বেচা করবার জন্য স্থান নাই, তাই বাজার এসে রাস্তা দখল করেছে, এতগুলি লোকের জন্য যতটা জল, বিদ্যুৎ, প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রয়োজন, তার অভাব উত্তরোত্তর বর্ধমান। অথচ সারা পশ্চিমবঙ্গে গত তিন দশকে জনসংখ্যা যে হারে বেড়েছে, কলকাতায় বেড়েছে তার চেয়ে অনেক কম। যারা ভবিষ্যৎ দিনের হিসাব করবার চেষ্টা করেছেন, তাঁরাও বলেছেন যে, বর্তমান শতাব্দীর শেষে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ হবে। কিন্তু স্থান কলকাতাতে খুব বেশি হলেও শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশী বাড়বে না। এর কারণ জন্মহার ও মৃত্যু হারের মধ্যে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে বাসযোগ্য স্থান ও গৃহের অভাবের মধ্যে। কলকাতার জনসংখ্যা অতীতে বেড়েছে অন্য জেলা ও অন্য প্রদেশ থেকে কর্মপ্রার্থীর আগমনে এবং উপরন্তু সাম্প্রতিককালে পূর্ববঙ্গের শরণার্থীর স্রোতে। কিন্তু কলকাতায় কাজ নেই, থাকবার জায়গা নেই—এটা প্রকট হয়ে উঠছে। বহুতল বাড়ি তৈরী হলে যাদের সমস্যা মিটবে, সেই উচ্চ কোটির ধনবানের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে খুবই কম। একথাও মনে রাখতে হবে যে কলকাতার আর্থিক উন্নতির গতি যদি বিঘ্নিত হয়, তাহলে বিলাসবহুল বাসস্থানের চাহিদাও কমে যাবে।

"কলকাতার সঙ্গে যদি আশে-পাশের শহর-গ্রামগুলিকে একত্রে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে এই বিস্তীর্ণতর এলাকার জনসংখ্যা অবশ্য বাড়ছে দ্রুতগতিতে। সারাদিন ধরে ট্রেনে বা বাসে কয়েক লক্ষ লোক কলকাতাতে আসে কাজ করতে বা কাজের খোঁজে এবং সন্ধ্যায় তারা ফিরে যায় তাদের 'শয়নগৃহ' কাছাকাছি গ্রামে বা শহরে। কলকাতায় রাতের জনসংখ্যার চেয়ে দিনের জনসংখ্যা অনেক বেশি। রাতের জনসংখ্যা থেকে বাসস্থানের উপরে চাপ পড়ে; দিনের জনসংখ্যা থেকে চাপ পড়ে রাস্তাঘাট, যানবাহন, জল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি অনেক কিছুর উপরে। এই বিরাট চাপবহনের ক্ষমতা বর্তমানের কলকাতার নেই, ভবিষ্যতে থাকবে কিনা সেটা নির্ভর করে পরিকল্পনার প্রকৃতি ও গতির উপর।

কয়েকবছর আগে সি.এম. ডি.এ-র প্রাক্তন সেক্রেটারি কে. সি. শিবরাম কৃষ্ণাণ লিখেছিলেন: "...বৃহত্তর কলকাতায় বছরে গড়পড়তা দু লক্ষের বেশী লোক বাড়ছে। একথাটা প্রায়ই উপলব্ধি করা হয় না যে, কলকাতা পশ্চিম বা উত্তর ভারতের বোম্বাই বা দিল্লীর মত নয়। ওই অঞ্চলগুলিতে পুণা, আমেদাবাদ, নাগপুর, অথবা কানপুরের মত বড় বড় শহর বিকল্প হিসাবে বোম্বাই অথবা দিল্লীর ভার অনেকখানি লাঘব করতে পারে। কিন্তু পূর্বাঞ্চলে ৮০ লক্ষ অধিবাসী নিয়ে কলকাতাই একমাত্র বৃহত্তম মহানগরী, যার অনুরূপ বিকল্প শহর নেই। পূর্বাঞ্চলে কলকাতার পরই দ্বিতীয় স্থান পাটনায়—যার লোকসংখ্যা পাঁচ লক্ষ। কলকাতার লোকসংখ্যা বাড়তে বাড়তে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা হ্রাস পেয়ে এখন মুমূর্ষু দশায় উপস্থিত।"

এই দুর্দশাগ্রস্ত শহরটাকে বাঁচাবার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৬১ খ্রীঃ গঠিত হয় ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন—যাকে সংক্ষেপে বলব সি. এম ডি. এ। কিন্তু তাদের কর্মতৎপরতা খুব বেশী দূর এগোতে পারল না নানা কারণে। ১৯৭০ খ্রীঃ গঠিত হল ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেণ্ট অথরিটি। অবশ্য ততদিনে জাতীয় নেতারা কলকাতাকে বাঁচাতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন। এই বছর থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে সি. এম. ডি. এ কলকাতার যানবাহন ও পরিবহণ উন্নয়ন, পানীয় জল সরবরাহ, জঞ্জাল অপসারণ, জল নিষ্কাশন, পয়প্রণালীর ব্যবস্থা, বস্তি সংস্কার ও নানাবিধকাজে হাত দিয়েছে। অথচ সি. এম. ডি. এ যখন বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়ণের কাজে হাত দিয়েছিল, তখন নাগরিক জীবনে নেমে এসেছিল বিপর্যয়। আজ আর কাউকে বলতে হয় না, কলকাতার ওপর দিয়ে বেশ একটি রূপান্তরের ঝড় চলছে তা স্পষ্ট। আর শহর উন্নয়ণের সঙ্গে চলেছে সমগ্র পশ্চিম বাঙলারই রূপান্তরের প্রয়াস। কলকাতা বেঁচে থাকলে বেঁচে থাকবে পশ্চিমবাঙলা। আর গোটা বাঙলাই হল কলকাতার প্রাণশক্তি। কলকাতার উন্নতি যত ঘটবে, এই শহরে কিন্তু তত লোকের ভিড় বাড়বে। পশ্চিমবাঙলার বিভিন্ন শহরের আধুনিকীকরণ ঘটিয়ে সব রকম সুযোগ-সুবিধা বাড়ালে কর্মের সুযোগ ও বিনোদনের সুব্যবস্থা ঘটালে

তবেই সে-সব শহর মানুষকে আকৃষ্ট করবে। সবই ছুটবে না শহর কলকাতায়

কলকাতা কত পুরানো

ইংরেজ আমলের অনেক আগে কলকাতা ছিল নদীয়া জেলার সামান্য একটি জল-অধ্যুষিত পল্লীগ্রাম। বাস করত বেশ কয়েক ঘর মৎসজীবী ও কৃষিজীবী। কুঠিয়াল জব চার্ণক সুতানুটীতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠী স্থাপন করার সনদ পান ১৬৯০ খ্রীঃ। এই সুতানুটী বর্তমানকালের হাটখোলায় রূপান্তরিত হয়েছে। ১৬৯৮ খ্রীঃ কোম্পানি আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম উস-শানের কাছ থেকে তিনখানি গ্রাম কেনার অনুমতি পায়। সুতানটী, কলকাতা ও গোবিন্দপুর—ভাগীরথী নদীর পূর্ব পারে এই তিনটি গ্রামের আয়তন ছিল উত্তর-দক্ষিণে প্রায় তিন মাইল এবং পূর্ব পশ্চিমে প্রায় একমাইল। বর্তমানের চিৎপুর, বাগবাজার, শোভাবাজার ও হাটখোলা ছিল সুতানুটী নামে পরিচিত; ধর্মতলা, বহুবাজার, মির্জাপুর, সিমলা, জানবাজার প্রভৃতি অঞ্চল ছিল কলকাতার অন্তর্ভুক্ত। আর হেষ্টিংস, ময়দান ও ভবানীপুর অঞ্চল জুড়ে ছিল গোবিন্দপুর গ্রাম। কোন্ সময় সুতানুটী ও গোবিন্দপুরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে কলকাতা রূপে পরিগণিত হল, তা নিশ্চয় করে বলা দুষ্কর। এই নামকরণের সম্ভাবিত কারণ সুতানুটী-ও গোবিন্দপুরের তুলনায় কলকাতায় বিদেশীরা বেশী সংখ্যায় বসতি স্থাপন করে; যে কারণে কলকাতার নাম প্রাধান্য পায়

কলকাতার মধ্য দিয়ে তখন ছিল দুটি বড় খাল। একটি চৌরঙ্গীর মধ্য দিয়ে ধাপায় গিয়ে পড়েছিল। কলকাতার মাঝামাঝি গঙ্গায় যে খাড়িটি পূর্ব মুখে গিয়েছিল, সেটি আজ বিলুপ্ত।

গড়ের মাঠের পশ্চিমে নেপিয়ার মূর্তির কাছে একটি বেঞ্চ মার্কে খোদিত আছে কলকাতার ঐ অঞ্চল সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে মাত্র কুড়ি ফুট উঁচু। প্রাচীন কালীক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। গঙ্গার তীরভূমি পূর্বে ও দক্ষিণে ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে এক নীচু জলাভূমির সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছিল। বহু আগে এ বিলগুলি ছিল পশ্চিমে বিস্তৃত। তখন কয়েকটি খাল গঙ্গার তীর থেকে এসে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে পড়ত বিলগুলির মধ্যে। বর্তমান শিয়ালদহ স্টেশনটি একটি বিলের মধ্যে ছিল ছোট দ্বীপের আকারে। ওখানে একটি বেঞ্চ মার্কে লেখা ছিল কুড়ি ফুট উচ্চতা। জলা অঞ্চলগুলি ধীরে ধীরে পূর্ব দিকে সরে গিয়ে গড়ে উঠেছে জনবসতি। চিৎপুরের খালগুলি বুঁজিয়ে দিয়ে গড়ে ওঠে রাস্তা। যেমন শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে ক্রীক রো। আগে ওখানে ছিল একটি ক্রীক বা খাল।

কলকাতা সুদৃঢ় মাটির ওপর গড়ে ওঠে নি। অতীতে ছিল প্রাচীন

সমুদ্রোপকূল। কোন প্রস্তরময় ভূ-খণ্ড বা পাহাড় ছিল কাছেই। পাথরের টুকরো বহন করে নিয়ে যেত নদীগুলি। যার সন্ধান মেলে কলকাতার ভূনিম্নে। ময়দানে পুকুর কাটার সময় চার বা পাঁচ ফুট নীচে মৃত সুঁদরী গাছকে সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। ব্যাপকভাবে জমি বসে যাওয়ার ফলেই এমন ঘটেছে। ফোর্ট উইলিয়মে পাঁচশত ফুট গভীর কুয়া খননকালে এমন কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে, যা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কলকাতার ভূ-পৃষ্ঠ অন্ততঃ পাঁচশত ফুট নীচে বসে গেছে ধীরে ধীরে। যে-সব উপাদান পাওয়া গেছে ভূনিম্নে, তার ভূ-পৃষ্ঠের ওপরেই অবস্থিতি সম্ভব।

সতেরো শতকে গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত মহানগরী কলকাতার পত্তন ইংরেজ আমলে হলেও, গৌরবে পৃথিবীর বৃহত্তম শহরগুলির মধ্যে অন্যতম। শহরটির দ্রুত উন্নয়নের মূলে রয়েছে এর অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থান। গাঙ্গেয় উপত্যকার দ্বারস্বরূপ হওয়ায় ইংরেজ আমলে বহির্বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলকাতারও সমৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ক্রমে কলকাতা ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রে পরিণত হয়। বাঙলা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে মানুষ অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে এসে বসবাস করতে থাকে কলকাতায়। ভারতের অন্যান্য বাণিজ্যপ্রধান অঞ্চলের সঙ্গে গড়ে ওঠে কলকাতার সংযোগ। বাঙালী জীবনের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয় কলকাতা।

জব চার্নক ১৬৯৪ খ্রীঃ সুতানুটিতে পদার্পণ করার আগে কলকাতার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। পাঞ্জাবী ভাষায় লেখা গুরু নানকের জীবনী থেকে জানা যায় যে, ১৫০৩ খ্রীঃ নানক কলকাতায় এসেছিলেন। নানক ভারত পরিক্রমা কালে এখানে আসেন। যে জায়গায় বসে তিনি বিশ্রাম ও ধর্মপ্রচার করেছিলেন, সেই জায়গাটি ১৬৬৬ খ্রীঃ গুরু তেগ বাহাদুর স্থানীয় এক জমিদারের কাছ থেকে কিনে নেন এবং সেখানে বড় শিখ সঙ্গত গুরুদ্বার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫০৩ খ্রীঃ নানক এসে ধর্মপ্রচার করেছিলেন, সে যুগে তার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। জায়গাটি হ্যারিসন রোড (এখন মহাত্মা গান্ধী রোড) ও চিৎপুর রোডের মোড়ের কাছে। প্রাচীন যুগে এ জায়গার নাম কলকাতাই ছিল।

আইন-ই-আকবরী ১৫৮৫ খ্রীঃ রচিত। তার মধ্যে আবুল ফজল সাতগাঁও সরকারের মধ্যে কলকাতা পরগনার উল্লেখ করেছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে কলকাতা অথবা ক্যালকাটার নাম নেই, কলকাত্তার উল্লেখ আছে। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের অধিবাসীরা কলকাতাকে কলকত্তা রূপেই উচ্চারণ করে। ১৫৬০ খ্রীঃ ফান ডেন ব্রোক নামে একজন পর্তুগীজ বণিক্ একখানি মানচিত্র এঁকেছিলেন। তাতে ভাগীরথীর পূর্বতীরে ক্যালকাটা বন্দরের নাম স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে।

ষোড়শ শতকের শেষ দশকে রচিত মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের অনেকগুলি

পুঁথিতে ও ছাপা সংস্করণে পাওয়া যায় :

ধালিপাড়া মহাস্থান কলিকাতা কুটিলাস
দুই কূলে বসাইয়া বাট।
পাষাণে রচিত ঘাট দুকূলে যাত্রীর নাট
কিঙ্করে বসায় নানা হাট॥
ত্বরায় বহিছে তরী তিলেক না রয়
চিৎপুর শালিখা সে এড়াইয়া যায়,
কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা
ডাইনে ছাড়িয়া যায় হিজলীর পথ
রাজবংশ চিনিয়া লইলা পারাবত
বালুঘাট এড়াইল বেনের নন্দন
কালীঘাটে গিয়া ডিঙি দিল দরশন।

জবচার্ণক কলকাতার মাটিতে পদার্পণ করবার তিনবছর আগে লেখা কৃষ্ণদাসের নারদ পুরাণে গ্রন্থশেষে কবি আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন : "সুবর্ণ বণিককূলে উৎপত্তি আমার।...আপনি কনিষ্ঠ (ভ্রাতা) মোর রামকৃষ্ণ নাম। সাকিম কলিকাতা বহুবাজারেতে গ্রাম। দশ দশ শত নিরানব্বুই সালে। মাহ জ্যৈষ্ঠ মাসে এই পুস্তক রচিলে।" অর্থাৎ চার্ণকের কলকাতা আসার আগেও যে এখানে সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ের বাস ছিল এবং এখানে বহুবাজার নামে পাড়া ছিল, এই সব তথ্য ওপরের উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

বিপ্রদাস পিপিলাই ১৪৯৫ খ্রীঃ মনসামঙ্গলে চাঁদসদাগরের বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনায় এক জায়গায় আছে :

ডাহিনে কোতর, বাহি কামারহাটি বামে।
পূবেতে আড়িয়াদহ ঘুষিড়ি পশ্চিমে॥
চিৎপুরে পূজে রাজা সর্বমঙ্গলা।
নিসিদিসিবাহে ডিঙ্গা নাহি করে হেলা॥
তাহার পূর্ব কূল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা।
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদো মহারথা॥
কালীঘাটে চাঁদ রাজা কালিকা পূজিয়া।
চূড়াখাট বাইয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া॥

বিপ্রদাসের উল্লেখ থেকে প্রমাণ হয়—পঞ্চদশ শতক থেকেই কলিকাতা একটি বিশিষ্ট জনপদ হিসাবে গড়ে উঠেছিল।

আর একজন কবি সনাতন ঘোষাল বিদ্যাবাগীশ লিখেছিলেন 'ভাষা ভাগবত'। রচনাকাল ১৬৯৮-৯৯ খ্রীঃ। তিনি লিখেছেন :

কলিকাতা ঘোষালবংশে কৃষ্ণানন্দ।
তাঁর পুত্র ভুবন বিদিত রামচন্দ্র॥
তাঁহার মধ্যম পুত্র করি শিশুলীলা।
ভাষাভাগবত বিদ্যাবাগীশ রচিলা॥

এইসব গ্রন্থে কলকাতার নাম উল্লেখ দেখে বোঝা যায় যে, জবচার্ণকের সময় কলকাতা বাঘ-ভালুকের বাসভূমি অরণ্য সমাকীর্ণ হলেও, এক সময় জনসমৃদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। আধুনিক জনবিরল সুন্দরবনের অনেক স্থান, প্রাচীন, সমৃদ্ধ ও জনবহুলতার চিহ্ন হর্ম্যাদির ভগ্নাবশেষ এবং তড়াগ আবিষ্কৃত হয়েছে। এককালে সম্ভবত কলকাতা সন্নিহিত বিস্তৃত জনপদ ধ্বংস হয়েছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে।

সম্রাট আকবরের রাজত্বের উনিশ বর্ষে একদিন সন্ধ্যার এক ঘণ্টা আগে সমুদ্রের জল আশ্চর্যভাবে বেড়ে যায়। ফলে সরকার বোগলার প্রধান নগর প্লাবিত হয়েছিল। সরকার বোগলা অর্থাৎ বাকলা বর্তমান বাখরগঞ্জ, সুন্দরবন এবং ঢাকার দক্ষিণ সীমার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। বোগলার রাজা পালিয়ে যান নৌকা করে। ঝড় বিদ্যুৎ বজ্র ও জলতরঙ্গ স্থায়ী ছিল ক্রমাগত পাঁচ ঘণ্টাকাল। দুই লক্ষ মানুষ ও গৃহপালিত পশু প্লাবনে প্রাণত্যাগ করে। সম্ভবত এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কলকাতা পরিণত হয়েছিল অরণ্যাঞ্চলে।

কলকাতা নাম

গোবিন্দপুর-সুতানুটি ও ডিহি কলকাতা—এই তিন নিয়ে শহর কলকাতা। কিন্তু ঐ তিনটি নামের মধ্যে কেন কলকাতাকেই পছন্দ করেছিলেন সাহেবরা, আর কলকাতা শব্দটা এলই বা কি করে, তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মত বিরোধের সীমা নেই। এযাবৎ প্রায় ছয় রকম মতামত পাওয়া গেছে। এখানে তা উল্লেখ করা হল সংক্ষেপে।

(১) কলিচুন থেকে কলকাতা নামের উৎপত্তি। এই মতের অনুসারীরা বলেন যে, আগে নতুন নগর বা তার পার্শ্ববর্তী স্থানে বহুল পরিমাণে কলিচুন প্রস্তুত হত। তা থেকেই জবচার্ণক নগরীর নাম রেখেছিলেন কলকাতা।

(২) এক ব্যক্তি গাছ কাটছিল। জনৈক ইংরেজ পর্যটক সে সময় তাকে স্থানটির নাম জিজ্ঞাসা করে ইংরেজি ভাষায়। দেশীয় ব্যক্তি ইংরেজি জানত না। সে গাছ সম্পর্কে বিদেশী কিছু কিছু জানতে আগ্রহী ভেবে উত্তর দিল গাছটি কাল কাটা হয়েছে। সাহেব ভাবল স্থানটির নাম কালকাটা।

(৩) লং সাহেবের মতে মারাঠা খাল অর্থাৎ খালকাটা থেকে এসেছে কলকাতার নাম।

(৪) জনৈক ওলান্দাজ পর্যটকের মতে 'গলগোথা' শব্দের অর্থ নরকরোটি সমাকীর্ণ স্থান। নতুন নগরী স্থাপনের পর সেখানকার অধিবাসীরা ব্যাপকহারে মৃত্যুবরণ করে। তাদের মৃতদেহ নদীর ধারে ফেলে রাখা হত। এইজন্য য়ুরোপীয়রা স্থানটিকে বলত গলগোথা। ক্রমশঃ শব্দটি ভাঙতে ভাঙতে 'কলকাতা' রূপ পেয়েছে।

(৫) জব চার্ণক নতুন নগরী প্রতিষ্ঠা করে অদূরবর্তী প্রসিদ্ধ কালীঘাটের নামানুসারে কলকাতার নামকরণ করেন। এই মতানুসারীদের মতে কালীঘাটের কালী সুপ্রাচীন। কালীঘাট হিন্দুসমাজে প্রসিদ্ধ ছিল দীর্ঘকাল যাবৎ। সেকালে স্থানটি কালীক্ষেত্র নামে খ্যাত ছিল। কালীক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল কালীক্ষেত্র থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত। কালীক্ষেত্রে সতীদেহের কিয়দংশ পতিত হয়েছিল বলে কোন কোন তন্ত্রে দেখা যায়। মহারাজ বল্লালসেনের সময়ে কালীঘাটের অস্তিত্ব ছিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সময়েও কালীঘাটের অস্তিত্বের সন্ধান মেলে। এ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, কালীর সংস্রবে কলকাতার নামাকরণ ঘটেছে এবং মুসলমান ও ইংরেজ আগমনের আগে কলকাতার অস্তিত্ব ছিল।

(৬) জব চার্ণকের জামাতা স্যর চার্লস আয়ারের সময়ে ১৭০০ খ্রীঃ এপ্রিল থেকে কলকাতার নাম ব্যবহার করা হতে থাকে। তার আগে কোম্পানির সেরেস্তায় ব্যবহৃত হত 'সুতানুটি'। সুতানুটির নাম পরিবর্তন করার পিছনের কারণ হল, পর্তুগীজরা কালিকটে ভারতের সঙ্গে প্রথম বাণিজ্য আরম্ভ করে ঐ স্থানের দ্রব্য ভারতীয় দ্রব্য বলে বহুমূল্যে বিক্রয় করত। কলিকাতার দ্রব্যাদি কালিকটের নামে চালান দিয়ে ব্যবসায়িক সুবিধা অর্জন করা হত। কারণ রোমান হরফে দুটি বানান অনেক কাছাকাছি।

আদি কলকাতার মানুষ

মুকুন্দরাম শেঠ, কালিদাস বসাক, বাসুদেব বসাক, বারপতি বসাক এবং করুণাময় বসাক—প্রথম গোবিন্দপুর এসে বসতি করেন। এদের উত্তরপুরুষরা ছিলেন কলকাতার শেঠ বসাক সম্প্রদায় নামে পরিচিত। এঁরা বরাহনগরের তাঁতিদের কাছ থেকে বস্ত্রাদি কিনে নিয়ে বিক্রি করতেন বিদেশী বণিকদের কাছে। নবাব সরকারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ১৬৩২ খ্রীঃ গোবিন্দপুরে (যেখানে অক্টারলনি মনুমেণ্ট অবস্থিত) বস্ত্রনির্মাণ কারখানা নির্মাণ করান এবং আবাদও করেন। তাঁতিরা সুতার লুটী প্রস্তুত শুরু করেন যে স্থানটিতে, সেখানকার নাম সুতালুটী হয় ১৬৬০ খ্রীঃ মধ্যে। গোবিন্দপুরের উত্তরে হাটতলায় বা হাটখোলায় সুতার লুটী বিক্রয় হওয়ার কারণেই স্থানটি সুতালুটী হাটখোলা নামে পরিচিত ছিল।

পুরনো কলকাতার সাবর্ণ চৌধুরীদের লালদিঘির পাড়ে ছিল বিরাট কাছারী বাড়ি, যা ভাড়া নিয়ে হয়েছিল চার্ণকের গুদাম আর অফিস ঘর। পরে বাড়িটা কোম্পানি কিনে নেয়।

কামদেব গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মস্থান ছিল গোপালপুর। তিনি ধর্মকথা প্রচার করে বেড়াতেন। কামদেব ছিলেন যথার্থ পণ্ডিত। মানসিংহ তাঁর শিষ্য ছিলেন। এই সময় তিনি প্রতাপাদিত্যকে শায়েস্তা করতে বাংলার দিকে চলেছেন। কাশীতে গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি তাঁর শিশুপুত্রের সংবাদ নেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। ছেলের নাম লক্ষ্মীকান্ত। মানসিংহ তাঁকে জায়গীর দিয়ে যান। জায়গীরের পরিধি ছিল মাগুরা, খাসপুর, কলকাতা, পাইকান, আনোয়াবপুর এবং হেতেগড় পরগনার অংশবিশেষ। তাঁদের উপাধি হল চৌধুরী। লক্ষ্মীকান্তের ছেলে গৌবহরি চৌধুরী। পুত্র শ্রীমন্তকে নিয়ে তিনি দমদমার কাছে নিমতা বিরাটিতে থাকেন আর সম্রাটের খাজনা আদায় করেন। চৌধুরীদেব তখন অনেক উন্নতি, ধনদৌলতে গৃহ জমজমাট। মুর্শিদকুলি খাঁর দক্ষিণ চাকলাব রাজস্ব আদায়ের ভার পেলেন শ্রীমন্তের পুত্র কেশব চৌধুরী মজুমদার রায়। বাদশাহ দিলেন এব পর খেতাব রায়চৌধুরী। উপাধিতে ছয়লাপ।

কেশব রায়চৌধুরী দেখলেন ইংরেজদের অত্যাচার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মুর্শিদকুলি খাঁর নির্দেশ—কেউ ইংরেজদের কাছে জমি বিক্রি করতে পারবে না। তিনি তাই বিরাটি থেকে বড়িশায় উঠে এলেন। জমিদারীর মাঝখানে আস্তানা গাড়লেন। তাঁদের গোত্র ছিল সাবর্ণ। আর এই সাবর্ণ থেকেই তাঁরা হলেন সাবর্ণচৌধুরী। কালীঘাটের নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়ে হালদারদের দিয়ে পূজো করাতেন।

"কালীঘাট কালী হল চৌধুরী সম্পত্তি !
হালদার পূজক তাঁর এই তো বৃত্তি।"

বিদ্যাধরের জমিদারী হল: উত্তরে দক্ষিণেশ্বর, দক্ষিণে বেহালা। কাছারী বাড়ির সামনে কুলদেবতা শ্যামরায়ের মন্দির ছিল। শ্যামরায় বেশির ভাগ সময় থাকতেন কালীঘাটে, দোলের সময় আসতেন মন্দিরে। কাছারী বাড়ীর সামনে বিরাট পুকুর। রঙে রাঙা হয়ে যেত চারদিক। লাল হত দিঘির জল। তার থেকে হোল লালদিঘি।

অনেকে অন্য কথা বলেন। তাঁরা বলেন, লাল ইঁট দিয়ে তৈরি হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম। লাল ইঁট দিঘির জলে ছায়া ফেলে যে অপূর্ব শ্রী ফুটিয়ে তুলেছিল, তা ছিল লোকের চোখে বিস্ময়ের। বহু মানুষ আসত তা দেখতে। আদর করে তারা নাম দিল লালদিঘি।

চৌধুরীদের কাছারীতে কবিয়াল অ্যান্টনি ফিরিঙ্গীর ঠাকুর্দা অ্যান্টনি সাহেব

খাতা-লেখা নায়েব ছিলেন। অ্যান্টনি বাগান লেন তাঁরই নামে। কাছারী-বাড়ির ম্যানেজার ছিলেন রাজা নবকৃষ্ণ দেবের প্রপিতামহ রুক্মিণীকান্ত।

লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের বংশধরদের কাছ থেকে জমিদারী কিনতে ইংরেজদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। তারা ইংরেজদের কাছে গ্রামগুলি দিতে ছিল অনিচ্ছুক। স্বাভাবিকভাবে ইজারা নেওয়ার প্রয়াস ব্যর্থ হলে, ইংরেজরা গ্রামগুলির বার্ষিক আয়ের এক-চতুর্থাংশ বেশি দেওয়ার প্রস্তাব করে। তা সত্ত্বেও জমিদাররা রাজা হল না। তারা জানত ইংরেজ শক্তিশালী জাতি। প্রয়োজন কালে তাদের কাছ থেকে গ্রামগুলি ফেরত পাওয়া দুরাশা। পরিবর্তে জমিদাররা স্থানীয় অধিবাসীদের নামে গ্রামগুলি কোম্পানিকে ব্যবহার করতে দিতে পারেন। প্রয়োজনবোধে গ্রামগুলি তাদের কাছ থেকে ফেরত নেওয়া সম্ভব হবে। অসম্মত ইংরেজ কোম্পানি নবাবের শরণাপন্ন হল।

ইংরেজ কেন কলকাতায়

বহু জায়গা ঘুরে, চার্ণক কেন কলকাতায় বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন? কলকাতা সমুদ্রের অনেক কাছে। বড় বড় জাহাজ আসার কোন অসুবিধা ছিল না। হুগলিতে কিন্তু বৃহৎ আয়তনের কোন জাহাজ যেতে পারত না। বৃহৎ রাজনৈতিক গোলযোগে পড়লে, সমুদ্রে পলায়ন সম্ভব ছিল কলকাতা থেকে। কলকাতা ভাগীরথীর পূর্ব পারে হওয়ায় মোগল বা মারাঠারা সহজে আক্রমণ করতে পারবে না। তাছাড়া কলকাতা তখন জঙ্গলপূর্ণ বা জনমানবহীন ছিল না। তখন একটি ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবেও পরিচয় ছিল স্থানটির। হুগলি যাওয়ার পথে পড়ায় এখানে বিশ্রাম করত পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজ ব্যবসায়ীরা। এখানে খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যেত যথেষ্ট। কলকাতার পূর্বে সল্ট্ লেক থাকায় সেদিক থেকে কোন ধরনের আক্রমণের সম্ভাবনাও ছিল না। তাছাড়া হুগলির রাজনৈতিক সংঘর্ষ থেকে কলকাতা ছিল বিচ্ছিন্ন। তখন শেঠ ও বসাকরা ব্যবসায়ী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। কালীঘাট যাওয়ার পথ ধরে গ্রামের ভিতরে বহুদূর যাওয়া যায়। এসব বিবেচনা করেই নীচু ও অস্বাস্থ্যকর কলকাতাকেই চার্নক ব্যবসা-কেন্দ্র নির্বাচন করেছিলেন। বহুবাজার স্ট্রীট ও লোয়ার সার্কুলার রোডের সংযোগস্থলে একটি গাছের নীচে বসে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলতেন। বিশ্রাম নিতেন। সমগ্র আঠার শতক ধরে গাছটি ছিল। কিন্তু ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে শহর উন্নয়নের জন্য হেস্টিংসের আদেশে গাছটি কেটে ফেলা হয়।

তিন গ্রামের মালিক

কলকাতার প্রথম ইংরেজ গভর্ণর ছিলেন জব চার্নক। দ্বিতীয়বার

কলকাতায় এসে সমস্যায় পড়েছিলেন তিনি। আগেকার বাড়িগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছিল। মাটির দেওয়াল ও খড়ের চালায় বাসস্থান তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন লালদিঘির ধারে। কলকাতায় বসবাস করার জন্য এদেশীয়দের আমন্ত্রণ জানান। বহু হিন্দু মুসলমান, পর্তুগীজ ও আর্মেনীয় এসে বাস করতে থাকে। ধীরে ধীরে ব্যবসা বাড়তে থাকে। লোকও বাড়ে। সুতানুটিতে আর্মেনীয়রা আগেই এসেছিল ব্যবসার জন্য। পর্তুগীজ ও আর্মেনীয়রা এসেছিল চুঁচুড়া থেকে। আর্মেনীয়দের সাহায্যে ইংরেজরা এদেশীয়দের সঙ্গে ব্যবসা চালাত প্রথম দিকে। এজন্য তারা যথাযোগ্য নাগরিকের মর্যাদা লাভ করে এবং তাদের কয়েকজন বিত্ত ও প্রভুত্বশালী হয়ে উঠেছিল। গভর্ণর হিসাবে চার্নক ক্রমশঃ দায়িত্বহীন স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি "reigned more absolutely than a Raja, only he wanted much of their humanity, for when any poor ignorant native transgressed his laws they were sure to undergo a severe whipping for penalty and the execution was generally done when he was at dinner so near his dining-room that the groans and cries of the poor delinquents served him for music" চার্নক মারা যান ১৬৯২ খ্রীঃ ১০ই জানুআরি। চার্নকের মৃত্যুর পর অল্প দিনের জন্য কলকাতার গভর্ণর হয়েছিলেন চার্নকের সহকারী এলিথ। তৃতীয় গভর্ণর অর্থাৎ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট নিযুক্ত হন জব চার্নকের জামাতা চার্লস আয়ার। তিনি ছিলেন দক্ষ কর্মচারী।

শহরের দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে। চার্লস আয়ার ফ্যাক্টরির জন্য ও ইংরেজ কর্মচারীদের জন্য যে বাড়ি-ঘর তৈরি করেছিলেন, ১৬৯৫ খ্রীঃ ভীষণ ঝড়ে তা ভেঙে পড়ে। এই রকম পরিস্থিতিতে বাঙালাদেশে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ১৬৯৬ খ্রীঃ মেদিনীপুরে জমিদার শোভা সিং বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তার সঙ্গে যোগ দেয় উড়িষ্যার আফগান সর্দার রহিম খাঁ। বর্ধমানের রাজাকে পরাজিত ও হত্যা করে শোভা সিং দলবলসহ এগিয়ে আসতে থাকে। বিপদ দেখা দেয় হুগলি ও চব্বিশ পরগনায়। চুঁচুড়া, চন্দননগর ও সুতানুটির ডাচ, ফরাসী ও ইংরাজ ব্যবসায়ীরা বাঙলার নবাব ইব্রাহিম খাঁর শরণাপন্ন হলে তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, যে যেমনভাবে পারে আত্মরক্ষা করুক। ইংরেজরা ছিল এই সুযোগের অপেক্ষায়। ফ্যাক্টরির তিন দিকে দুর্গপ্রাকার নির্মাণ শুরু করে। দুর্গপ্রাকারের ওপর বসান হয় দশটি কামান। ইংরেজ সৈন্যরা কিছু দেশীয় লোককে সামরিক শিক্ষা দেয়। অবশ্য শোভা সিংহের বিদ্রোহে অকাল-মৃত্যু ঘটে। কিন্তু রহিম খাঁর নেতৃত্বে গঙ্গার উত্তর দিকে বাঙলার বিরাট এলাকা আফগান বিদ্রোহীদের দখলে চলে যায়। সংবাদে রুষ্ট সম্রাট আওরঙজেব ইব্রাহিম খাঁকে অপসারিত করে আজিম-উশ-শানকে বাঙলার সুবাদার

মনোনীত করেন। সম্রাটের আদেশে ইব্রাহিম খাঁর পুত্র জবরদস্ত খাঁ বিদ্রোহ দমন করেন, অবশ্য তাঁর সঙ্গে পরে যোগ দিয়েছিলেন আজিম-উশ-শান। তিনি বর্ধমানে এসে শিবির স্থাপন করেছিলেন।

বিলাসী ও ঘুষখোর আজিম-উশ-শানের নিয়োগ ইংরেজদের প্রভুত্ব বিস্তারের সহায়ক হয়েছিল। বর্ধমানে তাঁর কাছে প্রচুর অর্থ ও উপঢৌকন পাঠায় কোম্পানি বাংলায় বাণিজ্যগত সুযোগ সুবিধা লাভের আকাঙ্ক্ষায়। প্রেরিত প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ছিল আড়কাঠি হিসাবে খাজা সরহদ্। প্রতিনিধিদল যখন নবাবকে সন্তুষ্ট করতে ব্যস্ত, সে সময়ে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয় সুতানুটি কলকাতা ও গোবিন্দপুরের অধিকার লাভের জন্য। মাত্র ষোল হাজার টাকার বিনিময়ে কোম্পানি বাঙলায় বাণিজ্য বিস্তারের সুবিধা অর্জনে সফল হয়েছিল। অবশ্য এর মধ্যে দুই হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল তিনটি গ্রাম অধিকারের জন্য।

কিন্তু জমিদারীর 'নিশান' পেতে কোম্পানিকে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। জমিদারদের সন্তুষ্ট করবার ইচ্ছায় নবাব একহাজার টাকা দেওয়ার আদেশ দিলেও জমিদাররা অরাজীই থেকেই যান। উপরন্তু জমিদারদের স্বত্ব বজায় রাখতে নবাবকে ছয় হাজার টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলেও, নবাব ইংরেজ কোম্পানির পক্ষ অবলম্বন করেন। জমিদাররা নবাবের বিরুদ্ধে সম্রাটের কাছে অভিযোগের হুমকি দিয়ে নবাবের এক আমলার মধ্যস্থতার বিরোধের অবসান ঘটে। মাত্র পনের শত টাকার বিনিময়ে গ্রাম তিনটির জমিদারী-স্বত্ব কোম্পানিকে ছেড়ে দেয় জমিদাররা হস্তলিখিত দলিল মারফত। অবশ্য এই হস্তান্তরের অর্থপরিমাণ ছিল তের শত টাকা। ১৬৯৮ খ্রীঃ ৯ নভেম্বর হস্তান্তর সম্পন্ন হয়। বিক্রেতারা হলেন মনোহর রায়চৌধুরী, প্রাণ রায়চৌধুরী, রামচাঁদ রায়চৌধুরী, মনোহর দেব, রামভদ্র।

Deed of Purchase or 'Bai Namah' of the Three Towns

British Museum Additional MSS 24039
No 39

We submissive to Islam, declaring our names and descent, viz, Monohar Das, son of Bas Deo, the son of Raghu, and Ramchand, the son of Bidhyadhar, son of Jagdis, and Ram Bahadur, the son of Ram Deo, son of Kesu ; Pran, the son of Kalesar, the son of Gauri ; and Manohar Singh, the son of Gandarb. 2, being in a state of legal capacity and in enjoyment of all the rights given by the law ; avow and declare

upon this wise that we conjointly have sold and made a true and legal conveyance of the village Dihi Kalkatah, and Sutaluti within the jurisdiction of parganah Amirabad and village Govindpur under the jurisdiction of parganah Poeqan and Kalkatah, to the English Company with rents and uncultivated lands and ponds and groves and right over fishing and woodlands and dues from resident artisans, together with the lands appeartaining there to bounded by the accustomed notorious and usual boundaries the same being owned and possessed by us (up to this time the thing sold being in fact and in law free from adverse rights or litigation forming a prohibition to a valid sale and transfer) in exchange for the sum of one thousand and three hundred rupees current coin of this time including all rights and appurtenances there of internal and external and the said purchase money has bean transferred to our possession for the said purchaser and we have made over the aforesaid purchased thing to him and have excluded from this agreement all false claims, we have become absolute guarantors that if by chance any person entitled to the aforesaid boundaries should come forward the defence thereof is incumbent upon us ; and hencetorth heither we nor our representatives absolutely and entirely, in no manner whatsoever, shall lay claim to the aforesaid boundaries, nor shall the charge af any litigatian fall upon the English Company. For these reasons we have caused to be written and have delivered these few sentences that when need arises they may be evidence. Written on the 15th of the month Ja madi I in Hizri year 1110 eqvivalent to the 44th year of the reign, full of glory and prosperity.

নবাবের আদেশনামায় বলা হয়—গ্রাম তিনখানির জন্য জমিদাররা যে পরিমাণ অর্থ বার্ষিক খাজনা দিত, ঠিক সেই পরিমাণ অর্থই কোম্পানিকে দিতে হবে।

১৬৯৯ খ্রীঃ ২৪শে জানুয়ারি দেওয়ান ইজ্জত খাঁর পরোয়ানা অনুসারে গ্রাম তিনটি খাজনার বার্ষিক পরিমাণ ছিল :

	টাকা	আনা	পাই
ডিহি কলকাতা	৪৬৮	৯	৯
স্থতাস্থটি	৫০১	১৫	৬
গোবিন্দপুর (পরগনা পাইকান)	২৩	১৫	৩
(পরগনা কলকাতা)	১০০	৫	৬
	১,১৯৪	১৪	০

এই বার্ষিক খাজনার টাকা সংগ্রহের জন্য গ্রামগুলির অধিবাসীদের থেকে বিঘা প্রতি সর্বাধিক তিনটাকা বার্ষিক খাজনা সংগ্রহের অধিকার পায় ইংরেজ কোম্পানি। তাছাড়া কোম্পানি স্বল্প কর, জরিমানা ও পতিত জমি ইচ্ছামত ব্যবহারেরও সুযোগ পায়।

দেওয়ান ইজ্জত খাঁর পরোয়ানা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আকবরের রাজস্বমন্ত্রী রাজা টোডরমল যে রাজস্ব তালিকার উল্লেখ করেছিলেন, তার অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে একশ বছরের মধ্যে। টোডরমল পরগনা কলকাতার উল্লেখ করলেও, পরগনা আমীরাবাদ ও পাইকানের কোন উল্লেখ করেননি। তাছাড়া গ্রাম কলকাতা পরগনা কলকাতার পরিবর্তে আমীরাবাদ পরগনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। আবার গোবিন্দপুর গ্রামের একাংশ পরগনা পাইকান এবং অন্যাংশ কলকাতা পরগনার অধীন হয়েছে।

কিন্তু জমিদারি ক্রয়ে ইংরেজ কোম্পানির এত আগ্রহের কারণ কী ছিল? তারা বাণিজ্য করতে এসেছিল। তবে কেন এই জমিদারি ক্রয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়? ১৬৯৪ খ্রীঃ ১৪ই ডিসেম্বর স্থতাস্থটি বাণিজ্য-কেন্দ্র থেকে ইংলণ্ডে কোম্পানির বোর্ড অফ ডাইরেক্টর্সকে একটি চিঠিতে জানান হয়:

"...We have endeavoured to farm 2 or 3 Towns Adjacent to us (Chutanutte included) the rent whereof will amount to about 2,000 or 2,500 Rupees yearly which is a means to increase your Honours, Revenues in your Towns of Chutanutte for at though we do make some small Matter out of your Buzar (bazar) by Grain fines etc. Yett wee cannot lay any impositions on the people, though never so reasonable till such time as wee can pretend a Right to the place, which this farming of the Towns Adjacent will soon cause, and procure us the liberty of collecting such Duties of the Inhabitants as is consistent with our own Methods and Rules of Government and this is the only means we can think of till we can think of till we can procure a Grant for our firm

Settlement. The Duties collected out of the Town last month and fines paid amounted to about 160 rupees whereas formerly it was so small that it did not amount to 30 rupees one month···"

সুতানুটি বাণিজ্য কেন্দ্রের আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সুতানুটি গ্রাম ইজারা নেওয়া লক্ষ্য ছিল। কারণ এখান থেকে বছরে দুই বা আড়াই হাজার টাকা খাজনা পাওয়ার সম্ভাবনা।

মনে রাখতে হবে সতের শতকের শেষে বাঙলায় ইংরেজের বাণিজ্য খুব একটা অনুকূল ছিল না। সুবেদারের সঙ্গে বিবাদ করে কাশিমবাজার ও হুগলির বাণিজ্য-কেন্দ্র ত্যাগ করে জবচার্ণক সদলবলে সুতানুটিতে আশ্রয় নেন এবং দু'বছর পরে এখানে স্থাপন করেন বাণিজ্য-কুঠি। মোগল শাসকদের সঙ্গে বিবাদের ফলে অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্গীণ হয়ে উঠতে থাকে। ১৬৯১ খ্রীঃ বিরোধ অবসান ঘটলেও, সুতানুটির দুর্দশা যথাযথই ছিল। চিঠিতে ক্রমশঃ আয়বৃদ্ধির কথা বলা হলেও, তা সঠিক নয়। যা আয় হত সবই ব্যায় হত, সুতানুটির বাণিজ্যকেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণে। এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের একমাত্র পথ ছিল গ্রামগুলি ইজারা নেওয়া।

তাছাড়া চিঠিতে পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে—এই অঞ্চলে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে, ইংলণ্ডের প্রথা ও আইন চালু করে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে কর আদায় করা যাবে।

সুতানুটির বাণিজ্যকেন্দ্রকে নিরাপদ করার জন্য একটি দুর্গ নির্মাণ ছিল জরুরী। এই ব্যয় নির্বাহ করতে হলে দ্রুত আয় বাড়ান দরকার। সুতানুটিতে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি আগেই প্রয়োজন। তারপর দুর্গ নির্মাণ হবে। আর গ্রামগুলি ইজারা নিলে সব অনুমতি পাওয়া যাবে সহজেই।

সুতরাং এতগুলি কারণকে সামনে রেখেই ইংরেজ কোম্পানি সুতানুটি, কলকাতা, গোবিন্দপুর কিনতে অগ্রসর হয়েছিল।

কোম্পানির এই সুদিনের জন্য চার্লস আয়ারের অবদান ছিল অসামান্য। তিনি ইংল্যাণ্ড যান এবং তাঁকে 'স্যর' উপাধি দেওয়া হয়। আবার ১৭০০ খ্রীঃ তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন কোম্পানির প্রেসিডেন্ট হিসাবে। ১৭০২ খ্রীঃ প্রেসিডেন্টের বাড়ী তৈরি করেন বহু অর্থ ব্যয়ে। বাড়িটি ছিল, "The best and the most regular piece of architecture in India. ১৭০৬ খ্রীঃ পুরনো ফ্যাক্টরি ভেঙে নতুন একতলা বাড়ি তৈরি করা হয়। এটিই প্রথম রাইটার্স বিল্ডিং। নদীর ধারে কোম্পানির এই আস্তানার দুদিকে পাঁচিল তুলে সুরক্ষিত করা হয় ১৭০৭ খ্রীঃ। এ বছর মারা যান ঔরঙ্গজেব। কোম্পানির আস্তানার মধ্যে লালদীঘি তখন একটি অপরিচ্ছন্ন পুকুর মাত্র। ১৭০৯ খ্রীঃ এটি সংস্কার করে পানীয় জলের দীঘিতে পরিণত করা হয়। দুর্গ থেকে গঙ্গায়

অবতরণের পথে তৈরি হয় জেটি। তার দুদিকে ছিল ইটের পাঁচিল। নদীপথে যাতে কেউ আক্রমণ করতে না পারে, সেজন্য পাঁচিলের ওপর কামান বসান ছিল। বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিং-এর উত্তর-পশ্চিম কোণে ১৭০৯ খ্রীঃ কলকাতার প্রথম খ্রীষ্টীয় উপাসনাগার সেণ্ট অ্যানের গীর্জা তৈরি হয়েছিল। য়ুরোপীয় বণিকরা দুর্গের পূর্বদিকে কয়েকটি ভাল বাড়ী তৈরি করে এসময়েই।

ইংরেজদের কলকাতা ক্রয় এক ঐতিহাসিক ঘটনা। তারপর তিনমাসের মধ্যেই বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি সংগ্রহ করে দুর্গ নির্মাণ শুরু হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এই দুর্গই ছিল ইংরেজের শক্তি বিস্তারের প্রধান অস্ত্রাগার। কলকাতা ক্রয় করার পর সুতানুটি বাণিজ্যকেন্দ্রের আয় বেড়ে যেতে থাকে দ্রুত গতিতে। ১৬৯৪-৯৫ খ্রীঃ যেখানে কলকাতা থেকে মাসিক গড় আয় ছিল সত্তর আশি টাকা, ১৭০৩ খ্রীঃ তা বেড়ে হয় সমস্ত খরচ-খরচা বাদ দিয়ে নীট মাসিক গড আয় ৪৮০ টাকা এবং ১৭০৯ খ্রীঃ হয় ১৩৭০ টাকা। দ্রুত আয় বৃদ্ধিতে বাঙলায় কোম্পানির বাণিজ্য সমৃদ্ধি ঘটতে থাকে। সেইসঙ্গে দুর্গটিকে সুরক্ষিত করা হয় সামরিক শক্তি বাড়িয়ে। বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে কলকাতার লোকসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং কলকাতা থেকেও কোম্পানির আয় বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে বেড়ে যায় কোম্পানির লোভ। নতুন জমিদারি স্বত্ব লাভে তারা তৎপর হয়ে ওঠে। বিশ বছরের মধ্যে (১৭১৭ খ্রীঃ জুন মাসে) ত্রিশ হাজার পাউণ্ড উপঢৌকন পাঠিয়ে তারা সম্রাটের কাছ থেকে কলকাতার পার্শ্ববর্তী আরও আটত্রিশটি গ্রামের জমিদারি স্বত্ব লাভ করে। সেইসঙ্গে বাঙলায় কোম্পানির সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি ঘটে। দুর্নীতিগ্রস্ত, বিলাস-পরায়ণ সুবাদারদের অগ্রাহ্য করে কোম্পানি কিনে-নেওয়া ভূখণ্ডে নিজেদের শাসন ও বিচার-ব্যবস্থার প্রবর্তন করে।

গ্রামগুলির আয়তন ছিল প্রায় ২০০০ একর বা প্রায় ৬০০০ বিঘা। সম্রাট ফারুকশিয়র প্রদত্ত ফরমানের আটত্রিশখানি গ্রাম ও তার রাজস্বের হিসাব ঃ

	পরগনা	স্থানের নাম	রাজস্ব
১।	বোরো পাইকান	শালিখা Salica	২৭৭ টাকা ১৪ আনা ৩ পাই
২।	” ”	হাওড়া Harrirah	৩৮৩ ” ২ ” ৯ ”
৩।	” ”	কাসুন্দিয়া Cassundeah	১২৯ ” ১২ ” ১১ ”
৪।	” ”	রামকৃষ্ণপুর Ramkissenopoor [বেতোড়ের হাট তখন প্রসিদ্ধ ছিল]	১৬৯ ” ১৪ ” ৮ ”
৫।	” ”	বেতোড় Better	৫৮০ ” ১৪ ” ৯ ”

	পরগণা	স্থানের নাম	রাজস্ব
৬।	আমিরাবাদ	দক্ষিণ পাইকপাড়া Dackneypackparrah	১৪৫ টাকা ২ আনা ২ পাই
৭।	"	চিৎপুর Chittapoor	২৫২ " ৮ "
৮।	পাইকান	হোগলকুড়ে (চণ্ডী) Hogulchundeg	১৩৭ " ১১ " ৩ "
৯।	কলকাতা/পাইকান	উল্টাডিঙ্গি Ultadany	৩১৪ " ১৩ " ১২ "
১০।	কলকাতা/পাইকান	দক্ষিণদারী Dackneydand	৪২৫ " ৮ " ১২ "
১১।	পাইকান	গোবরা Goborah	১০০ " ১ " ৬ "
১২।	পাইকান	বাহির দক্ষিণদারী Badokneydand	১২৫ " ৮ " ৪ "
১৩।	কলকাতা/পাইকান	সিরামপুর Sirampore	১০৬ " ১০ " ১০ "
১৪।	" "	ইটালী Hintaley	২২৯ " ১ " ১৮ "
১৫।	" "	গোঁদলপাড়া Gandalparah	১০১ " ১৩ " ৬ "
১৬।	পাইকান/নদীয়া	কাঁকুড়গাছি Cancergasoiah	২০৮ " ৬ " ৮ "
১৭।	কলকাতা/পাইকান	কুলিয়া Cooliah	৫৭২ " ৯ " ১৭ "
১৮।	" "	শুঁড়া Shunrah	৬৪৮ " ১১ " ১২ "
১৯।	" "	ট্যাংরা Tangarah	২২৮ " ১২ " ১৫ "
২০।	"	বাহির শুঁড়া Bad Sundah	৪০ " ৮ "
২১।	"	শিয়ালদহ Sealda	১১৮ " ৯ " ১ "
	আমিরাবাদ	সুতানুটি Soota loota	৫০১ " ১৫ " ৩ "
	আমিরাবাদ	ডিহি কলকাতা De Calcutta	৪৬৮ " ৯ " ৬ "
	পাইকান/কলকাতা	গোবিন্দপুর Gobindapoor	৩১০ " ১৪ "
২৫।	কলকাতা/পাইকান	ধলন্দা Doland	৩০৬ " ৭ " ৮ "
২৬।	" "	বিৰ্জ্জি Bergey	২৩৬ " ৩ "
২৭।	" "	তিলতলা (তালতলা) Tiltola	২০৬ " ১৪ " ৫
২৮।	" "	তোপসিয়া Topsiah	২৯০ " ১০ " ৯

	পরগনা	স্থানের নাম	রাজস্ব		
২৯।	কলকাতা	সাপগাছি Sapgassye	২১১ টাকা	৩ আনা	পাই
৩০।	কলকাতা/পাইকান	চৌরঙ্গী Cherangy	২৯ "	১১ "	৫ "
৩১।	" "	কলিঙ্গা Colimba	৩৮৩ "	৭ "	১৩ "
৩২।	কলকাতা	চৌবাঘা Chobogah	৩৭ "	৪ "	
৩৩।	কলকাতা	জলকলিঙ্গা Jola Colimba	১১৪ "	৩ "	৮ "
৩৪।	কলকাতা/পাইকান	মির্জাপুর Mirsapoor	১৭৩ "	১২ "	১৮ "
৩৫।	" "	বেলগাছিয়া Belgashia	৩০৫ "	৩ "	১৯ "
৩৬।	কলকাতা	শেখপড়া Shakparra	৪১ "	৬ "	৬ "
৩৭।	মানপুর	সিমলে Similiah	৮১ "	১৫ "	৬ "
৩৮।	মানপুর	মাকন্দা Macond	১১৮ "	১২ "	৮ "
	মানপুর	আর্কুলী Arcolly	২২ "	১১ "	৯ "
	কলকাতা	কামারপাড়া Comorparrah	৬৩ "	১০ "	৯ "
	কলকাতা	বাঘমারী Bagmarry	৪৯ "	৭ "	৮ "

হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ (১৫১৮ খ্রীঃ—৩৩ খ্রীঃ) যখন বাঙলার সুবাদার, তখন য়ুরোপীদের মধ্যে সর্বপ্রথম পর্তুগীজরা বাঙলার বাণিজ্য শুরু করে। বর্তমান হুগলির কাছে সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও ছিল অধুনালুপ্ত সরস্বতী নদীর তীরে। এখানে পর্তুগীজরা বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করে ১৫৭৯ খ্রীঃ। সরস্বতী নদী গার্ডেনরীচের অপর পারে মিলেছিল গঙ্গায়। পর্তুগীজ মালবাহী জাহাজগুলি এসেই মোহনায় নঙ্গর করত। তারপর ছোট ছোট নৌকো করে মাল নিয়ে যাওয়া হত সপ্তগ্রামে। কিন্তু নদী মজে যেতে থাকায় পর্তুগীজরা সপ্তগ্রাম থেকে চলে আসে হুগলিতে। পর্তুগীজদের বাণিজ্য ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন সম্রাট। তাঁর আমন্ত্রণে ক্যাপ্টেন পেড্রো টাভারেজ আগ্রায় গিয়ে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করেন। সম্রাট তাদের বাঙলার যে কোন স্থানে কুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন। ১৫৭৯ খ্রীঃ হুগলিতে স্থায়ী কুঠি নির্মাণ করেন টাভারেজ। হুগলির শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ১৫৯৯ খ্রীঃ এখানে তারা একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিল আত্মরক্ষার জন্য। ততদিনে হুগলি বাঙলার সব থেকে বড় বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। পর্তুগীজদের বাণিজ্য শাখা স্থাপিত হয়েছিল সাতগাঁ, হিজলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে। হুগলিতে জনসংখ্যাও বাড়তে থাকে। মোগল রাজকোষে পর্তুগীজরা আমদানি শুল্ক (custom duty) দিতেন এক লক্ষ টাকা। পর্তুগীজরা ধীরে ধীরে বাণিজ্য থেকে সরে

গেল। হুগলি শহর সুরক্ষিত করে প্রজাদের ওপর নানারকম অত্যাচার শুরু করে। মোগল কর্মচারীদের নির্দেশ তারা অমান্য করত হামেসাই।

পর্তুগীজ জলদস্যুরা দেশী-বিদেশী বাণিজ্যপোতে ডাকাতির পর এসে আশ্রয় নিত ঐ দুর্গে। বাঙলার সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল এদের অত্যাচারে তখন অস্থির। এই অবস্থার পরিবর্তনে ব্যর্থ হয়েছিলেন সম্রাট আকবর এবং জাহাঙ্গীর। শাহজাহানের আমলে এর প্রতিকার ঘটে। এর পিছনে কারণ ছিল ভিন্ন। যুবরাজ খুরম বিদ্রোহী হয়ে হুগলির পর্তুগীজদের সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হন। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি পর্তুগীজ দস্যুদের দমন করার আদেশ জারী করেন। সাধের হুগলি ছেড়ে পালাল পর্তুগীজরা ১৬৩১ খ্রীঃ। আবার ১৬৩৩ খ্রীঃ তাদের হুগলিতে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হলেও পূর্বপ্রতিপত্তি ফিরে পেল না। বাঙলাদেশে লবণের ব্যবসা ছিল পর্তুগীজদের হাতে।

১৬২৫ খ্রীঃ মসলিপট্টমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইংরেজের কুঠি। ১৬৩৪ খ্রীঃ দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে কোম্পানি বাঙলাদেশে বাণিজ্যের সনদ পায়। ১৬৩৯ খ্রীঃ মাদ্রাজে সেণ্ট-জর্জ দুর্গ নির্মিত হয়। ১৬৪০ খ্রীঃ হুগলিতে, ১৬৪২ খ্রীঃ জলেশ্বরে এবং ১৬৫৮ খ্রীঃ কাশীমবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোম্পানির কুঠি।

কিন্তু মোগল শাসনকর্তাদের সঙ্গে কোম্পানির কর্মচারীদের খুব সদ্ভাব ছিল না। ১৬৮৫ খ্রীঃ একটি সংঘর্ষের পর উভয় পক্ষের সম্পর্ক আরো তিক্ত হয়ে ওঠে। দিল্লীর সিংহাসনে তখন ঔরঙজেব আর বাঙলায় শায়েস্তা খাঁ। কোম্পানির পরাজিত কর্মচারীরা এসে আশ্রয় নেয় সুতানুটিতে। তারপরের কথা তো আগেই বলেছি।

সংঘর্ষের পথে

কোম্পানি কলকাতা শহরকে প্রেসিডেন্সী পর্যায়ে উন্নীত করে ১৬৯৮ খ্রীঃ বা ১৬৯৯ খ্রীঃ। একজন প্রেসিডেণ্ট এবং চারজন সদস্য নিয়ে একটি কাউন্সিল গঠন করে। কাউন্সিলের প্রথম সদস্য হিসাবরক্ষক, দ্বিতীয় সদস্য গুদামরক্ষক, তৃতীয় সদস্য নৌ-বাণিজ্যরক্ষক এবং চতুর্থ সদস্য খাজনা সংগ্রাহক।

বাঙালার পরিস্থিতি তখন ছিল বেশ অশান্ত। মুর্শিদাবাদের নবাবের শাসনব্যবস্থা ছিল দুর্বল। মারাঠা উপদ্রব ও শোভা সিং প্রভৃতি জমিদারদের বিদ্রোহে দেশের মধ্যে চলেছিল চরম অরাজক অবস্থা। এই সুযোগে কোম্পানি নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে থাকে। অপেক্ষাকৃত শান্ত কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি ঘটছিল। ব্যবসায়ীদের অনুকূল সুযোগ সুবিধার কারণে জনসংখ্যা বাড়ছিল। কয়েক বছরের মধ্যে কলকাতায় প্রায় এক লক্ষ ভারতীয় এসে জমায়েত হয়। য়ুরোপীয়দের সংখ্যা তখন তিন হাজারের ওপর। কলকাতা বন্দরে ওই সময়ে

বাৎসরিক দশ হাজার টনের বেশী মাল আমদানি রপ্তানি হত। যাইহোক, কলকাতার শাসন কাজ চালাতে ১৭২০ খ্রীঃ কোম্পানি জমিদার হিসাবে একজন কর্মচারী নিয়োগ করেন। শহরের জমিদার ছিল মিঃ ফ্রিক। তার সহকারী প্রথম বাঙালী ডেপুটির নাম গোবিন্দরাম মিত্র। জমিদার জন জেফালিয়া হলওয়েলের নামের সঙ্গে পরিচিত অনেকেই। তিনি ১৭৩২ খ্রীঃ কলকতায় এসেছিলেন একজন চিকিৎসক হিসাবে। ১৭৩৬ খ্রীঃ তিনি অল্ডারম্যান নিযুক্ত হন। পরে হন জমিদার।

শহর কলকাতায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে ১৭৩৭ খ্রীঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর। ঝড়ের সঙ্গে ছিল প্রবল ভূমিকম্প। গঙ্গার জল প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু হয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় দু'কূল। পাঁচ ঘণ্টায় পনরো ইঞ্চি বৃষ্টিপাত ঘটে। সেণ্ট অ্যান গীর্জার চূড়া ভেঙে পড়ে। ইংরেজ বণিকদের দু'শত ঘরবাড়ী ভেঙে যায়। গঙ্গার ওপর নয়খানি জাহাজের আটখানি মাঝিমাল্লাসহ ডুবে যায়। কুড়ি হাজার ছোট ছোট নৌকাও ভেসে গিয়েছিল। মৃতের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ।

তারপর ১৭৪২ খ্রীঃ ঘটে মারাঠা আক্রমণ। যদিও তারা কলকাতা আক্রমণ করেনি, কিন্তু আক্রমণেব ভয়ে সুতানুটির উত্তরাংশ থেকে দক্ষিণে গোবিন্দপুর পর্যন্ত একটি সাত মাইল লম্বা খাল কাটা হয়। খাল কাটার কাজে ছয় শত দেশীয়, এবং তিনশত ইংরেজকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। খালের মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছিল একটি রাস্তা। চিৎপুরের কাছে গঙ্গা থেকে আপার সার্কুলার রোড ধরে দক্ষিণে জানবাজার পযন্ত গিয়েছিল খালটি। তারপর দক্ষিণ-পশ্চিমে চৌরঙ্গী রোড ও মিড্‌লটন রোডের মোড় দিয়ে পশ্চিম মুখে হেস্টিংসের কাছে গঙ্গায় পড়বার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খাল কাটা সম্পূর্ণ হয়নি। কারণ, চার মাইল খাল কাটতে সময় লেগেছিল সাত মাস। আর নবাব আলিবর্দির সঙ্গে মারহাট্টাদের সন্ধি হওয়ায় তারা ফিরে যায়। চিৎপুরের কাছে খালের বর্তমান অংশটি মারহাট্টা ডিচ নামে পরিচিত। মারহাট্টা ডিচ্‌ লেন নামে একটি রাস্তাও আছে। পরে এই খাল অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। খাল বুজিয়ে দেওয়া হতে থাকে ১৭৯৯ খ্রীঃ থেকে। যার ওপর পরবর্তীকালে তৈরি হয় আপার সার্কুলার রোডের একটি অংশ।

নবাব আলিবর্দি মারা যান ১৭৫৬ খ্রীঃ ৯ই এপ্রিল। দৌহিত্র সিরাজদৌলা হলেন বাঙলার নবাব। প্রথম থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে তার বিবাদ শুরু হয়। কলকাতায় ইংরেজদের দুর্গ নির্মাণ ও সংস্কার নবাবের পছন্দ ছিল না। তাছাড়া ঢাকার শাসনকর্তা রাজবল্লভ নবাবের রাজস্ব না দিয়ে, পুত্র কৃষ্ণদাসকে কলকাতায় পাঠান ইংরেজের আশ্রয়ে। তিনি সঙ্গে এনেছিলেন পিতার সঞ্চিত অর্থ। নবাব কৃষ্ণদাসকে মুর্শিদাবাদ পাঠাবার আদেশ দিলে, ইংরেজরা তা অগ্রাহ্য করে। ক্রুদ্ধ নবাব ১৭৫৬ খ্রীঃ কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি দখল করে ইংরেজ বণিক্ ও কর্মীদের বন্দী করে মুর্শিদাবাদ নিয়ে যান। বন্দীদের মধ্যে

ছিলেন কুঠির সেই সময়কার সামান্য কর্মচারী ওয়ারেন হেস্টিংস। এই সংবাদে কলকাতার ইংরেজরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা চন্দননগরের ফরাসী ও চুঁচুড়ার ওলন্দাজদের সাহায্য চেয়ে পাঠায়। কিন্তু নবাবের ভয়ে কোন সাহায্য এল না। কলকাতার সমস্ত বিদেশী ১৫০০ দেশীয় বন্দুকধারী হিন্দু সৈন্য নিয়ে আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হল। নবাবও ১৭৫৬ খ্রীঃ ১৫ জুন চিৎপুরের কাছে সৈন্য ও বড় বড় কামান নিয়ে হাজির হলেন। সেখানে ইংরেজ সৈন্যরা নবাব সৈন্যদের বাধা দিল। ইংরেজদের অস্ত্র ভাল, যুদ্ধকৌশল উন্নত, কিন্তু সৈন্যসংখ্যা কম। নবাব সৈন্যরা বাগবাজারের এই যুদ্ধে আপাততঃ পিছু হটতে বাধ্য হল। নবাব ছাউনি ফেললেন দমদমায়। দুদিন বাদে নবাব সৈন্যদের প্রবল আক্রমণে বাগবাজারের ইংরেজ প্রতিরোধ ভেঙে পড়ল। শহরে নবাব সৈন্যরা প্রবেশ করল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, এখনকার রাণী মুদিনীর গলিতে দুপক্ষে প্রচণ্ড গোলা বিনিময় হয়। পুরনো দুর্গের পূর্বদিকে অর্থাৎ মিশন রোর কাছে একক যুদ্ধে ইংরেজরা সম্পূর্ণ পরাস্ত হল। একটি বাড়ীর ওপর কামান উঠিয়ে নবাব সৈন্যরা দুর্গের ওপর গোলা বর্ষণ করতে থাকেন। উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা মহিলাদের নিয়ে গঙ্গাবক্ষে আশ্রয় নেন। ছোট এক দল সৈন্য নিয়ে হলওয়েল দুর্গ রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৭৫৬ খ্রীঃ ২০ জুন তিনি নবাবের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। নবাব রাজকোষে কোন অর্থ পেলেন না। আগেই তা সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। নবাব কলকাতার কাছে আলিপুরে কিছু দিন ছিলেন। সে সময় কয়েকটি বাড়ী ভেঙে ফেলা হয়। অধিকাংশ বন্দীকে মুক্তি দিয়ে হলওয়েল সহ আরও তিনজন বন্দী নিয়ে নবাব মুর্শিদাবাদ ফিরে যান। ফিরে যাওয়ার আগে কলকাতার নাম দেন আলিনগর এবং একজন শাসনকর্তাও নিয়োগ করেছিলেন।

কলকাতার পতনের সংবাদ মাদ্রাজ পৌছায় ২০শে জুন। কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন হলেন। ক্লাইভ ও ওয়াটসনের অধীনে একদল সৈন্য পাঠান হল কলকাতা উদ্ধারে। তারা ১৭৫৬ খ্রীঃ ২০শে ডিসেম্বর বজবজের দক্ষিণে ভাগীরথীর পূর্ব তীরে ফলতায় পৌছান। বজবজ দুর্গ দখল করে ক্লাইভ স্থলপথে কলকাতায় এগিয়ে আসতে থাকেন। জলপথে ওয়াটসন কলকাতায় পৌছান। নবাব সৈন্যরা তাদের বাধা দিল না। ১৭৫৭ খ্রীঃ ২রা জানুয়ারি কলকাতায় আবার উড়ল ইংরেজ পতাকা। দুর্গের কাছে যত বাড়ী ছিল, ক্লাইভ সব ভেঙে ফেলে তিন দিকে ৩০ ফুট চওড়া ও ১২ ফুট গভীর পরিখা খনন করেন। কিন্তু নবাবের সঙ্গে ৯ই ফেব্রুয়ারি এক সন্ধির ফলে ইংরেজরা পুরনো অধিকারসহ আরও কিছু নতুন সুবিধা পেল।

ফরাসীরা ছিল নবাবের বন্ধু। য়ুরোপে সে সময় ইংরেজ ও ফরাসীদের যুদ্ধ চলছিল। ক্লাইভ চন্দননগর অধিকার করায় নবাব কলকাতায় ইংরেজ গভর্ণরকে কড়া চিঠি পাঠালেন। দু'পক্ষের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবনতি ঘটল। যুদ্ধ তখন

অনিবার্য। দুর্ভাগ্য, সে সময় রাজধানী মুর্শিদাবাদে সিরাজদৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করবার এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন জগৎশেঠ, রাজা রাজবল্লভ, সেনাপতি মীরজাফর, উমিচাঁদ আরও অনেকে। তারা সিরাজের বদলে মীরজাফরকে নবাবপদে বসাতে চেয়েছিলেন। ক্লাইভ এই সুযোগ নিলেন। মীরজাফরের সঙ্গে তিনি এক গোপন চুক্তি করেন। স্থির হয় মীরজাফরের সৈন্যরা যুদ্ধে অংশ নেবে না এবং নবাব হয়ে মীরজাফর ইংরেজদের ব্যবসায়ের সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা দেবেন। চুক্তিতে উমিচাঁদকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা লেখা ছিল না। তিনি এই ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিতে চাইলে, ক্লাইভ একটি লাল কাগজে জাল চুক্তিপত্র তৈরি করিয়ে তাতে উমিচাঁদকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা লেখান। উমিচাঁদকে তা দেখানও হয়েছিল। এই জাল চুক্তিপত্রে ওয়াটসন কোন সই দেন নি। তার স্বাক্ষর জাল করা হয়েছিল। ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ হলে পলাশীর রণক্ষেত্রে এক অসহায় নবাবকে জঘন্যভাবে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল ১৭৫৭ খ্রীঃ ২৩শে জুন। নবাবের সৈন্যদলে ছিল ৮,০০০ অশ্বারোহী, ১৫,০০০ পদাতিক, ১০,০০০ বিলদার সৈন্য, ৪০টি বড কামান এবং ৫০টি হাতি। ক্লাইভের ছিল ১০২০ য়ুরোপীয় সৈন্য, ২২২০ দেশীয় সৈন্য এবং ৮টি কামান। যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি মীরজাফর বিরাট বাহিনী নিয়ে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ছিলেন।

মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায়

তারপর থেকেই বাঙলার ইতিহাসের প্রাণকেন্দ্র মুর্শিদাবাদ থেকে উঠে এল কলকাতায়। ইংরেজ বণিক্‌দের সুবিধার্থে কলকাতার দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে। নতুন নবাব মীরজাফর বাঙলাদেশের খাজনা আদায় ও দেশ-শাসনের ভার দিলেন ইংরেজদের উপর। কলকাতার দক্ষিণ থেকে কুলপি পর্যন্ত কোম্পানির জমিদারী অধিকার স্বীকৃত হল। তাঁর প্রদত্ত দলিলে ছিল: "Know this, Ye Zeminders···and others settled in Bengal···that ye are dependents of the Company and that ye must submit to such treatment as they give you, whether good or bad and this is my express injunction. নতুন চুক্তির উল্লেখযোগ্য দুটি ধারা:

8. "Within the ditch which surrounds the borders of Calcutta are tracts of land belonging to several Zeminders; besides this, I will grant the English Company six hundred yards without the ditch."

9. "All the land lying south of Calcutta as far as Culpeeh be under the Zemindary of the English Company and all the

officers of those parts shall be under their jurisdiction. The revenue to be paid by them (the Company) in the same manner with other Zeminders." তাছাড়া ইংরেজ কোম্পানি ও কর্মচারীরা রাজকোষ থেকে ক্ষতিপূরণ পেল। সিরাজের সৈন্যরা শহর কলকাতার ক্ষতি করেছিল। সেজন্য নতুন নবাব ক্লাইভকে পাঠালেন ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী ও দেশীয় দালালদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়। ক্লাইভ বেশী পান। ১৭৫৭ খ্রীঃ থেকে ১৭৮০ খ্রীঃ মধ্যে ইংরেজরা বাঙলা দেশ থেকে প্রায় ৩৮,০০,০০০ পাউণ্ডেরও বেশী শোষণ করে। একে বলা হয়ে থাকে Plassey drain বা পলাশী শোষণ। টাকার বেশীর ভাগ যায় ইংলণ্ডে। বাকি টাকায় কলকতার পুনর্নির্মাণ শুরু হয়। বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ তৈরি হয়। টাকশাল, কোম্পানির বিভিন্ন বাড়ি দমদমায় ক্লাইভের এবং আলিপুরে হেষ্টিংসের জন্য বাগানবাড়ি তৈরি হয়। তৈরি হয় টালির নালা। সমসাময়িক একজন লেখকের রচনায় পাওয়া যায়: "The appearance of the best houses in Calcutta is spoiled by the little straw huts and such sort of encumbrances are built up by the servants for themselves to sleep in, so that all the English part of the town is a confusion of very superb and very shoddy houses, dead walls, straw huts, ware houses and I know not what." ১৭৬৫ খ্রীঃ কোম্পানি বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সনদ পায় দিল্লীর মোগল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে। ফলে বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসকে পরিণত হয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। কলকাতায় কোম্পানি একটি রাজস্ব বোর্ড গঠন করে। বোর্ডের পরামর্শ মতই শুরু হয়ে যায় শাসন ও শোষণ। কলকাতা হল ইংরেজদের প্রধান কর্মক্ষেত্র।

রাজধানী কলকাতা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ হয় ১৭৭৩ খ্রীঃ। কোম্পানি নতুন সনদ পায়। কলকাতা হল ইংরেজ অধীন ভারতের রাজধানী। কলকাতার শাসনকর্তা গভর্ণর হেস্টিংস হলেন ব্রিটিশ ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল। কলকাতার দ্রুত উন্নতি ঘটতে থাকে। বড় বড় ব্যবসা কেন্দ্র, গীর্জা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেন তৈরি হল। হেস্টিংসের শাসনকালেই সমস্ত ক্ষমতাই কলকাতায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তিনি কেবল সুপ্রিম কোর্টই স্থাপন করলেন না, কোষাগার মুর্শিদাবাদ থেকে নিয়ে আসা হয় কলকাতায়। হেস্টিংসের আদেশে বর্ধমান, ঢাকা, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ও পাটনার রেভিনিউ বোর্ড বন্ধ করে সমগ্র দেশের জন্য কলকাতায় একটি রেভিনিউ বোর্ড গঠন করা হয়। কর্ণওয়ালিশ শাসন ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করেছিলেন, হেস্টিংসের আরব্ধ কার্যাবলী

সম্পূর্ণ করে। কিন্তু হেস্টিংস কাউন্সিলকে অগ্রাহ্য করেন নি কর্ণওয়ালিসের মত। কর্ণওয়ালিসের সময় কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয়। গাড়ি-ঘোড়ার প্রচলন হওয়ায়, পাকা রাস্তাঘাট প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রাস্তা পাকা করার জন্য বীরভূম থেকে পাথর আসত। চুরি ডাকাতি কমেছিল শহরে।

ওয়েলেসলি কলকাতার বিবিধ উন্নতির চেষ্টা করেন। ১৮০৩ খ্রীঃ থেকে তিনি টাউন ইমপ্রুভমেন্ট কমিটি গঠন করেছিলেন। তার অধিকাংশ উন্নয়ন প্রয়াস অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

লর্ড ভ্যালেনটাইন ১৮০৩ খ্রীঃ কলকাতায় এসেছিলেন। ওয়েলেসলি শহরের যেসব উন্নতি করেছিলেন, সে-সম্পর্কে তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়: "The town of Calcutta is at present well worthy of being the seat of our Indian Government both from its size and from the magnificent buildings which decorate the part of it inhabited by Europeans. The citadel of Fort William is a very fine work, but greatly too large for defence. The Esplanade leaves a grand opening. on the edge of which is placed the new Government House erected by Lord Wellesly, a noble structure, although not without faults in the architecture and upon the whole not unworthy of its destination. On a line with this edifice is a range of excellent houses, chunamed and ornamented with verandahs. Chowreinghee, an entire village of palaces, runs for a considerable length at right angles with it and altogether forms the finest view beheld in any city." লর্ড ভ্যালেনটাইন বিদেশীদের বসতি সম্পর্কে বলেছেন: 'The Black Town is as complete a contrast to this as can be well conceived. Its streets are narrow and dirty, the houses of two stories. Occasionally brick and generally mud and that ched, perfectly resembling the cabins of the poorest class in greland."

এই সময় থেকেই কলকাতার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটতে থাকে। ১৮১৩ খ্রীঃ সনদে কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায় রহিত করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সমশর্তে ভারতে ব্যবসায়ের সুযোগ দেওয়া হয়। ফলে কলকাতায় ব্যবসা ও সমৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু ১৮৩০ খ্রীঃ থেকে ১৮৩৪ খ্রীঃ মধ্যে পাঁচটি বড় এজেন্সি হাউসের বিপর্যয়ের পর এই খ্যাতি ম্লান হয়ে যায়। আর একবার আঘাত আসে ১৮৬৭ খ্রীঃ যখন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে। সমকালীন একজন ইংরেজ লেখকের মন্তব্য: "The commercial morality of Calcutta is a bye-word in every

Chamber of Commerce in Europe. There is almost a total bankruptcy of chrtacter."

টাউন হল তৈরি শুরু হয়েছিল ১৮০৫ খ্রীঃ ; শেষ হয় ১৮১৩ খ্রীঃ। ১৮৩৯ খ্রীঃ সেণ্ট পল্‌স্‌ গীর্জা নির্মাণ শুরু ; শেষ হয় ১৮৫৭ খ্রীঃ। ১৮৩১ খ্রীঃ নতুন টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত হলেও সম্পূর্ণ কাজ শুরু হয় ১৮৮৫ খ্রীঃ থেকে। এসময়ই কলকাতায় ট্রেডস্‌ অ্যাসোসিয়েসনের সূচনা ঘটলেও, প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ খ্রীঃ। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের আদিরূপ ক্যালকাটা চেম্বার অফ কমার্স ১৮৩৪ খ্রীঃ আত্মপ্রকাশ করে। অকলাণ্ডের দুইবোন ইডেন কলকাতায় বর্তমান সুদৃশ্য বাগানটি তৈরি শুরু করেছিলেন। কার্জনের সময় আবার শহর কলকাতা উন্নয়নে নজর দেওয়া হয়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈরির কাজ আরম্ভ হয়েছিল। ১৮৭০ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয় পোর্টকমিশনার। বন্দরের আধুনিকীকরণ, ডক ও জেটি নিয়ন্ত্রণ, মাল ওঠান নামাবার ব্যবস্থা, ঘাট নির্মাণ করে এরাই। কলকাতা ও হাওড়ার বিভিন্ন স্থানে ফেরি সার্ভিসের সূচনা ঘটে। ১৯১২ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট। উদ্দেশ্যে ছিল ঘনবসতি অঞ্চলের পুনর্বিন্যাস, রাস্তার উন্নয়ন, শহরের মধ্যে মুক্ত এলাকা তৈরি, গরীবদের জন্য ভাল সস্তায় বাড়ির ব্যবস্থাসহ আরো অনেক কিছু। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ট্রাস্টের কাজকর্ম ছিল উল্লেখযোগ্য। সেণ্ট্রাল এভিনিউ (চিত্তরঞ্জন এভিনিউ), পার্ক স্ট্রীট, থিয়েটার রোড, রসা রোড এক্সটেনশন্‌, সাদার্ণ এভিনিউ, রাসবিহারী এভিনিউ প্রভৃতি প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করায় শহরের রূপ গেল বদলে। অনেকগুলি পার্ক তৈরি হয়। ঢাকুরিয়ার কাছে সুদৃশ্য লেকও তৈরী হয়। পার্ক, খেলাধুলা ও আমোদ প্রমোদের জায়গা বেরিয়েছিল ৩২০ একর। ১৭,১৯,০৫৮ বর্গ গজ আয়তনের মোট ৫৪·৮৫ মাইল রাস্তা কর্পোরেশনকে হস্তান্তর করে ট্রাস্ট। শহর উন্নয়নে কয়েকটি বেসরকারী সংস্থাও এগিয়ে এসেছিল। এদের মধ্যে হিন্দুস্থান কোঅপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি এবং বালিগঞ্জ ব্যাঙ্কের নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। বালিগঞ্জ এলাকাকে বসতিতুল্য করে তোলবার জন্য এই সংস্থাদুটি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল।

কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল ১৭৭৩ খ্রীঃ থেকে ১৯১১ খ্রীঃ পর্যন্ত। রাজধানী দিল্লীতে সরে গেলেও কলকাতার মর্যাদা হ্রাস পায়নি। ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র এবং পূর্ব-এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষায় কলকাতার ভূমিকা ছিল প্রধান। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত কলকাতার ইতিহাস ম্লানরূপ পায়নি।

বর্তমান সংস্করণ প্রসঙ্গ

বিনয়কৃষ্ণের 'কলিকাতার ইতিহাস' বহুকাল আগেই সংগ্রহ করি। আবার ছাপা হবে, আবার এ সময়ের পাঠক বইটি পড়ার সুযোগ পাবে, একথা কখনও মনে হয়নি। শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বইটি ফেলে না রেখে প্রকাশের কথা জানান। বর্তমান সংস্করণের প্রকাশক শ্রীমৃদুল চট্টোপাধ্যায় এই দুর্মূল্যের বাজারে একটি দুঃসাহসিক কাজ করছেন, তা স্বীকার করতেই হবে।

বিনয়কৃষ্ণের রচনায় কলকাতার জনজীবনের ব্যাপক পরিচিতি আছে। প্রাচীনকাল থেকে অন্ততঃ সত্তর বছর আগে পর্যন্ত বিবরণ তিনি লিখেছিলেন। শহরের উৎপত্তি, ইংরেজের আগমন, জনবসতির শুরু, ভূ-বৃত্তান্ত, শিক্ষা প্রসার, বিভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা বাণিজ্য, শহরের বিচার ও শাসন ব্যবস্থা, ছাপাখানা এবং সংবাদপত্র, য়ুরোপীয় ও হিন্দু সমাজ প্রসঙ্গ নিয়ে বিনয়কৃষ্ণ বিস্তৃত আলোচনা করছেন। ভূমিকাংশে তাঁর তথ্যের পরিপূরক কিছু বিবরণ এবং আধুনিক কলকাতার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হল।

কমল চৌধুরী

কলিকাতার ইতিহাস

অর্থাৎ

অতি প্রাচীনকাল হইতে কলিকাতা মহানগরী সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিবরণ।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর কৃত
The Early History and Growth of Calcutta অবলম্বনে

ইংরাজী ভাষায় ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত লেখক, ইংরেজী
ফ্রেজ ইডিয়ম অভিধানের সঙ্কলক, সরল বাঙ্গালা অভিধান
প্রণেতা ও সাহিত্য-সভা হইতে প্রকাশিত সাহিত্য
সংহিতা পত্রিকার সম্পাদক

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত।

কলিকাতা,
৩৮-২ ভবানীচরণ দত্তের স্ট্রীট, 'বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো মেসিন-প্রেসে'
শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৪ সাল।

কলকাতার ইতিহাস ঃ প্রথম অধ্যায়

বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতাকে যে অবস্থায় দেখা যাইতেছে, তাহাতে উহাকে বস্তুতঃ একটি ঐশ্বর্যশালিনী মহানগরী বলা যাইতে পারে। যে স্থান এক্ষণে কলিকাতা বলিয়া পরিচিত, পূর্বে তাহা এরূপ সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল না। ঐ স্থানে একটি সুবিস্তৃত জলা এবং তন্মধ্যে কয়েকটি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। সেই জলাময় গ্রামসমূহের ঈদৃশ পরিবর্তন অদৃষ্টপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব। ইহার সেই প্রাচীন অবস্থার সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনাই হইতে পারে না। এরূপ বিরাট, বিচিত্র, আশু পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে অতীব বিরল। রুশিয়ার স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ সম্রাট পিটার দি গ্রেটের সময়ে সেণ্টপিটার্স নগরের নির্মাণ অত্যন্ত বিস্ময়জনক, সন্দেহ নাই, কিন্তু কলিকাতা নগরীর সংস্থাপন ও ক্রমোন্নতি তদপেক্ষাও আশ্চর্যজনক, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। কি আয়তনে, কি সৌন্দর্যে, কি বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারের গুরুত্ব-বিবেচনায়, এক লণ্ডন নগর ব্যতীত বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের আর কোনও নগরই কলিকাতার সহিত তুলনীয় নহে,—তুলনীয় হইতে পারে না। কলিকাতা যে কেবল ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানী ও সেই সূত্রে ভারতের সর্বপ্রধান শাসনকর্তার ও বঙ্গরাজ্যের প্রাদেশিক শাসনকর্তার প্রধান বাসস্থান, তাহা নহে, প্রত্যুত ইহাকে সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী বলা যাইতে পারে। ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, প্রথমে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সি দুইটির গঠন হয়। সুতরাং প্রথম অবস্থায় কলিকাতা উক্ত দুইটি প্রাচীনতর প্রেসিডেন্সির অধীন ছিল। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতাও একটি প্রেসিডেন্সি নগরে পরিণত এবং অপর দুইটি প্রেসিডেন্সির প্রায় তুল্য অবস্থাতে উন্নীত হয়।

অনন্তর ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট নামক মহাসভা "ইণ্ডিয়ান রেগুলেটিঙ্ য়্যাক্ট" নামে একটি আইন বিধিবদ্ধ করেন। তদ্দ্বারা বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির প্রধান কর্মকর্তা ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল উপাধি পাইয়া ভারতের সর্বপ্রধান শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন, এবং একজন প্রধান বিচারপতি ও তিনজন অধস্তন বিচারপতি সহ সুপ্রীমকোর্ট নামে একটি বিচারালয় স্থাপিত হইল। ঐ সকল বিচারপতি নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা ইংলণ্ডেশ্বরের নিজ হস্তে ন্যস্ত হয়। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিকে ভারতের অপর দুইটি প্রেসিডেন্সির উপর প্রাধান্য অর্পিত হয়। সুতরাং তদবধি বঙ্গীয় কাউন্সিল (অর্থাৎ মন্ত্রিসমাজ) অন্যান্য প্রেসিডেন্সির উপর প্রভুত্ব করিতে লাগিল। কেবল রাজধানী বলিয়া নহে, প্রত্যুত অন্যান্য অনেক কারণে, কলিকাতা ভারতীয় অপরাপর নগরের

অগ্রণী। অধুনা ইহা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল এবং উচ্চবংশীয় ও ধনাঢ্যদিগের সর্বদা গতিবিধির স্থান। পূর্বে যেস্থলে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্বাস্থ্যকর গ্রাম ছিল, তাহাই এক্ষণে স্কুল, কলেজ প্রভৃতি বিদ্যামন্দির, বিবিধ লোকহিতকর অনুষ্ঠানের সভাসমিতি ও কার্যালয়, নানা প্রকার নয়ন-রঞ্জন মনোহর হর্ম্যাবলী, জনসংখ্যার অতি দ্রুতবৃদ্ধি, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্রমোন্নতি, এবং স্থানীয় স্বাস্থ্যোন্নতির কল্যাণে একটি বিশিষ্ট সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যশালী মহানগরে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতার প্রথম অবস্থায় যৎকালে উহা মনুষ্য অপেক্ষা সরীসৃপগণেরই বাসভূমি হইবার অধিকতর উপযুক্ত ছিল, সেই অবস্থার কথা স্মরণ রাখিয়া, তৎপরে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহাতে কিরূপ বিলাসিতা, ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের বৃদ্ধি হইয়াছে; কিরূপ সুপ্রশস্ত প্রস্তরনির্মিত রাজপথসমূহ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া উহার অঙ্গের সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছে, এবং কিরূপ মনোহর অট্টালিকাসমূহ নির্মিত হইয়া উহার "প্রাসাদ-নগর" নামের সার্থকতা সাধন করিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়বিহ্বল হইতে হয়।

তুলনায় আলোচনা করিলে হারুন-আল-রশিদের নগরকেও ইহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। বাঙ্গালার মধ্যে কলিকাতাই এক্ষণে সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান। পল্লীগ্রামের ম্যালেরিয়াপীড়িত লোকেরা রাজধানীর ব্যয়ভার বহন করিতে সমর্থ হইলে, কলিকাতাতেই বাস করিয়া থাকেন। সঙ্গতিশালী জমিদার, সমৃদ্ধ ব্যবহারজিবী, ডাক্তার ও রাজকর্মচারী সকলেই কলিকাতায় বাসস্থান নির্মাণ করিতে ব্যস্ত, কলিকাতায় বাসবাটি নির্মাণ করা যেন জীবনের একটা প্রধান কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ পল্লীগ্রামের পৈতৃক বাসবাটি একেবারে পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হন, তাহা হইলে তিনি কলিকাতার বাড়ীটিকে অন্ততঃ গ্রীষ্মাবাসরূপে ব্যবহার করেন। শরৎকালে কলিকাতা বড়ই অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে। কিন্তু শীতকালে ম্যালেরিয়ার চিহ্নও থাকে না, এবং সে সময়ে নানাপ্রকার মনোমুগ্ধকর প্রলোভনও উপস্থিত হয়। আর্মানী, ইহুদী, পার্শী, মাড়োয়ারী, ফরাসী, গ্রীক, জর্মান, চীনাম্যান—সকল জাতীয় লোকই বাণিজ্যোপলক্ষে কলিকাতার দৃষ্ট হয়, এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই এখানে স্থায়িরূপে বসবাস করিয়াছে। বর্তমান সময়ে কলিকাতাকে ইউরোপীয় নগর বলিলেও হয়, মাড়োয়ারী নগর বলিলেও হয়, আবার বাঙ্গালী নগর বলিলেও হয়।

কোন্ মহানগর কিরূপে সংস্থাপিত হইল এবং কিরূপেই বা তাহার ক্রমোন্নতি ও পরিণতি সাধিত হইল, ইতিহাসপাঠকের নিকট তাহা প্রগাঢ় কৌতূহলের বিষয়, সন্দেহ নাই: নগরের ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করিতে হইলে তাহার অধিবাসি-বর্গের সামাজিক জীবনে, নৈতিক চরিত্র ও ধর্ম, তাহার সূক্ষ্মশিল্প ও শ্রমশিল্প এবং তাহার বাণিজ্য ও বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগ করিতে হয়। যে কোনও নগরের ইতিহাস সূক্ষ্মরূপে পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল

ঘটনা দীর্ঘকাল লোকের স্মৃতিপট হইতে অপনীত হইয়াছে বা যেগুলির কথা এখন আর লোকে ভাবে না, তাহাদের প্রভাব কিরূপ গভীর ও বহুদূরব্যাপী, এবং ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল কারণ আপাতদৃষ্টিতে অতি সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা হইতেও কেমন অতীব গুরুত্ববিশিষ্ট ফলের উদ্ভব হইয়াছে।

ইংরেজের অদম্য উৎসাহ, দূরদর্শিতা, সাহসিকতা ও অধ্যবসায়ের সমুজ্জ্বল নিদর্শন কলিকাতার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত অক্ষরে দুরপনেয়রূপে অঙ্কিত রহিয়াছে। ইংরেজের অনধিগম্য রাজনীতি-কৌশল, নির্ভীকতা ও দৃঢ়তার বলেই যে ইংলণ্ড এই বিশাল ভারতসাম্রাজ্য স্ববশে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাতে মতদ্বৈধ হইতে পারে না। সেই সম্পর্কে এই কলিকাতা নগরে যে সকল অতি গুরুতর ঘটনার সঙ্ঘটন হইয়াছে, তাহা জগতের ইতিহাসের একটি অতীব প্রয়োজনীয় অধ্যায় অধিকার করিয়াছে।

যে স্থানটি এক্ষণে বৈঠকখানা-বাজার নামে পরিচিত, সেই স্থানে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ছায়াতলে উপবিষ্ট হইয়া যেদিন ইংরেজ বণিক্‌দিগের তদানীন্তন এজেন্ট (প্রতিনিধিস্বরূপ কর্মকর্তা) জব্ চার্ণক সাহেব চিন্তান্বিতভাবে তাঁহার হুকা (ফরাসী) হইতে ধূমপান করিতে করিতে কলিকাতাই তাঁহার বণিক্‌প্রভু-দিগের বাণিজ্য-ব্যবসায়ের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক স্থান হইবে বলিয়া মনোনীত করেন, সেদিন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, তিনি তাঁহার স্বদেশীয়-দিগের নিমিত্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন। তৎকালে পাশ্চাত্য জনগণের একটি ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় এক প্রকার সুবর্ণময় দেববৃক্ষ (কল্পতরু) জন্মে। সেই কল্পতরু নাড়া দিয়া স্বর্ণ সংগ্রহ করাই জব চার্ণক-প্রমুখ ইংরেজগণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই নির্বাচন হইতে উত্তরকালে যে এইরূপ শুভফল হইবে, তাহা তিনি কল্পনাতেও মনে স্থান দেন নাই। কোন জাতির ভাবি ভাগ্যফল গণনা করিয়া স্থির করা বড় সহজ কায নয়। ভবিষ্যতের অবগুণ্ঠনের পশ্চাদ্ভাগে বিবিধ শক্তি ক্রিয়া করিতে থাকে। তাহাদের ফলাফল নির্ণয় করা প্রগাঢ় ধীশক্তিসম্পন্ন ও অন্তদর্শী মানবের সাধ্যাতীত। পরে কালক্রমে যখন তাহারা পরিপুষ্ট হইয়া পরিণতিপ্রাপ্ত হয়, সেই উপযুক্ত অবসরেই তাহা লোকলোচনের দৃষ্টিপথবর্তী হয়। যৎকালে জব চার্ণক এই স্থানটি নির্বাচন করেন, তৎকালে অতীব দূরদর্শী ব্যক্তিরাও কল্পনায় আনিতে পারেন নাই যে, কলিকাতা একদিন ইংরেজের ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিণত হইবে।

১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে একটি সমিতির গঠন হইল, এবং পূর্ব-ভারত অঞ্চলে বাণিজ্য-পোত-প্রেরণের নিমিত্ত অর্থ সংগৃহীত হইল, কারণ সে সময়ে পর্তুগীজ-জাতি ঐ অঞ্চলে একরূপ একচেটিয়া বাণিজ্য করিতেছিল। পরে ভারতবর্ষে ওলন্দাজদিগের প্রভাব দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া কতকগুলি ইংরেজ বণিক্ উক্ত

অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লর্ড মেয়রকে সভাপতি করিয়া এক সভা করিলেন। সেই সভায় স্থির হইল যে, ভারতবর্ষের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে, বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত একটি সমিতির গঠন করা হইবে। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের অভিপ্রায়ানুসারে সার জন্ মিলডেন্হল নামক এক সম্ভ্রান্ত সাহেব ইংরেজ কোম্পানির অনুকূলে বিশেষ বাণিজ্যাধিকারের প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত কন্স্টান্টিনোপলের পথ দিয়া প্রবল-প্রতাপ মোগল সম্রাটের নিকট প্রেরিত হইলেন। ভারতবর্ষ অপরিমেয় ধনের অক্ষয় ভাণ্ডার, এই জনশ্রুতি বহু ইংরেজের মনে ঔৎসুক্য ও উৎসাহ উদ্দীপিত করিয়া দিল। স্থলপথে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বাণিজ্য করিয়া বিদেশে ধনার্জন করাই উদ্যমশীল, ইংরেজদিগের প্রধান বাসনা হইয়া উঠিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে, মহারাণী এলিজাবেথের রাজত্বের শেষভাগে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজকীয় সনন্দ লাভ করিয়া বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। কথিত আছে যে, তাঁহারা ৩০,১৩৩ পাউণ্ড ৫ শিলিং ৮ পেন্স (অর্থাৎ বর্তমান বিনিময়ের হারে প্রায় ৪,৫২,০০০ টাকা) মূলধন লইয়া কার্যারম্ভ করেন, ঐ মূলধন ১০১ অংশে বিভক্ত ছিল। ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে ১৬৪৫ অব্দে কোম্পানি আবার নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন।

ক্রমওয়েলের সময়ে কিছুদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বিলুপ্ত হইল। পরন্তু তিনি পরে উহার পুনর্গঠনের অনুমতি প্রদান করিয়া উহার যাবতীয় পূর্ব অধিকার প্রত্যর্পণ করিলেন। কেবল তাহাই নহে, ওলন্দাজদিগের দ্বারা কোম্পানির পুনঃপুনঃ ক্ষতি সাধিত হওয়ায় ক্রমওয়েল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতি এতাদৃশ সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া পড়িলেন যে, তিনি কোম্পানির পক্ষ-অবলম্বন করিয়া ১৬৫২ অব্দে ওলন্দাজদিগের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিলেন। কোম্পানির মূলধন তৎকালে ৭,৪০,০০০ পাউণ্ডে উঠিয়াছিল। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় চার্লস কোম্পানিকে আরও অধিকতর অধিকার প্রদান করেন। তাহাতে তাহাদের বাণিজ্য কেবল যে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত হইল তাহা নহে, পরন্তু মোগল রাজসভায় সার টমাস রো নামক একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টার ফলে তাঁহারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে কুঠি নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সার টমাস রো ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের প্রতিনিধি ও দূতস্বরূপে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তৎকালে মোগল সম্রাট জাহাঁগীর হিন্দুস্থানের রাজচক্রবর্তী ছিলেন। ভারত ইতিহাসের পাঠক-মাত্রেই অবগত আছেন যে, জাহাঁগীর ইংরেজদিগের প্রতি সাতিশয় প্রসন্ন ছিলেন। ইংরেজেরা তাঁহার প্রীতির পাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগের উপর প্রভূত অনুগ্রহ ও অধিকার অজস্র বর্ষণ করিয়াছিলেন।

কোম্পানির অংশীদারদিগের মধ্যে প্রথমতঃ পঞ্চদশ জন ও তৎপরে চতুর্বিংশ জন নির্বাচিত করিয়া একটি 'কমিটির' গঠন হইল। 'কমিটি' হইলেই তাঁহার একজন সভাপতি থাকা আবশ্যক। এ কমিটিতেও একজন সভাপতি হইলেন।

এই কমিটির নাম হইল "কোর্ট অব ডিরেক্টরস্" (অর্থাৎ পরিচালকগণের সভা)। নবগঠিত ডিরেক্টর সভা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যাবতীয় বিষয়কর্মের তত্ত্বাবধান করিতেন। এই সভা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল,—প্রথম ভাগ কোম্পানির আয়-ব্যয় সম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন, দ্বিতীয় ভাগ রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে কর্তৃত্ব করিতেন, এবং তৃতীয় ভাগ রাজ্যশাসন ও বিচার-সম্বন্ধীয় কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। এই তিন বিভাগের প্রত্যেকটিতে আটজন করিয়া সদস্য থাকিতেন। এতদ্ভিন্ন আর একটি গুপ্ত 'কমিটি' ছিল। সমরঘোষণা, সন্ধিস্থাপন এবং অপরাপর রাজনৈতিক ব্যাপারের পরিচালনভার এই কমিটির হস্তে ন্যস্ত ছিল। বলা বাহুল্য যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক শক্তি ও প্রভাবের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার আইন, নিয়ম ও বিধিসমূহ প্রসারিত ও অবস্থানুসারে পরিবর্তিত হইতে লাগিল। পরন্তু ভারতে কোম্পানির রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত প্রকৃতপক্ষে ১৭৫৬ অব্দে আবদ্ধ হইয়াছিল, এ কথা বলা যাইতে পারে।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট মহাসভা "বোর্ড অব কনট্রোল" নামে একটি সমিতির গঠন করিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর সভা যে সকল রিজোলিউশন পাশ করিতেন, সেইগুলির তত্ত্বাবধান করাই এই নবগঠিত সমিতির প্রধান কর্তব্য স্থিরীকৃত হয়। ইংরেজাধিকৃত ভারতসাম্রাজ্যের শাসনের ভারার্পণ নিম্নলিখিতরূপ হয়; যথা:

১। পার্লামেণ্টের হস্তে। এরূপ স্থলে এই কথাটিতে ইংলণ্ডেশ্বর এবং হাউস্ অব লর্ডস্ ও হাউস্ অব কমনস্ নামক দুইটি সমাজ বুঝায়। কোনও আইন করিতে হইলে, ইহাদের সম্মিলিত অনুমোদন আবশ্যক।

২। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ৬০০১,০০০ পাউণ্ড মূলধনের মধ্যে যাহাদের কোনও নির্ধারিত পরিমাণ অংশ আছে, এরূপ অংশীদারদিগের দ্বারা নির্বাচিত কোর্ট অব ডিরেক্টর নামক সভার হস্তে।

৩। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অংশীভূত বোর্ড অব্ কনট্রোল নামক মন্ত্রি-সমাজের হস্তে।

৪। ভারতবর্ষ গবর্ণর জেনারেলের হস্তে। তিনি কলিকাতায় থাকিবেন, এবং অধিকন্তু বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির প্রাদেশিক শাসনকর্তা হইবেন।

৫। অবশিষ্ট তিনটি প্রেসিডেন্সির—অর্থাৎ মাদ্রাজ, বোম্বাই ও আগ্রা * প্রদেশের তিনজন গবর্ণরের হস্তে।

১৮৩৩ অব্দে পার্লামেণ্ট পশ্চাল্লিখিতরূপ নিয়ম করিয়া কোম্পানির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন:

---

* ১৮৪০ অব্দে বা তৎসমকালে আগ্রা প্রেসিডেন্সী বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল।

১। কোম্পানির কেবল রাজনৈতিক অধিকারগুলি থাকিবে; অর্থাৎ বোর্ড অব্ কন্‌ট্রোলের তত্ত্বাবধানাধীনে ভারত সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন।

২। কোম্পানির আর বণিক্ সমিতি থাকিবে না, এবং তাহার ফলে কোম্পানির ভারতবর্ষ ও চীনদেশের সহিত একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার অধিকার বিলুপ্ত হইবে।

৩। বৃটিশ প্রজামাত্রেই ঐ দুই দেশের সহিত অবাধে বাণিজ্য করিতে পারিবে।

৪। বৃটিশ প্রজারা কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে বৃটিশ ভারতে বাস করিতে পাইবে (বলা বাহুল্য, এ অধিকার তাহাদের পূর্বে ছিল না)।

১৮৫৮ অব্দ পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অস্তিত্ব ছিল। উক্ত অব্দে সিপাহী বিদ্রোহ দমনের পর, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডেশ্বরের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন সাম্রাজ্যের একটি অংশ হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কলকাতার প্রাচীন বিবরণ

কিঞ্চিদধিক দুই শতাব্দী হইল, কলিকাতা ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে। ঐ সময় হইতেই কলিকাতার উন্নতির প্রারম্ভ। ১৭৫২ অব্দে হলওয়েল সাহেব জমিদারের পদ গ্রহণ করিলেন; এই সময়ে তিনি ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কালের কোনও দলিল-দস্তাবেজ ও কাগজ-পত্রাদি না পাইয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। এইরূপ কথিত আছে যে, ১৭৩৮ সালের প্রবল ঝটিকাবর্তে ও বন্যায় প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান্ দলিলপত্র সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং উই পোকাতেও অনেক মূল্যবান্ কাগজপত্র খাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। কেহ কেহ এমন কথা বলিয়াও অনুযোগ করেন যে, অধস্তন কর্মচারীদিগের তাচ্ছিল্য ও অনবধানতায় মূল্যবান্ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নষ্ট হইয়াছিল। যে অবস্থা বা কারণ পরম্পরায় ঐ সকল বহু মূল্য কাগজ-পত্র নষ্ট হইয়া থাকুক না কেন, কোনরূপ হেতুবাদেই তাহার মার্জনা হইতে পারে না। পরন্তু ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদিগের অনুচিত প্রশ্রয়প্রদান এবং তাঁহাদের অনবধানতা এই গুরুতর ক্ষতির অন্যতম প্রধান কারণ। সে যাহা হউক, হলওয়েল সাহেব বলেন যে, ১৭৩২ সাল হইতে তিনি কাগজপত্র

রক্ষার দিকে প্রকৃত প্রস্তাবে আন্তরিকভাবে দৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করেন। তিনি লিখিয়াছেন:

"এদিকে দৃষ্টি করিবার আমার অধিক অবসর ছিল না; কিন্তু তথাপি যে কিছু সামান্য অবসর পাইয়াছি, তাহাতে যতদূর হইয়া উঠে, আমি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবশিষ্ট পুরাতন দলিলপত্র গুছাইবার সময়ে যে-সকল কাগজপত্র ইহার পূর্ব-ইতিহাসের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে, সেগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছি। পরন্তু কাগজপত্রগুলি বহু বৎসর ধরিয়া আফিসে বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়িয়া আছে, আবার আর্দ্রতায়, উই পোকার দ্বারা এবং অনবধানতায় ক্রমশঃ উহার অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

কলিকাতার ইতিবৃত্তের উপাদান সংগ্রহের অভিলাষী হইলে প্রধানতঃ ভারতীয় আফিসের লাইব্রেরীতেই অনুসন্ধান করা আবশ্যক। জনৈক লেখক লিখিয়াছেন: 'লণ্ডন নগরের ইণ্ডিয়ান হাউস নামক কার্যালয়ে গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্রগুলি পুস্তকাকারে খণ্ডে খণ্ডে বাঁধাইয়া রাখা হইয়াছে; ঐ সকল খণ্ড গণনায় এক লক্ষ হইবে, এবং সেগুলি কলিকাতার ইতিহাস লেখকের পক্ষে অতি বিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডার-স্বরূপ। উক্ত লেখক বলেন যে, ১৭১৭ অব্দে কলিকাতা নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত একটি সামান্য পল্লীগ্রাম বলিয়া পরিচিত। তথায় কেবল কতকগুলি কৃষিজীবী চাষা এবং মৎস্যজীবী জেলের বাস ছিল। ঐ সকল সরল ও নিরীহ লোক তৃণাচ্ছাদিত কুটীরে বাস করিত, এবং স্থানে স্থানে তাহাদের ১০।১২টি কুটীরের একত্র সমাবেশ ছিল। বাসের এইরূপ ব্যবস্থা বঙ্গের সুদূর পল্লীগ্রামসমূহে অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালে কলিকাতা জঙ্গলময় ছিল, সুতরাং ঐ স্থান যে সে সময়ে সুন্দরবনেরই একাংশ ছিল, একথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। কলিকাতা তখন একটা জলাময় স্থান ছিল। তৎকালে স্থানে স্থানে যে সকল জঞ্জাল আবর্জনা স্তূপাকার করা থাকিত এবং যে সকল জলকুণ্ড নিঃসরণাভাবে পড়িয়া পচিত, তাহাতে যে স্থানীয় অস্বাস্থ্যকরতা শতগুণে বর্দ্ধিত করিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? পূর্বোক্ত শ্রেণীর অসভ্য অধিবাসীরা সেই স্থানের স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে কোনরূপ সদুপায় অবলম্বন করিবে, এরূপ আশা করা বিড়ম্বনামাত্র। স্থানে স্থানে যে সকল পুষ্করিণী ছিল, সেগুলি রোগের আগারস্বরূপ ছিল। বনজঙ্গল, মৃত্তিকার আর্দ্রতা, সুন্দরবন হইতে অবিশুদ্ধ বায়ু কলিকাতার সন্নিহিত লবণ-জলের হ্রদ—এগুলি সমস্তই উহার অস্বাস্থ্যকরতার মূলীভূত কারণ ছিল। সুতরাং কলিকাতা তৎকালে অস্বাস্থ্যকরতার মূর্তিমান প্রতিরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

যে সকল স্থান বর্তমান সময়ে শিয়ালদহ ও বউবাজার বলিয়া প্রসিদ্ধ, ঐ সমস্ত স্থান পর্যন্ত লবণ-জলের হ্রদটি বিস্তৃত ছিল। এই সকল ভৌতিক পদার্থ অপেক্ষা নানাপ্রকার জীবজন্তুও অল্প ভীতির কারণ ছিল না। বন্য শূকর, কুম্ভীর, হাঙ্গর, নানাজাতীয় সরীসৃপ ও ব্যাঘ্র বিস্তর ছিল। তদ্ভিন্ন দস্যু-

তস্করের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব থাকায় ইতর প্রাণীর ন্যায় মনুষ্যও মনুষ্যের পরম শত্রু ছিল। এই সকল বিষম অসুবিধা সত্ত্বেও কিজন্য জব চার্ণক সাহেব ইহাকে বাঙ্গালার প্রধান বাণিজ্যস্থানরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে ভাবিতে গেলেও বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়। উত্তরকালে ইহা বিশাল নগরে পরিণত হইয়া গৌরব-গরিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, এইরূপ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি এই স্থানটি নির্বাচন করিয়াছিলেন, এই কথা বলিয়া তাঁহাব দূরদর্শিতার প্রশংসা করিতে যাওয়া এক প্রকার বাতুলতা মাত্র; বরং ইহাতে এইরূপ অনুমান করাই অধিকতর সঙ্গত যে, যন্ত্র যেরূপ নিজে বোধশক্তিহীন হইয়া যন্ত্রাব পরিচালন-কৌশলে তাহার ইচ্ছানুরূপ কার্যের সমাধা করে, জবচার্ণকও সেইরূপ দুর্বোধ্য ঐশিক বিধানের পরিচালনাধীনে বোধশক্তিহীন যন্ত্রের ন্যায় সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার এই নির্বাচনের হেতু যাহাই হউক না কেন, ইহার উত্তরকালীন পরিণাম তাঁহার সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিতেছে; সুতরাং আজ তাঁহাকে "সুপ্রসিদ্ধ জব চার্ণক,—প্রাচ্য ভূখণ্ডে ইংরেজদিগের মধ্যে প্রথম খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি"—এইরূপ বলিয়া বর্ণনা করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

তিনটি মৃত্তিকাময় গ্রাম (ডিহি কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি) হইতে বর্তমান কলিকাতা উৎপন্ন হইয়াছে। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে হলওয়েল সাহেব গ্রামত্রয়ের পরিমাণফল এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, যথা—

ডিহি কলিকাতা	..	বিঘা	১,৭০৪/৩ কাঠা।
সুতানুটী	...	”	১,৮৬১॥৭২॥ কাঠা।
গোবিন্দপুর	.	”	১,০৪১॥৩॥ কাঠা।

১৭৫৭ অব্দে কলিকাতার চতুঃসীমা এইরূপ নির্দিষ্ট ছিল,—বর্তমানে যে স্থানে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ও চাঁদপাল ঘাট অবস্থিত, সেইখান হইতে আরম্ভ করিয়া চৌরঙ্গি রোড ভেদ করিয়া লবণ জলের হ্রদ পর্যন্ত যে খাড়ি বিস্তৃত ছিল, সে খাড়ির উত্তর; লালবাজার ও চিৎপুর রোডের পশ্চিম; বড়বাজারের দক্ষিণ এবং ভাগীরথী নদীর পূর্ব। এই চতুঃসীমাব বহির্ভূত তাবৎ স্থানকে মহাদেশ বলিত, কেন-না খাড়ি, নদী ও মারহাট্টা খাত দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া কলিকাতা একটি দ্বীপস্বরূপ ছিল।"

'১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা যখন জমিদারীরূপে ক্রীত হয়, তৎকালে ইহার পরিমাণ ফল ১॥৹ বর্গ মাইল মাত্র ছিল। কলিকাতা সে সময়ে একটি বাণিজ্যিক উপনিবেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।'

নগরের যে অংশের মধ্য দিয়া চিৎপুর রোড বিস্তৃত, তাহাই পূর্বকালের সুতানুটি। যে ঘাট এক্ষণে হাটখোলা ঘাট নামে পরিচিত, তাহাই প্রায় এক শতাব্দীকাল সুতানুটি ঘাট নামে প্রসিদ্ধ ছিল, এবং তাহারই অতি নিকটে সুতানুটী বাজার নামে একটি প্রকাণ্ড বাজার ছিল। ১৮৫০ সালের ২৩ আইন

অনুসারে সমস্ত কলিকাতা যখন জরিপ করা হয়, তখন সুতানুটীর চতুঃসীমা এইরূপ নির্দিষ্ট হয়ঃ—বাগবাজার খালের (মারহাট্টা খাতের) দক্ষিণ, আপার সার্কুলার রোডের পশ্চিম, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট নামক রাস্তার উত্তর, ভাগীরথী নদীর পূর্ব। গোবিন্দপুর একটা শৃঙ্খলাশূন্য অদ্ভুতদৃশ্য গ্রাম ছিল—স্থানে স্থানে কতকগুলি করিয়া কুটীরের সমাবেশ, আর সেই কুটীরসমষ্টির মধ্যে মধ্যে বনজঙ্গল। বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়াম নামক দুর্গ ও তৎসন্নিহিত ময়দান গোবিন্দপুরের স্থান অধিকার করিয়াছে।

বাঙ্গালায় কোম্পানির প্রথম বাণিজ্যিক উপনিবেশ হুগলী। ১৬৪৬ (১৬৪৬ ?) খ্রীষ্টাব্দে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে বা পরে ইংরেজেরা তথায় একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। কোনও সাময়িক পত্রে জনৈক লেখক এইরূপ লিখিয়াছেনঃ 'রাণী এলিজাবেথের রাজত্বের প্রথম ভাগে অক্সফোর্ড নগরের নিউ কলেজের স্টিফেন্স নামক জনৈক ইংরেজ ছাত্র একাকী পর্যটন করিয়া প্রবলপ্রতাপ সুপ্রসিদ্ধ মোগল সম্রাটের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রাচ্য রাজসভার যে সকল ঐশ্বর্য আড়ম্বরের কথা ঐতিহাসিকেরা লিখিয়া গিয়াছেন এবং কবিরা গাহিয়া গিয়াছেন, সেই সকল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ঐ অক্সফোর্ডবাসী যুবক যে সকল বিবরণ স্বদেশে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তৎপাঠে পর্যটকগণ সুদূর প্রাচ্য ভূখণ্ডে পরিভ্রমণ করিবার নিমিত্ত নবানুরাগে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন। ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে নিউবেরি ও ফিচ নামক দুইজন সাহেব মহারাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে সম্রাট আকবরের নামে একখানি পত্র লইয়া স্থলপথে সীরিয়া দিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হন। ফিচ সাহেব সে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সেই বিবরণ হইতে ষোড়শ শতাব্দীতে এই দেশের ও ইহার অধিবাসীবর্গের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার অনেক প্রয়োজনীয় কথাই আমরা জানিতে পারি।

ইংরেজদিগের হুগলীতে অবস্থান কালে দুর্ভাগ্যক্রমে সামান্য একটা বাজারে ঝগড়া লইয়া নবাবের ফৌজের সহিত ইংরেজদিগের বিবাদ উপস্থিত হয় এবং সেই সূত্রে কোম্পানিকে হুগলী পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হয়। ঘটনাটা এইঃ হুগলী তৎকালে ফৌজদার উপাধিধারী জনৈক মুসলমান রাজকর্মচারীর শাসনাধীন ছিল। ঐ ব্যক্তি স্বেচ্ছানুসারে কার্য করিবার ক্ষমতা পাইয়াছিল, তাহার উপর তাহার লোকবলও যথেষ্ট ছিল, এজন্য সে বিদেশীদিগকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করিত এবং তাহাদের নিকট হইতে যাহা লইতে পারিত, তাহাই লইয়া আপনার অর্থলালসা চরিতার্থ করিত। ইংরেজদিগের সংখ্যা অতি অল্প ছিল; সুতরাং তাঁহাদের সেই অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আপনার স্বার্থসাধন করিতে লাগিল। তাহার এই সকল অন্যায় অত্যাচার ও জুলুম জবরদস্তিতে ডিরেক্টর-সভা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের হুগলীস্থ এজেণ্টকে

এইরূপ আদেশ করিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহাদের মালগুদাম নির্মাণ করিবার জন্য ও গড়-দুর্গাদি দৃঢ় করিবার নিমিত্ত নবারের নিকট যেন কিছু ভূমি প্রার্থনা করা হয়, এবং সমস্ত বিষয় যেন মোগল সম্রাটের নিকট নিবেদন করা হয়। ক্রমশঃ ফৌজদার ইংরেজদিগের প্রতি জুলুম করিয়া আরও অধিক অর্থের দাবি করায় অবস্থা চরমে উঠিল এবং পূর্বোক্ত বিবাদ উপস্থিত হইল। অনন্তর নবারের নিকট এবং তৎপরে মোগল সম্রাটের নিকট আপীল করা হইল, কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হইল না। ইতিমধ্যে ইংরেজদিগের বাণিজ্য রহিত হইয়া গেল, এবং তাঁহাদিগের জাহাজগুলি অর্ধপূর্ণ অবস্থাতেই তথা হইতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

ইংলণ্ডের দ্বিতীয় জেমস ভারতবর্ষে ইংরেজ বণিকদিগের দুর্দশার কথা শুনিয়া কোম্পানির পক্ষ অবলম্বন করিলেন, এবং সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সহিত তাঁহাদের সমরে প্রবৃত্ত হইবার প্রার্থনায় অনুমোদন করিলেন। ইংলণ্ডের সামরিক নৌ-বিভাগ হইতে দশখানি জাহাজ কাপ্তেন নিকলসন নামক জনৈক সেনাপতির নেতৃত্বাধীনে প্রেরিত হইল; জাহাজগুলিতে ১২ হইতে ৭০টি পর্যন্ত কামান সজ্জিত ছিল। নিকলসনের প্রতি এই অনুমতি ছিল যে, বন্দরে বহুস্থান পর্যন্ত তিনি পোতবহরের কর্তৃত্ব করিবেন, কিন্তু পোতবহর বন্দরে উপস্থিত হইবামাত্র হুগলীর প্রধান ইংরেজ কর্মকর্তা তাঁহার পদ গ্রহণ করিয়া প্রধান নৌ-সেনাপতি-রূপে সমস্ত বহরের অধ্যক্ষতা করিবেন, আর জাহাজে যে ছয় দল পদাতিক সৈন্য ছিল, কাউন্সিলের সদস্যগণ তাহাদের নেতৃত্ব করিবেন। নিকলসনের প্রতি আদেশ ছিল যে, তিনি ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৬৬ লক্ষ টাকার দাবি করিবেন এবং আবশ্যক হইলে বলপ্রকাশ করিয়া কামানের মুখে সেই টাকা আদায় করিয়া লইবেন। এই পোতবহরের কয়েকখানি মাত্র জাহাজ হুগলীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এজেন্ট সাহেব সোদ্বেগে অবশিষ্ট জাহাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে ঐ জাহাজের তিনজন নাবিকের মদমত্ত অবস্থার সামান্য ঝগড়া লইয়া উভয় পক্ষে প্রকাশ্য যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

কাপ্তেন নিকলসন এইরূপ সুন্দর ছল পাইয়া নগরের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ৫০০ গৃহে আগুন লাগাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, এরূপ অবস্থায় গোলযোগের আপস-নিষ্পত্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইল। পরন্তু ফৌজদার ভয় পাইয়া যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা করিল এবং সেই সঙ্গে নিকলসন সাহেবের দাবি সম্রাটের বিবেচনার্থ তাঁহার গোচর করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিল। অতঃপর ইংরেজেরা হুগলী পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ বরানগরের ওলন্দাজ উপনিবেশের পূর্বদিকস্থ* সুতানুটি নামক গ্রামে আগমন

* রাজা বাহাদুর এই স্থলে টীকা করিয়া বলিয়াছেন—পূর্ব না হইয়া উত্তর হইবে, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় দক্ষিণ হওয়াই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।—অনুবাদক।

করিলেন। ইতিমধ্যে নবাবের সৈন্য ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলে চার্ণক সাহেব এই কার্যকে সন্ধির নিয়ম-ভঙ্গ মনে করিয়া টান্না ও ইঞ্জেলি (হিজলি) নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলিতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও লুটপাট আরম্ভ করিয়া দিলেন, এবং শেষোক্ত স্থানটি গ্রহণ করিয়া গড়বন্দী করিয়া ফেলিলেন। স্টাণ্ডেল সাহেব হিজলিকে যতদূর সম্ভব কদর্য স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, উহা একটি নিম্ন জলাভূমি, সর্বত্রই লম্বা লম্বা ঘাসে সমাচ্ছন্ন, ঐ স্থানে জোয়ারের ও বানের লোনা জল উঠিত, এবং উহাতে এক বিন্দুও ভাল জল পাইবার উপায় ছিল না। এইরূপ কদর্য স্থানে ইংরেজদিগের অর্ধেক সৈন্য নষ্ট হইল এবং নবাবের ফৌজও প্রায়ই মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল।

এদিকে নিকলসন সাহেব হুগলী লুণ্ঠন না করিয়া ফৌজদারের সহিত সন্ধি করায় ডিরেক্টর সভা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং ডিফায়েন্স নামক একখানি ছোট জাহাজে ১৬০ জন লোক পূর্ণ করিয়া হীথ সাহেবের নেতৃত্বাধীনে পাঠাইয়া দিলেন। হীথ সাহেবের উপর আদেশ হইল যে, হয় তিনি যুদ্ধে সহায়তা করিবেন, অথবা শত্রুপক্ষের সহিত আপস নিষ্পত্তি হইয়া গিয়া থাকিলে কোম্পানির যাবতীয় লোকজন ও দ্রব্যসামগ্রী জাহাজে তুলিয়া লইয়া আসিবেন। ১৬৮০ সালে হীথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বালেশ্বরে অবতীর্ণ হইয়া তথাকার কামানের আড্ডা আক্রমণ করিয়া নগর লুণ্ঠন করিলেন। অনন্তর তিনি কোম্পানির যাবতীয় কর্মচারী ও ভৃত্যগণকে লইয়া চট্টগ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং জনৈক আরাকানী রাজার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার পর, তিনি সহসা মাদ্রাজ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া কোম্পানির লোকজনকে নামাইয়া দিলেন। অতঃপর কয়েক বৎসর ইংরেজদিগের নানাপ্রকার অভূতপূর্ব ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিল—কোম্পানির অস্ত্রবলে বাঙ্গালার স্থানাধিকারের সর্বপ্রকার চেষ্টাই বিফল হইল এবং তাহাতে তাঁহাদের বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক উপনিবেশগুলি সমস্তই সম্পূর্ণ ধ্বংসমুখে পতিত হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। অবশেষে ইংরেজরা বাধ্য হইয়া নবাবের সহিত সন্ধি করিলেন, এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে উলুবেড়িয়ার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তৎকালে ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন। পরন্তু এই নূতন স্থানও অসুবিধাজনক বিবেচিত হওয়ায় চার্ণক সাহেব কোনও দুর্বোধ্য হেতুতে সুতানুটি মনোনীত করিলেন, এবং অবশেষে তথায় কুঠি স্থাপন করিলেন। ইহার নিমিত্ত তিনি মোগল রাজসরকারে বাণিজ্য-শুল্কের পরিবর্তে বার্ষিক ৩,০০০ টাকা পেসকশ দিবেন, এইরূপ স্থির হইল।

এ. স্টিফেন নামক একজন সাহেব লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ চার্ণক সাহেবকে তাঁহার পূর্ব বাণিজ্যস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। অবশেষে চার্ণক সাহেব এই অনুরোধ রক্ষা করিলেন এবং রাশি রাশি পণ্যদ্রব্য লইয়া সুতানুটীতে অবতীর্ণ

হইলেন। ২৭শে এপ্রিল তারিখে তিনি একটি ফর্মান (সনন্দ) প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে সম্রাট এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ইংরেজরা যে তাঁহাদের পূর্ব অন্যায় আচরণ ও কার্যের জন্য অনুতাপ করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, এইজন্যই তাঁহাদিগকে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইল।

অপর একজন লেখকের মত এই যে, ইংরেজদিগের যে সকল দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার ক্ষতিপূরণস্বরূপ সম্রাট ঔরঙ্গজেব ৬০ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হন এবং তদনুসারে ১৬৯০ সালের ২৪শে আগস্ট তারিখে চার্ণক সাহেব ভাগীরথীর তীরে ইংলণ্ডের পতাকা প্রোথিত করিয়া কলিকাতা মহানগরীর ভিত্তি স্থাপন করেন।

১৬৯২ সালের জানুয়ারি মাসে জব চার্ণক কালগ্রাসে পতিত হইলে সার জন গুলড্‌স্‌বরো নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ কলিকাতার প্রধান এজেন্ট নিযুক্ত হন। তৎকালে সমুদয় ব্যাপারই এরূপ বিশৃঙ্খল ও কদর্য অবস্থাপন্ন ছিল যে, কোনও লোককেই বিশ্বাস করিয়া চলিবার উপায় ছিল না। সে যাহা হউক, ১৬৯৪-৯৫ অব্দে ডিরেক্টর সভা সুতানুটিকেই তাঁহাদের বাঙ্গালার প্রধান বাণিজ্য স্থান বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং উহার নিকটবর্তী অন্যান্য গ্রামগুলিও বন্দোবস্ত কবিয়া লইবার নিমিত্ত তাহাদের প্রধান প্রধান এজেন্টের প্রতি আদেশ প্রেরণ করিলেন। ১৬৯৬-৯৭ অব্দে বর্ধমানের জমিদার শোভাসিংহ যৎকালে বিদ্রোহ উপস্থিত করেন, তৎকালে ইংরেজরা সেই সুযোগে আপনাদের বাণিজ্য-স্থানগুলি শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা কবিবার উদ্দেশ্যে দুর্গাদি নির্মাণদ্বারা সেগুলিকে সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত মোগল সরকারের অনুমতি গ্রহণ করেন। তদনুসারে কলিকাতায় সেই পূর্ব ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মিত হয়, এবং ১৬৯৯ অব্দে উহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইলে ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা তৃতীয় উইলিয়মের অনুমতি ক্রমে তাঁহার নামানুসারে উহার নামকরণ করা হয়। প্রায় ইহারই সমকালে ওলন্দাজেরা চুঁচূড়ায় ফোর্ট গস্টভাস নামক দুর্গ নির্মাণ করেন এবং ফরাসীরাও চন্দ্রনগরে (ফরাসডাঙ্গায়) তাঁহাদের একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। নবাবও সুতানুটিতে ইংরেজদিগের স্বত্ব সাবাস্থ করিয়া দিবার নিমিত্ত একটি "নিসান" প্রেরণ করেন, এবং তাহারই বলে ইংরেজরা সুতানুটির সন্নিহিত কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামক গ্রামদ্বয় জমা করিয়া লন।

ইংরেজদিগের বাণিজ্যিক উপনিবেশরূপে কলিকাতার নির্বাচন ব্যাপার সম্বন্ধে গ্ল্যাডউইন সাহেবের "বেঙ্গল" নামক পুস্তকে আর এক প্রকার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মর্ম এইরূপঃ যৎকালে ইংরেজরা মাধ্যাহ্নিক আহারে (খানায়) বসিয়াছিলেন, সেই দিবা দ্বিপ্রহরে হুগলীস্থিত ইংরেজদিগের কুঠি সহসা সশব্দে নদীগর্ভে বসিয়া যাওয়ায় কয়েকজন লোক মারা গেল, এবং অবশিষ্ট কয়েকজন অতি কষ্টে প্রাণরক্ষা করিল, কিন্তু তাহাদের পণ্যদ্রব্য ও

অর্থাদি সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হইল। এই দুর্ঘটনা হেতু গবর্ণর চার্ণক আর একটি স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি হুগলীর নিকটেই একটি স্থান মনোনীত করিলেন এবং তথায় কুঠি নির্মাণ করিয়া দুর্গাদি দ্বারা তাহা সুদৃঢ় করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দেশীয় বণিকেরা অনুযোগ করিতে লাগিল যে, ইংরেজদিগের অনেকগুলি গৃহ দ্বিতল এবং সেই উচ্চ গৃহ হইতে তাঁহারা দেশীয়দিগের পুরাঙ্গনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। অনন্তর দেশীয়রা মুর্শিদাবাদে যাইয়া অভিযোগ উপস্থিত করিলে, নবাব হুকুম করিয়া পাঠাইলেন যে, ইংরেজদিগের কুঠি নির্মাণকার্য যেন সমাপ্ত করা না হয়। এই কথা শুনিয়া মজুরেরা কাজ করিতে অস্বীকার করিল। তখন চার্ণক সাহেব নদীর সেই পার্শ্বের যাবতীয় গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া, একখানি জাহাজে আরোহণ করিলেন। ফৌজদার (কলিকাতার নিকটস্থ) মকুয়া থানার থানাদারকে সেই জাহাজ ধরিবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। ইতিপূর্বে আরাকানী ও মগ বোম্বেটেরা ভাগীরথী নদীতে যারপরনাই দৌরাত্ম্য ও লুণ্ঠনাদি করিত বলিয়া তাহাদের গতিরোধ করিবার নিমিত্ত একটি প্রকাণ্ড ও সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খল নির্মিত হইয়াছিল। নদীর এপার হইতে ওপার পর্যন্ত সেই শৃঙ্খল বিস্তৃত করিয়া দিল, কিন্তু ইংরেজেরা শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া চলিয়া গেলেন। ইংরেজদিগের জাহাজ একবার দুর্ভিক্ষের সময়ে আলমগীরের শিবিরে শস্য সরবরাহ করায়, মোগল সম্রাট চার্ণকের প্রতি প্রসন্ন ও অনুকূল হইলেন এবং তাঁহাকে কলিকাতায় কুঠি নির্মাণ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কেবলমাত্র ১৬ হাজার টাকা মূল্যে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা—এই তিনখানি গ্রাম ও তৎসংলগ্ন ভূমি ক্রয় করেন। উক্ত ভূমি ভাগীরথীর পূর্ব পারে নদীর ধার দিয়া দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন মাইল এবং প্রস্থে প্রায় এক মাইল বিস্তৃত হইল। উক্ত গ্রামত্রয় ঠিক কোন সময়ে কেবল "কলিকাতা" আখ্যায় আখ্যাত ও পরিচিত হইতে আরম্ভ করে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কখনও উহা "পরগণা কলিকাতা" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; আবার ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের দলিলপত্রে "কলিকাতার অন্তর্গত সুতানুটি প্রভৃতি গ্রামসমূহ"—এইরূপ উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। আজ-কাল গোবিন্দপুর এবং সুতানটির নাম আর শুনিতে পাওয়া যায় না। "আর্মানীদিগের ইতিহাস" নামক একখানি সুন্দর ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লিখিত আছে যে, খোজা সারহিড ইজরেল নামক একজন আর্মানী সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পৌত্র ও বাঙ্গালার সুবাদার কুমার আজিম ওসমানের নিকট এই তিনখানি গ্রামের পূর্বাধিকারীদিগের নিকট হইতে উহা ক্রয় করিবার অনুমতি লাভ করিবার নিমিত্ত প্রভূত শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে বিদ্রোহী পাঠান সর্দার রহিম খাঁকে দমন করিবার নিমিত্ত সম্রাট ঔরঙ্গজেব যৎকালে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ নির্ভীক সেনাপতি জবরদস্ত খাঁকে প্রেরণ করেন; সেই সময়ে উক্ত আর্মানী

ইংরেজদিগের পলিটিকাল এজেন্ট (রাজনৈতিক প্রতিনিধি) রূপে জবরদস্ত খাঁর সভায় উপস্থিত হইয়া ইংরেজদিগের সপক্ষে এই গ্রামগুলি লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তৎকালে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক মালিসন বলেন, স্টানলি নামক এক সাহেব পূর্বোক্ত গ্রাম তিনখানি এবং ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বস্থ ও তৎসন্নিহিত অন্যান্য ভূমি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সুবাদারের রাজসভায় ইংরেজপক্ষের প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহার আবেদনে ঈপ্সিত ফললাভ হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। প্রত্যুত গ্যাব্রিয়েল হ্যামিলটন নামক জনৈক স্কটলণ্ডবাসী ডাক্তারের নিকট ইংরেজেরা এ বিষয়ের নিমিত্ত প্রভূতপরিমাণে ঋণী। এই ডাক্তার সাহেবের বিশিষ্টরূপ আনুকূল্যে ইংরাজেরা কেবল যে পূর্বোক্ত গ্রামত্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এমন নহে, প্রত্যুত তাঁহারই সহায়তায় ভাগীরথীর উভয়-পার্শ্বস্থ আরও ৩৭।৩৮ খানি গ্রাম ইংরেজরা লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহা বড়ই আনন্দের বিষয় যে, চিকিৎসকদিগের চিকিৎসা-নৈপুণ্যের গুণেই ইংরেজরা প্রকৃতপক্ষে ভারতে দাঁড়াইবার স্থান লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ডাক্তার বাউটন * কর্তৃক সম্রাট শাহজাহাঁর কন্যার চিকিৎসা সফলতা ও হ্যামিল্টন কর্তৃক সম্রাট ফররুকসিয়ারের অস্ত্রচিকিৎসা যে নীতি শিক্ষা দিতেছে, তাহা উপেক্ষা করিবার নহে।

বাঙ্গলার শাসনকর্তা নবাব জাফর খাঁ ইংরেজদিগের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ এবং তাঁহাদের স্বার্থসাধনের নিতান্ত প্রতিকূল ছিলেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব ইংরেজদিগকে যে সকল অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, জাফর খাঁ প্রকাশ্যে তাহার কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া তাঁহাদিগকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার কূট কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। কোম্পানি শীঘ্রই দেখিলেন যে, এতদ্দেশে তাঁহাদের অবস্থা বড় সুবিধাজনক নহে। অবশেষে ১৭১৩ অব্দে তাঁহারা দিল্লীতে মোগল রাজসভায় আবেদন সহ দূত প্রেরণ করাই পরামর্শসিদ্ধ বলিয়া স্থির করিলেন। তৎকালে হজেস সাহেব কলিকাতার গভর্ণর ছিলেন। দিল্লীতে ইংরেজপক্ষের দুঃখ-দুর্দশার কথা নিবেদন করিবার নিমিত্ত জে. সরম্যান, ইষ্টিফেন্সন নামক দুইজন সাহেব এবং আর্মানী খোজা

---

* ১৬৪৫ অব্দে সম্রাট শাহজাহাঁ তাঁহার প্রিয়তমা তনয়ার চিকিৎসার নিমিত্ত হোপ হল নামক জাহাজের ডাক্তার গ্যাব্রিয়েল বাউটনকে লইয়া যান এবং তাঁহার চিকিৎসায় রাজকুমারী আরোগ্য লাভ করিলে, সম্রাট কোম্পানিকে বহু সুবিধাজনক অধিকার প্রদান করেন। আবার ১৬৪৬ সালে বাঙ্গালার সুবাদারও বাউটন সাহেবের দ্বারা চিকিৎসিত হন। এই সকল মহোপকার সাধনের ফলে ইংরেজদিগের বালেশ্বর ও হুগলীর কুঠিগুলি অনেকটা বিঘ্নশূন্য হইয়া উঠে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, হুগলীর কুঠি ১৬৪০ অব্দে এবং বালেশ্বরের কুঠি ১৬৪২ অব্দে নির্মিত হইয়াছিল।

সহেঁড দূতরূপে নির্বাচিত হইলেন। তাঁহারা উপঢৌকনস্বরূপ নানাপ্রকার অতি সুদৃশ্য ও মনোহর কাচের জিনিস, ঘড়ি, খেলনা, কিংখাপ, এবং সর্বোৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম পশমী ও রেশমী কাপড় সঙ্গে লইলেন। এই দূতদল দিল্লীর উদ্দেশে যাত্রা করিয়া পথে থাকিতে থাকিতে সম্রাট্ ফরুকশিয়ার এরূপ একটি উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলেন যে, তাহাতে অস্ত্র-চিকিৎসকের সহায়তা আবশ্যক হইয়া উঠিল। খাঁ দুরন নামক সম্রাটের এক বিশ্বস্ত অমাত্য ইংরেজদিগের প্রতি অনুকূল ছিলেন। তাঁহারই অনুগ্রহে ও যত্নে ডাক্তার হ্যামিল্টনকে সম্রাটের চিকিৎসার্থে আহ্বান করা হইল। ডাক্তার সাহেবের অস্ত্রচিকিৎসার গুণে সম্রাট অচিরে আরোগ্যলাভ করিলেন। ইহাতে তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ইংরেজ ডাক্তারকে যথোচিত পারিতোষিক প্রদান করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। ডাক্তার হ্যামিল্টন সেই সময়ে প্রার্থনা করিলেন যে, সম্রাট্ যেন অনুগ্রহ করিয়া ইংরেজ দূতদলের আবেদন পূর্ণ করেন। অতঃপর দূতগণ ১৭১৫ অব্দে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। সম্রাট্ হ্যামিল্টন সাহেবের এইরূপ নিঃস্বার্থ-পরতায় বিমুগ্ধ হইয়া দূতদলের আবেদন বিশেষরূপ অনুকূলভাবে বিবেচনা করিবেন, এ-কথা তৎক্ষণাৎ সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করিলেন। এই সময় মারওয়ার-অধিপতি অজিতসিংহের কন্যা ইন্দ্রকুমারীর সহিত সম্রাটের বিবাহ ব্যাপার উপস্থিত হইল। সুতরাং সম্রাটের দূতদলের আবেদন শ্রবণে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিয়া গেল। অবশেষে ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের নিকট আবেদন পেশ করা হইল। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ ইংরাজগণকে ৩৭ বা ৩৮ খানি গ্রাম ক্রয় করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। এই সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজগণকে অন্যান্য নানাপ্রকার ব্যবসায়সম্বন্ধীয় সুযোগসুবিধাও প্রদত্ত হইল।

উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতে হইতে কলিকাতাকে নানাপ্রকার ভাগ্য-বিপর্যয়ের অধীন হইতে হইয়াছে। ইংরেজ বণিক্‌গণ কিরূপ ক্লেশসাধ্য আয়াস-পরম্পরা স্বীকার করিয়া এবং কিরূপ দুরতিক্রম্য বাধাবিঘ্নসমূহ অতিক্রম করিয়া এদেশে কুঠি নির্মাণ করিতে ও বাণিজ্যব্যবসায় চালাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। বস্তুতঃ ইংরেজ উপনিবেশের উপচীয়মান সৌভাগ্যদর্শনে ঈর্ষাকলুষিত হৃদয়ে মোগলকর্তৃপক্ষীয়েরা ইংরেজদিগের উন্নতিপথে যে সকল বিষম অন্তরায় সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস পাঠকমাত্রেই বিদিত আছেন। কলিকাতাকে যে সকল উৎকট উৎপাত সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ১৭৩৭ সালের ঝড় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহার সহিত আবার ভূমিকম্পও ছিল। এই দুর্ঘটনায় নদীতীরস্থ বহু গৃহ (অনেকে বলেন, প্রায় দুইশত) ভূমিসাৎ হইয়াছিল, এবং ইংলিশ চর্চ নামক গির্জার সমুচ্চয় সুন্দর চূড়াটি বিচ্যুত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, তদ্ভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন জাতির দুই সহস্র জাহাজ, বোট, বজরা, ডিঙ্গি প্রভৃতি তাহাদের নোঙ্গর ও কাছি হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাহাদের কতকগুলি জলমগ্ন হইয়াছিল এবং অবশিষ্টগুলি

ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছিল। গঙ্গার জল সাধারণতঃ যেরূপ উচ্চ হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা ৪০ ফুট অধিক উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল! কথিত আছে যে, এই নিদারুণ জনর্থপাতে তিন লক্ষ মনুষ্য প্রাণ হারাইয়াছিল। পরন্তু দুর্বোধ্য অদৃষ্টচক্রের পরিবর্তনে এই দারুণ দুর্বৎসরই আবার সাতিশয় সৌভাগ্য-সূচক হইয়াছিল। জনৈক প্রাচীন ঐতিহাসিক এই বৎসরের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ;—'এই সময়ে আমাদের বণিকগণ সাতিশয় ধনাঢ্য হইয়াছিলেন— এই সময়ে স্বর্ণ অপর্যাপ্ত ছিল. সামান্য পারিশ্রমিক প্রদানে শ্রমজীবী পাওয়া যাইত, এবং সমস্ত কলিকাতায় একজনও নিঃস্ব ইউরোপীয় ছিল না।'

১৭৪২ অব্দে বা তৎসমকালে একটা জনরব প্রচার হইয়া পড়িল যে, মারহাট্ট দস্যুরা শীঘ্রই কলিকাতা লুণ্ঠন করিতে আসিবে। এই জনরবে কলিকাতার সর্বশ্রেণীর লোকেই দারুণ ভয়ে ও আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া পড়িল। এই সময়ে স্থির হইল যে, ইংরেজ উপনিবেশটিকে রক্ষা করিবার জন্য উহার চতুর্দিকে একটি পরিখা খনন করা হইবে। ইহাও স্থির হইল যে, ঐ পরিখা সূতানুটির উত্তরাংশ হইতে গোবিন্দপুরের দক্ষিণভাগ পর্যন্ত খনন করা হইবে। যে স্থান দিয়া এক্ষণে সার্কুলার রোড বিস্তৃত, ঠিক সেই স্থান দিয়া ঐ পরিখাটি বিস্তৃত ছিল মারহাট্টাদিগের উৎপাত নিবারণোদ্দেশ্যে উহা খাত হইয়াছিল বলিয়া লোকে উহাকে মারহাট্টা-খাত বলে। ছয় মাসে দৈর্ঘ্যে তিন মাইল মাত্র খাত হইলে ঐ কার্য পরিত্যাগ করা হইল। উহার খননকার্য সমাপ্ত হইলে উহা অর্ধবৃত্তাকারে সাত মাইল বিস্তৃত হইল। কথিত আছে যে, এই কার্যে ৬০০ পেয়াদা ও ৩০০ ইউরোপীয় নিযুক্ত হইয়াছিল। খাত হইতে যে মৃত্তিকা উত্তোলিত হইল, তদ্দ্বারা নগরের দিকে একটি রাস্তা নির্মিত হইল। অতঃপর কলিকাতার ইতিহাস সম্পর্কে যে সকল ঘটনা ঘটে, তন্মধ্যে দুশ্চরিত্র নবাব সিরাজুদ্দৌলা কর্তৃক ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নগরলুণ্ঠনই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে যে একটি অতি বিষম লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হইল, তাহারই ফলে কিছুকাল পরে দেশের শাসনভার মোগলদিগের হস্তচ্যুত হইয়া ইংরেজদিগের করতলগত হইল।

যৌবনের উন্মেষ হইতে না হইতেই নবাব সিরাজুদ্দৌলা অত্যন্ত অসচ্চরিত্র ও লম্পটস্বভাব হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ঔদ্ধত্য ও দুশ্চরিত্রতায় বঙ্গদেশের ধনাঢ্য লোকেরা সর্বদা সশঙ্ক অবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। কখন কাহার কি বিপদ্ ঘটে, কখন কাহার ধন, মান বা প্রাণ যায়, এই দুর্ভাবনায় সকলকে সতত উদ্বিগ্ন থাকিতে হইত। এই সময়ে ঢাকার শাসনকর্তা রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস নবাবের ভয়ে উড়িষ্যায় জগন্নাথ দেবের দর্শনোদ্দেশে তীর্থভ্রমণের উদ্দেশে সমস্ত ধনসম্পত্তি সহিত কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন। তৎপূর্বেই ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, যদি তিনি কলিকাতায় আসেন, তাহা হইলে ইংরেজরা সাহায্য করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। সিরাজুদ্দৌলা যখন শুনিলেন যে, কৃষ্ণদাস ঢাকা হইতে পলায়ন

করায় তাঁহাকে 'জবাই' করিতে পারা যায় নাই। তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া ইংরেজদিগের প্রতি আদেশ করিলেন যে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে কৃষ্ণদাসকে তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তির সহিত নবাবের লোকের হস্তে অর্পণ করেন। ইংরেজরা অবশ্য এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না। সিরাজ বাল্যকাল হইতেই ইংরেজদিগের বিষম বিদ্বেষ্টা ছিলেন। কৃষ্ণদাস সম্পর্কীয় এই ঘটনায় তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং স্থির করিলেন যে, তিনি ইংরেজদিগকে কেবল কঠোর শাস্তি প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না, পরন্তু তাহাদিগকে একেবারে বাঙ্গলা হইতে দূরীভূত করিয়া দিবেন। নবাবের এইরূপ ভাব দেখিয়া ইংরেজরা অত্যন্ত ভয়াভিভূত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু ঢাকার শাসনকর্তা রাজা রাজবল্লভ তাঁহাদিগকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন যে, নবাবের যাবতীয় সর্দার ও অমাত্যবর্গ নবাবের প্রতিকূলে ইংরেজদিগকে সাহায্য করিবেন। ইতোমধ্যে নবাবের অমাত্য ও সর্দারদিগের সহিত অতি গোপনে পত্র লেখালেখি ও কথাবার্তা চলিতে আরম্ভ হইল, আর এই দুষ্কর কার্য সংসাধনের জন্য নবকৃষ্ণ দেবকে নিযুক্ত করা হইল।

সিরাজুদ্দৌলা বিপুল সেনাবল-সমভিব্যাহারে কলিকাতা আক্রমণ করিলেন। গভর্ণর ড্রেক সাহেব ও অপরাপর বহু ইংরেজ একখানি জাহাজে আরোহণ করিয়া ফলতায় পলায়ন করিলেন। এই দুর্দশার সময়ে নবাবের নিষেধ সত্ত্বেও, নবকৃষ্ণ ফলতায় ইংরেজ-পলাতকদিগকে গোপনে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করিতে লাগিলেন এবং নবাবের গতিবিধি-সংক্রান্ত অতি প্রয়োজনীয় সংবাদসমূহ তাঁহাদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট ইংরেজেরা নবাবের আক্রমণে বাধা দিতে লাগিলেন; কিন্তু পরিশেষে পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। বন্দিগণ একটি ক্ষুদ্র কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হইলেন; উহা এক্ষণে "অন্ধকূপ" নামে খ্যাত। সেই সঙ্গে নবাব 'কলিকাতা' এই নাম পরিবর্তিত করিয়া 'আলিনগর' নাম রাখিলেন এবং রাজা মাণিকচন্দ্রকে ঐ স্থানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ১৭৫৮ অব্দের জানুয়ারী মাসে মিরজাফরের সনন্দ অনুসারে আলিনগরের পরিবর্তে নগরের নাম আবার 'কলিকাতা' রাখা হইল।

এস্থলে অন্ধকূপের ভীষণ যন্ত্রণার বর্ণনা করা আবশ্যক। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও লেখক মেকলে সাহেব "লর্ড ক্লাইভ" প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে। তিনি লিখিয়াছেন: 'অতঃপর সেই ভয়ংকর অপরাধ অনুষ্ঠিত হইল—যাহা অসামান্য লোমহর্ষণ নিষ্ঠুরতার জন্য, তাহার যথোপযুক্ত ভীষণ প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ইংরেজ বন্দিগণ প্রহরীদিগের কৃপার হস্তে পরিত্যক্ত হইল, আর প্রহরীরা স্থির করিল যে, তাহারা বন্দীদিগকে সে রাত্রির মত দুর্গের কারাকক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে—সেই কক্ষটি ভীষণ অন্ধকূপ রূপে নামে পরিচিত। সেই কারাকক্ষটি এরূপ সংকীর্ণ ও বায়ুসমাগমশূন্য ছিল যে, এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কেবলমাত্র একজন ইউরোপীয়ের পক্ষেও উহা অসহ্য হইত। উহার আয়তন

দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে ২০ ফুট মাত্র। বায়ুপ্রবেশের নিমিত্ত যে কয়েকটি গবাক্ষ-ছিদ্র ছিল, সেগুলি অতি ক্ষুদ্র ও ব্যাহত। তখন অত্যন্ত গ্রীষ্ম,—ওরূপ সময়ে সমুচ্চ গবাক্ষ ছিদ্র ও তালবৃন্তের অনুক্ষণ বায়ুসঞ্চালন সত্ত্বেও বাঙ্গালার প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ইংল্যাণ্ডবাসীদিগের পক্ষে এক প্রকার অসহ্যই বলিতে হইবে। বন্দীরা সংখ্যায় ১৪৬ জন ছিল। যখন তাহাদিগকে ঐ কারাকক্ষে প্রবেশ করিতে হয়, তখন তাহারা প্রথমে মনে করিয়াছিল যে, নবাবের সৈন্যরা তামাসা করিতেছে; আর ইতঃপূর্বে নবাব তাহাদের জীবনে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করায় তাহারা সাতিশয় প্রফুল্লচিত্ত ছিল, এজন্য তাহারা এরূপ অসঙ্গত প্রস্তাবে হাস্য ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কিন্তু অচিরেই তাহারা আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিল। তাহারা প্রতিবাদ করিল—তাহারা অনুনয় বিনয় করিল—কিন্তু সমস্তই বিফল হইল। প্রহরীরা এই বলিয়া ভয় দেখাইল যে, যে কেহ ইতস্ততঃ করিবে, তাহাকেই কাটিয়া ফেলা হইবে। বন্দিগণ তরবারির মুখে সেই কারাকক্ষ মধ্যে তাড়িত হইল এবং অবিলম্বে তাহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া তালা-চাবি দিয়া বন্ধ করা হইল।

অনন্তর ১৭৫৭ অব্দে নবাব সিরাজুদ্দৌলা পুনবার কলিকাতা আক্রমণ করিলেন এবং আমির চাঁদের (উমিচাঁদের) উদ্যানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। ঐস্থান এক্ষণে হালসি বাগান নামে খ্যাত। এই সময়ে কর্ণেল ক্লাইভ নবাব ও তদীয় অনুচরবর্গের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিবার ও উপঢৌকন প্রেরণ করিবার জন্য জনৈক ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার (সম্ভবতঃ মিস্টার আমিয়াথ) সমভিব্যাহারে মুন্সি নবকৃষ্ণকে প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। ইংরেজ পক্ষের এই দুইজন কর্মচারী নবাবের শিবির ব্যবস্থার সবিশেষ সূক্ষ্ম বিবরণ লিখিয়া লইয়া আসিলেন। অনন্তর ক্লাইভ আপনার সেনাদল লইয়া রজনীর শেষভাগে নবাবের শিবিরে উপস্থিত হইলেন এবং কামানের প্রথম আওয়াজেই নবাবের ও তাঁহার সর্দারগণের পট্টাবাস উড়াইয়া দিলেন। পরন্তু নবাব দূরদর্শিতা প্রদর্শন পূর্বক রাত্রিকালে তাঁহার নিজ পট্টাবাস পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক তাম্বুতে আশ্রয় লইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রাণহানি হইল না,—তিনি পলায়ন করিলেন; কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য বিনষ্ট হইল। ক্লাইভ তাঁহার অনুসরণ করিয়া পলাশীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তথায় নবাবের প্রধান সেনাপতির সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে নবাবের সেনাপতি হত হইলেন এবং তাঁহার সৈন্যগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

এ সম্বন্ধে আর এক প্রকার বিবরণ দৃষ্ট হয়। তাহাতে দেখা যায় যে, ইংরেজেরা পূর্বোক্ত প্রকারে নবাব সিরাজুদ্দৌলার শিবির আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিলে, নবাব ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংরেজদিগের সাতিশয় সুবিধা-জনক শর্তে তাঁহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হন। পরন্তু এই বিবাদের পরিসমাপ্তি হইতে-না-হইতে সংবাদ আসিল যে, ইউরোপে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের

মধ্যে সময় ঘোষিত হইয়াছে, সুতরাং এদেশে ফরাসীদিগের শক্তির ক্ষয়সাধন করা ইংরেজদিগের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া পড়িল। সিরাজুদ্দৌলা কলিকাতার কাউন্সিলে বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি ইংরেজরা তাঁহার রাজ্যে যুদ্ধ পরিচালনা করেন, তাহা হইলে তিনি যথাসাধ্য ফরাসীদিগের সহায়তা করিবেন। সে যাহা হউক, ইংরেজরা প্রবল আক্রমণের পর চন্দননগর অধিকার করিলেন। এই ব্যাপারে নবাব অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করায় স্থির হইল যে, সিরাজুদ্দৌলার পূর্বাধিকারী (মাতামহ) আলিবর্দ্দি খাঁর ভগিনীপতি মিরজাফর আলি খাঁর পক্ষসমর্থন করিয়া সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করা হইবে। অতঃপর পলাশীক্ষেত্রে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে নবাবের সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া চতুর্দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং নবাব নিজে ফকিরের বেশে রাজধানী হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তিনি অচিরে ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত হইলেন। মিরজাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবাব সিরাজুদ্দৌলার মস্তক ছেদন করিলেন। ইতঃপূর্বে জাফর আলি খাঁর সহিত মুন্সি নবকৃষ্ণের পত্র লেখালেখি হওয়ায় জাফর আলি এই যুদ্ধে যোগদান করেন নাই। তিনি এক্ষণে কর্ণেল ক্লাইভের সহিত মিলিত হইলে, ক্লাইভ মুর্শিদাবাদ অধিকার করিয়া জাফর আলি খাঁকে বাঙ্গালার প্রকৃত নবাব বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কর্ণেল ক্লাইভের অনুমোদন ক্রমে মুন্সি নবকৃষ্ণ * নবাব জাফর আলি খাঁর সহিত সুবাদারী সন্ধির যাবতীয় নিয়মাদি স্থির করিলেন।

বড়ই কৌতুকের বিষয় এই যে, আজকাল এমন এক শ্রেণীর কতকগুলি লেখক অভ্যুদিত হইয়াছেন যে, তাঁহারা অন্ধকূপহত্যার ব্যাপারটা একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহেন। তাঁহারা প্রকারান্তরে এরূপ কথা বলিতেও কুণ্ঠিত নহেন যে, হলওয়েল সাহেব আপনাকে অন্ধকূপহত্যা ব্যাপারের একজন উত্তরজীবী বলিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়াছিল, এই ঘটনার কথাটা সেই

---

* সরকারি কাগজপত্রে দেখা যায় যে, মিরজাফর জগৎশেঠকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু নবকৃষ্ণ ১৭৭৭ সালের ১৪ই নভেম্বর তারিখে বাঙ্গালার রেভিনিউ কাউন্সিলে যে দরখাস্ত করেন, তাহাতে এইরূপ বলিয়াছিলেন :

কলিকাতার অধিকার ও তৎপরে সিরাজুদ্দৌলার যে পরাজয় ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহাতে এ অধীন মাননীয় লর্ড ক্লাইভ (তৎকালে কর্ণেল ক্লাইভ) সাহেবের অধীনে অনেক কাজ করিয়াছিল; সে সময়ে আবেদনকারী (অর্থাৎ নবকৃষ্ণ) খাস মুন্সি ও অনুবাদকরূপে কার্য করিয়াছিল এবং যাবতীয় অতি গোপনীয় কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিল।

নবকৃষ্ণ ১৭৬৭ সালের ১৬ই মার্চ তারিখে মাননীয় হ্যারি ভেরেলেস্টের নিকট যে আবেদন করেন, তাহাতেও তিনি এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন।

হলওয়েলের কপোল-কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সকল লেখক তাঁহাদের উক্তির সমর্থনার্থ যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাঁহারা বলেন যে, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ২০ ফুট একটা ঘরে ১৪৬ জন লোক কখনও ধরিতে পারে না, সুতরাং এই ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য নহে। যে গল্প শ্রবণমাত্র সহজেই অতীব লোমহর্ষণ ও বীভৎস বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেরূপ একটা মিথ্যা গল্প হলওয়েল সাহেব কি উদ্দেশ্যে রচনা করিলেন, সে বিষয়ের বিচার করিবার কোনরূপ চেষ্টা এই সকল লেখক করেন নাই। তাঁহারা এমন কথাও বলেন যে, নবাব সিরাজুদ্দৌলা একজন সরলবুদ্ধি নিরীহ ও অনভিজ্ঞ যুবক ছিলেন, এবং মোটের উপর বড় অপকৃষ্ট শ্রেণীব শাসনকর্তা ছিলেন না। পরন্তু কোনও ঐতিহাসিক তত্ত্ব কেবল মনোভাব দ্বারা অথবা সম্ভব অসম্ভবের বিচারণা দ্বারা মীমাংসা করা উচিত নয়—স্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শনপূর্বক মীমাংসা করা কর্তব্য। এ বিষয়ে যে কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অন্ধকূপহত্যা ব্যাপার যে যথার্থই ঘটিয়াছিল, এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়।

কলিকাতার ইতিবৃত্তে আর একটি অতি বিষম শোচনীয় দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। সে ঘটনা ১১৭৬ বঙ্গাব্দের ভীষণ মন্বন্তর। ইং ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে যে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ও তদানুষঙ্গিক মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল, তজ্জন্য উক্ত অব্দটি ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে; কারণ তাহাতে কেবল কলিকাতা নহে, সমস্ত বঙ্গদেশই উৎসন্নপ্রায় হইয়া উঠিল। "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" অদ্যাপি প্রবাদবাক্য হইয়া রহিয়াছে,—এখনও লোকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা স্মরণ করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। হিকী সাহেবের মতে, উক্ত অব্দের ১৫ই জুলাই হইতে ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৭৬ হাজার লোক কলিকাতার রাস্তাতেই মরিয়া পড়িয়া ছিল। * নগরের ভিতর এমন একটা কোণ ছিল না, বা কলিকাতার নিকটে এমন কোনও গুপ্তস্থান ছিল না যেখানে জীবিত মুমূর্ষু ও মৃত মানবগণ বিশৃঙ্খলভাবে একত্র মিশ্রিত বা পুঞ্জীভূত হইয়া অতি বীভৎস ও শোচনীয় দৃশ্য প্রদর্শন না করিয়াছিল। কার্যোপলক্ষেই হউক বা বায়ুসেবনার্থই হউক, যে কোন পথে বহির্গত হইয়া দেখিলেই অপ্রীতিকর ও হৃদয়বিদারক দৃশ্যসকল দৃষ্ট হইবে। মৃতদেহসমূহ যতই জীবিতদিগের ন্যক্কারজনক ও অনিষ্টকর হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই সেই সকল শবদেহ দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত প্রত্যহ শত শত লোকে ঐ

* সে আজ ১৩৫ বৎসর পূর্বেকার কথা। সে সময়ে কলিকাতার আয়তন ও লোকসংখ্যা যে বর্তমান সময়াপেক্ষা বহুপরিমাণে অল্প ছিল, একথা বলা বাহুল্য। সেই এক কলিকাতাতেই ৪৭।৪৮ দিনের মধ্যে ৭৬ হাজার মানুষ আহারাভাবে কালকবলিত হইয়া রাজপথে পতিত। তদ্ভিন্ন আরও কত লোক অনশনে গৃহে মরিয়া পড়িয়া ছিল। তাহাদের সংখ্যা অবশ্য এ হিসাবে নাই। একবার ভাবিয়া দেখুন, কি শোচনীয় ব্যাপার !!

কার্যে নিয়োজিত হইতে লাগিল। ঐ সমস্ত শবদেহের কোনরূপ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা ধর্মানুষ্ঠান হইল না, কেবল গাড়ী গাড়ী বোঝাই দিয়া নদীতে ঝুপঝাপ ফেলিয়া দেওয়া হইতে লাগিল। এইরূপ ক্রমবর্ধমান অশ্রুতপূর্ব মড়কে, নগর ও নগরোপকণ্ঠ এরূপ কলুষিত হইয়া পড়িল যে, সর্বসাধারণের মন এমন একটা গুরুতর আতঙ্কে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল যে, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ, অপ্রোথিত শবদেহসমূহ হইতে অনুক্ষণ উত্থিত দূষিত বাষ্পরাশি, এবং বায়ুর প্রখর উত্তপ্ত অবস্থার জন্য শীঘ্রই এক প্রকার ইনফ্লুয়েঞ্জা উদ্ভূত হইয়া দেশব্যাপী মড়ক আনয়ন করিবে। স্বর্গীয় স্যার উইলিয়ম হাণ্টার লিখিয়াছেন: "এই দুর্ভিক্ষের দুই বৎসর পরে ওয়ারেন্ হেস্টিংস বঙ্গদেশের অবস্থা সম্বন্ধে একটি সুবিস্তৃত রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেন। তিনি দেশের অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং পথে পথে এ বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি বহু বিচার-বিতর্কের পর লিখিয়াছেন যে, এই দুর্ঘটনায় অন্ততঃ অধিবাসিবর্গের এক-তৃতীয়াংশ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।"

তৃতীয় অধ্যায়

রাজধানী

"কলিকাতা" নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত। এই নামে উৎপত্তিবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে "কালী কোটা" * হইতে এই নামটি উৎপন্ন। "কালী কোটা" কথার অর্থ কালীদেবীর মন্দির। গঙ্গার আদি প্রবাহ অর্থাৎ আদি গঙ্গা (বা টলির নালা) নামক নদীর তীরে কালীঘাটে কালীদেবীর একটি বিখ্যাত মন্দির আছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই স্থানটি ভারতবর্ষের মধ্যে একটি প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। এই সমস্ত কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই মতটিই সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য বলিয়া বোধহয়। জনৈক ওলন্দাজ পর্যটক বলেন, কলিকাতা নামটি "গোলগথা" শব্দ হইতে উৎপন্ন। বহুকাল হইতে একটা গল্প প্রচলিত আছে যে, এক সময়ে বর্ষাকালে এক প্রকার রোগ উৎপন্ন হইয়া

---

* কলিকাতা নামটি অতি প্রাচীনকাল হইতে সুপরিচিত। প্রাচীন হিন্দুরা ইহাকে "কালীক্ষেত্র" বলিতেন। পুরাণে উক্ত আছে, সতীর (অর্থাৎ কালীর) ছিন্ন অঙ্গের এক অংশ উহারই চতুঃসীমার মধ্যে কোনও স্থানে পতিত হইয়াছিল; সেইজন্যই এই স্থানের নাম "কালীক্ষেত্র" হয়। কলিকাতা "কালীক্ষেত্র" শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।—ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার, নভেম্বর, ১৮৮৯।

ইউরোপীয় অধিবাসীদিগের এক-চতুর্থাংশ বিনষ্ট করে। সেই সময়ে নাবিকগণ কুসংস্কারবশতঃ কলিকাতাকে "গোলগথা" অর্থাৎ খর্পর ভূমি বলিয়া জ্ঞান করিত। স্বর্গীয় রাজা স্যার রাধাকান্তদেব বাহাদুর কে. সি. এস. আই. মহোদয়ের মতে কলিকাতার আদি নাম "কিলকিলা" ছিল। গ্রোস সাহেব বলেন, "ভাগীরথী নদীর উপরিস্থ প্রথম নগর কলিকাতা। কলিকাতা মোটা কাপড়, শস্য, তৈল এবং দেশের অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের উত্তম বাজার।" মিস্টার এ. কে. রায় তাঁহার "কলিকাতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ "বর্ণিত আছে যে, কিলকিলা প্রদেশ আয়তনে ২১ যোজন (অর্থাৎ ১৬০ বর্গমাইল); উহার পশ্চিমে সরস্বতী, পূর্বে যমুনা; পশ্চাল্লিখিত গ্রাম ও নগরগুলি উহার অন্তর্ভুক্ত, যথা—হুগলী, বাঁশবেড়িয়া, খড়দহ, শিয়ালদহ ইত্যাদি ইত্যাদি।" আকবরের রাজত্বকালে আবুল ফজল কৃত "আইন-ই-আকবরি" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত রাজা তোডরমল্লের জমা-বন্দি কাগজে মহাল কলিকাতার নাম দৃষ্ট হয়। নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটি গল্প এইরূপঃ জনৈক ইংরেজ এই স্থানে জাহাজ হইতে প্রথমে অবতীর্ণ হইয়াই দেখিতে পান যে, একজন ঘেসেড়া ঘাসের বোঝা মাথায় লইয়া যাইতেছে। ইংরেজ তাহাকে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন—" "What place is this?" অর্থাৎ এস্থানের নাম কি? ঘেসেড়া মনে করিল সাহেব বুঝি তাহার মস্তকস্থিত ঘাসের কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই ভাবিয়া সে হিন্দিতে উত্তর করিল—"কলিকাটা" অর্থাৎ এ ঘাস আমি গতকল্য কাটিয়াছি। সাহেব এদেশে সবেমাত্র পদার্পণ করিয়াছেন, কাজেই তখন তিনি ঘেসেড়ার হিন্দি কথার মর্ম বুঝিতে না পারিয়া মনে করিলেন, উহাই বুঝি তবে স্থানের নাম হইবে। এই ভাবিয়া তিনি লিখিয়া লইলেন—"Calcutta এবং তদবধি ইহা ঐ নামেই পরিচিত হইল। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন, কলিকাতা নামটি "খাল-কাটা" (অর্থাৎ মারহাট্টা-খাত) হইতে উৎপন্ন, কারণ তৎকালে উহাই এই স্থানের একরূপ সীমা ছিল। ইহাও একান্ত অসম্ভব নয় যে, মারহাট্টা খাতটি খনন করা হইলে পর গোবিন্দপুর, কলিকাতা ও সুতানুটি—এই তিনখানি গ্রাম একমাত্র কলিকাতা নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কলিকাতা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে, সেগুলি আমরা যতদূর অবধারণ করিতে পারিয়াছি, তাহা একে একে এ স্থানে উল্লেখ করিলাম। অনুসন্ধিৎসুগণের নিকট ইহা কৌতুকজনক হইলেও হইতে পারে। পরন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞানলাভের যখন কোনও উপায় নাই, তখন কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয়। কখনও বা আশার সহিত, কখনও বা সভয়ে. এরূপ কথিত হইয়া থাকে যে, কালে কলিকাতা বৃটিশ ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী থাকিবে না। গঙ্গাপ্রবাহের গতিপরিবর্তনে এবং ঐ নদীতে ক্রমাগত চড়া পড়িতে থাকায় কলিকাতায় অনেক গৌরব ও প্রয়োজনীয়তা কমিয়া যাইবে। মহামারী ও সংক্রামক ব্যাধিতে গৌড়ের ন্যায় ইহারও

অধিবাসিবর্গের দশমাংশের বিনাশ সাধন করিবে। পরন্তু সার্ধ এক শতাব্দীর ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা এক প্রকার অসম্ভব। দীর্ঘকালগত নানাপ্রকার জনপ্রবাদ ও ভাব সংযোগের কথা ছাড়িয়া দিলেও নগরের যে সকল আভ্যন্তরিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহাই অতীতের সহিত বিচ্ছেদ সাধনের পক্ষে প্রায় অনুল্লঙ্ঘনীয় অন্তরায়রূপে দণ্ডায়মান হইবে। এই নগরে বণিকদিগের বিনিয়োজিত মূলধন, বহুদিনের ড্রাগ ডক (জাহাজ মেরামতের স্থান) ও জেটি (জাহাজঘাটা) গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্মিত নানাপ্রকার আপিস ও সরকারী অট্টালিকা, রাজসংস্রবশূন্য সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিবর্গের বা কোম্পানিসমূহের দ্বারা নির্মিত বহুমূল্য আবাসবাটি ও কার্যালয়সকল, মিউনিসিপাল-সমাজ কর্তৃক সংশোধিত অট্টালিকাদির পরিবর্তন, সেনেট গৃহ সহিত বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংসৃষ্ট বহুসংখ্যক উচ্চশ্রেণীর বিদ্যামন্দির, রেলওয়ে কোম্পানিসমূহ ও তাহাদের সুবিস্তৃত সুদর্শন অন্তিম স্টেশন ও প্রধান কার্যালয় সকল এবং মফঃস্বল-ভ্রমণ, কার্যবণ্টন ও তদাকার অন্যান্য বিষয়ের সরকারী ব্যবস্থার প্রণালী এই সমস্ত বস্তু মহাপ্রলয় ব্যতিরেকে বিলুপ্ত হইবার নহে, অথবা কোনও খামখেয়ালী শাসনকর্তার খেয়াল-মাত্রে অন্য ভূমিতে স্থানান্তরিত হইবার নহে। কলিকাতা বহুদিন হইতে এতদ্দেশে ইংরেজদিগের রাজধানী হইয়াছে, অন্য কারণ না থাকিলেও কেবল এই একমাত্র কারণে কলিকাতা বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী থাকিবে।

কলিকাতা বাঙ্গালার ষষ্ঠ রাজধানী কথিত হইয়াছে। গৌড় নগর সর্বপ্রথম ও অতি প্রাচীন রাজধানী বলিয়া উল্লিখিত। উহা মালদহ জেলায় গঙ্গার তীরেই অবস্থিত ছিল, কিন্তু গঙ্গায় সে প্রবাহ এক্ষণে গৌড় পরিত্যাগ করিয়া তাহা হইতে বহুদূর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। উহার অক্ষান্তর ২৪০৫২০ উত্তর এবং দ্রাঘিমান্তর ৮৮০১০' পূর্ব। নগর ও তাহার উপনগরের আয়তন ২০ হইতে ৩০ বর্গমাইল অনুমিত হইয়া থাকে। এই নগরের উৎপত্তি বিবরণ অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন, এক্ষণে উহার অনুমান করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই; পরন্তু একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, খ্রীষ্টের জন্মের ৭০০ বা ৮০০ বৎসর পূর্বে ইহার অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। পাদরী লঙ সাহেব বলেন যে, এই নগর ২০০০ বৎসর সমৃদ্ধিশালী ছিল। টমাস টুইনিঙ নামক একজন লেখক বলেন: "সমস্ত ভারতবর্ষেই অতি পুরাকালের অকাট্য নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান আছে, কিন্তু গৌড়ের নিদর্শনগুলি যেরূপ জাজ্জ্বল্যমান বোধ হয়, আর কোন স্থানেরই নিদর্শন সেরূপ জাজ্জ্বল্যমান নহে।" এই নগরে দশলক্ষাধিক লোকের বাস ছিল এবং কি আয়তন, কি অট্টালিকা, কি ঐশ্বর্যাড়ম্বর, সকল বিষয়েই ইহা বর্তমান কলিকাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। এই নগর সম্বন্ধে যে সকল অত্যদ্ভুত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে একটির নিদর্শন প্রদর্শনার্থ কথিত হইয়া থাকে যে, "ইহার অধি-বাসীদিগকে পান যোগাইবার নিমিত্ত প্রতিদিন ত্রিশ হাজার পানের দোকান খোলা হইত।" এই নগর লক্ষণাবতী নামেও পরিচিত ছিল। আবুল ফজল

কৃত এই নগরের বর্ণনার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল :

"জেনতাবাদ অতি প্রাচীন নগর। উহা এক সময়ে বঙ্গের রাজধানী ছিল। পূর্বে ইহা লক্ষ্মণাবতী নামে, কখনও বা গৌড় নামে অভিহিত হইত। মৃত সম্রাট হুমায়ুন ইহার বর্তমান নাম জেনতাবাদ প্রদান করেন।...প্রাচীন গৌড়নগর যে সকল প্রদেশের রাজধানী ছিল, সেই সকল প্রদেশে গৌড়ীয় ভাষা কথিত হইত; উহাকে সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষা বলে। কয়েকটি সীমান্ত প্রদেশ ভিন্ন বঙ্গের অন্যান্য সকল প্রদেশেই অদ্যাপি ঐ ভাষা প্রচলিত।...যৎকালে মহম্মদ বখতিয়ার খিলিজি ১২০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা জয় করেন, তৎকালে তিনি সেই প্রাচীন গৌড় নগরকেই আপনার রাজধানী করিয়াছিলেন।...১৫৩৫ অব্দে যৎকালে সম্রাট হুমায়ুন, সের খাঁ (যিনি হুমায়ুনকে পরে হিন্দুস্থান হইতে দূরীভূত করিয়াছিলেন) নামক পাঠানের পশ্চাদনুসরণ করেন, সেই সময়ে তিনি বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী গৌড় অধিকার করেন। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ের নাম ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়।"

এই নগরের অতীত গৌরবের একটা মোটামুটি ধারণা পাঠকদিগের হৃদয়ে জন্মাইয়া দিবার নিমিত্ত জনৈক সেনানায়ক কর্তৃক লিখিত—Sketches of India for fireside Travellers' নামক পুস্তকের একস্থান হইতে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে :

"তুমি গৌড়নগরের ধ্বংসাবশেষের উপর পদার্পণ করিয়া বিচরণ করিতেছ। এই মৃত্তিকা এক্ষণে চূর্ণীভূত অথবা তোমার পদভরে চূর্ণায়মান ইষ্টকসমূহে গঠিত; ঐ সমস্ত ইষ্টক যুগযুগান্তর পূর্বে মানবহস্ত দ্বারাই নির্মিত হইয়াছিল। যে নগরের স্মৃতিচিহ্ন তুমি অন্বেষণ করিতেছ, সেই নগরের দেবমন্দির, প্রাসাদ ও অট্টালিকা-সমূহ এই স্থানে ধূলিসাৎ হইয়া রহিয়াছে। তুমি কি এক্ষণে জেরুজালেম নগরে সলমনের সেই সুবিখ্যাত মন্দিরের একখানিও ইঁট খুঁজিয়া বাহির করিতে পার? জেরুজালেমের যে দ্বিতীয় মন্দির আমার শক্তি ও গৌরবের দিনের ৮০০ বৎসর পরে ভূমিসাৎ হইয়াছে, তাহার একখানি পাথরের উপর আর একখানি পাথর কি এখন আছে? তুমি কি অন্বেষণ করিতেছ? বাবিলন, টায়ার ও সাইডন আমার ভগিনী ছিল। মিসর ও তাহার দেবমূর্তি সকল আমাকে চিনিত; আমার কাল হইতে সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ঘটিয়াছে, কার্থেজ, রোম ও বিজ্যানশিয়ম ভূমিসাৎ হইয়াছে। হেজিকায়ার সময়ে মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বক্তা ইসায়া যেরূপ অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ নগর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী কহিয়াছিলেন, আমার সম্বন্ধে এবং আমার পর আমার বিজেতাদিগের সম্বন্ধেও তদ্রূপ হইয়াছে। আমার পুত্রগণ শৌর্যবীর্যে প্রখ্যাত ছিল, আমার দুর্গসমূহ সমুচ্চ ছিল, আমার প্রাচীরগুলি সুরক্ষিত ছিল, আমার ধনাগার পূর্ণ ছিল, আমার তনয়ারা সুন্দরী ছিল; আমার ভোজোৎসবসমূহে নৃত্যগীতের প্রাচুর্য ছিল; আমি গর্বিত ও উন্নতশীর্ষ ছিলাম, কিন্তু অধুনা ধূলিসাৎ হইয়াছি।"

ডাক্তার বুকানন হামিল্টন বলেন, "সম্রাট শাহজহাঁর অন্যতম পুত্র শাহসুজা ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে গৌড় পরিত্যাগ করিয়া রাজমহল নগর বঙ্গের রাজধানী বলিয়া নির্ধারণ করেন। উক্ত লেখকের মতে তদবধি গৌড়ের ধ্বংসের সূত্রপাত হয়। তাঁহার বিবেচনায় সেই সময়ে নগরটি অবিলম্বে ধ্বংসমুখে পতিত হইল,—কোনও প্রকার বিপুল বা অসামান্য বিপৎপাত জন্য যে সেরূপ হইল তাহা নহে, পরন্তু রাজধানীর স্থানান্তরীকরণই তাহার একমাত্র কারণ।"

রাজমহল আর একটি দৃষ্টান্ত। ট্ইনিঙ্ সাহেব লিখিয়াছেন ঃ "হুগলী ও নবদ্বীপের ন্যায় রাজমহলও ভারতবর্ষের রাজনগরসমূহের অসামান্য অস্থায়িত্বের একটি সমুজ্জ্বল নিদর্শন; অথবা এ কথাও বলা যাইতে পারে যে, এতগুলি নগর বা গ্রামের রাজধানী পদে উন্নতি ও পরে পুনরায় তাহাদের পূর্ব নিকৃষ্ট বা নগণ্য অবস্থায় অবনতি ;—যে অবস্থায় তাহাদের মনোহরপুষ্পোদ্যান ও ফলবৃক্ষ-সমূহ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয় এবং তাহাদের অত্যদ্ভুত ঐশ্বর্যাড়ম্বর কেবল তাহাদের ধ্বংসাবশেষের পরিমাণ দেখিয়াই নির্ণয় করিতে হয়, এতদুভয়ের মধ্যে যে বহুসংখ্যক বৎসর অবশ্যই অতীত হইয়া থাকিবে, রাজমহল তাহারই অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ··।" অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ "রাজমহল যে এক সময়ে একটি বিশাল নগর ছিল, বঙ্গের রাজধানী ছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু কতদিন উহার গৌরব-রবি সমুজ্জ্বল ছিল, তাহা এই সুদূরবর্তী কালরূপ তিমিরে সমাচ্ছন্ন। যে স্থলে কোনও জাতির ইতিহাস বিজেতার তরবারি অনুসরণ করে, অথবা তাহা বশ্যতারূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হস্তদ্বারা লিখিত হয়, সেস্থলে সত্যের আশা করা বিড়ম্বনামাত্র।" উক্ত লেখক আরও বলিয়াছেন ঃ "উহা গঙ্গার পশ্চিম তীরে ২৫°২´২৫´´ উত্তর অক্ষান্তরে এবং ৮৭°৫২´৫১´´ পূর্ব দ্রাঘিমান্তরে অবস্থিত। উহা এক্ষণে কতকগুলি মৃণ্ময় কুটীরের সমষ্টিমাত্র,—তাহারই মধ্যে মধ্যে অত্যল্পসংখ্যক সঙ্গতিপন্ন মুসলমানের কয়েকটি সৌষ্ঠবসম্পন্ন ভদ্রজনোচিত বাটী। প্রাচীন মহম্মদীয় নগরের ধ্বংসাবশেষ অধুনা নিবিড় জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন এবং বর্তমান নগরের পশ্চিমে প্রায় ৪ মাইল বিস্তৃত।" আর এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন ঃ "রাজমহলের অবস্থানের কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহা দুই কারণে রাজধানীরূপে মনোনীত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় ঃ প্রথমতঃ উহা বাঙ্গালা ও বিহারের মধ্যস্থলে, এবং দ্বিতীয়তঃ, ঐ স্থান হইতে গঙ্গানদী ও তেলিয়াগড়ি গিরিসঙ্কট উভয়ের উপরই সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা সম্ভব; ঐ তেলিয়াগড়ি গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া এক্ষণে রেলগাড়ী চলিতেছে। মুসল-মানেরা ঐ স্থানকে আকবর নগরও বলিয়া থাকে। উক্তবিধ নামকরণ সম্বন্ধে এইরূপ একটা গল্প প্রচলিত আছে ঃ সুপ্রসিদ্ধ রাজপুত সেনাপতি উড়িষ্যা বিজয়ের পর প্রত্যাগত হইয়া রাজমহলে নিজের জন্য একটি প্রাসাদ ও তদ্ভিন্ন একটি হিন্দু দেবমন্দির নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। বিহারের শাসনকর্তা ফতেজঙ্গ খাঁ রাজপুতদিগের আগমনের পূর্বে রাজমহলে বাস করিতেন। তিনি

সম্রাটকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, মানসিংহই পুত্তলপূজার নিমিত্ত একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া নগরকে অপবিত্র করিতেছেন। এবং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, তিনি বিদ্রোহী হইবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। মানসিংহ এই পত্রের কথা শুনিয়া নগরের নাম রাজমহলের পরিবর্তে আকবরনগর রাখিলেন এবং দেবমন্দিরটিকে জুম্মা মসজিদে পরিবর্তন করিলেন।

পাদরী লঙ্ সাহেব বলেন,—"শত রাজার নগর" রাজমহল গঙ্গা নদীর 'ব' দ্বীপের অগ্রদেশে অতি সুবিধাজনক ভাগে অবস্থিত...।" ঢাকা নগরেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহার যশঃসৌরভ রোমীয়কাল হইতে দিগদিগন্তে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ওয়াল্টার হ্যামিল্টন সাহেব তাঁহার গেজেটিয়ারে বলিয়াছেন: "১৬০৮ (?) * খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার তদানীন্তন সুবাদার ইসলাম খাঁ রাজধানী রাজমহল হইতে উঠাইয়া ঢাকা নগরে লইয়া যান, এবং তদানীন্তন সম্রাটের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিদর্শনস্বরূপ উহার নাম পরিবর্তিত করিয়া জাহাঙ্গীরনগর রাখেন...। কথিত আছে যে, সুবাদার সায়েস্তা খাঁর দ্বিতীয়বারের শাসনকালে ঢাকায় চাউল এরূপ স্বল্পমূল্য ছিল যে, বাজারে টাকায় ৮ মণ করিয়া চাউল বিক্রীত হইয়াছিল। এই ব্যাপার স্মরণীয় করিবার নিমিত্ত তিনি ১৬৮৯ অব্দে যৎকালে ঢাকা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, সেই সময়ে তাঁহার আদেশক্রমে পশ্চিমদিকের তোরণ নির্মিত হইয়া তাহাতে এইরূপ একটি ক্ষোদিত লিপি সংস্থাপিত হয় যে, উত্তর-কালীয় কোনও শাসনকর্তা যত দিন না তণ্ডুলের মূল্য হ্রাস করিয়া, তাহা এইরূপ স্বল্পমূল্য করিতে পারিবেন, ততদিন তিনি এই তোরণ উন্মুক্ত করিতে পারিবেন না। এই নিষেধাজ্ঞার জন্য উক্ত তোরণ ১৭৩৯ অব্দে সরফরাজ খাঁর শাসনকাল পর্যন্ত বদ্ধ ছিল। বর্তমান সময়ে ঢাকা পূর্ববঙ্গের রাজধানী এবং সমস্ত বাঙ্গালার মধ্যে পঞ্চম বৃহত্তম নগর বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

নদীয়া পাঁচ শতাব্দীকাল "বঙ্গের অক্সফোর্ড" (অর্থাৎ বিদ্যালোচনার প্রধান স্থান ছিল)। টি টুইনিঙ্ সাহেব স্বপ্রণীত ভারত ভ্রমণবিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন: "...সম্রাট আকবর খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন; তাহার ৪,০০০ বৎসর পূর্ব হইতে অতি প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ নগর নদীয়া বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। ...সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ইউরোপীয়েরা অন্যান্য কয়েকটি স্থানের ন্যায় নদীয়াতেও তামাক গাছ প্রথম আমদানি করেন।"

এই স্থানে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক চৈতন্য জন্মগ্রহণ ও ধর্মপ্রচার করেন। বৈষ্ণবদিগের নিকট এই স্থান সাতিশয় পবিত্র।

মুকসদাবাদ বা মুর্শিদাবাদ মুর্শিদকুলিখাঁর বাসস্থান ছিল। তিনি এই স্থানে

---

* টুইনিঙ্ সাহেব বলেন যে ১৬৩৯ অব্দে শাহ সুজা গৌড় হইতে রাজমহল নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

রাজধানী উঠাইয়া আনেন এবং ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজের নামানুসারে নগরের নামকরণ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের অধীনেও ১৭৭২ অব্দ পর্যন্ত ইহা রাজধানী ছিল। উক্ত বৎসর ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস কলিকাতাকেই রাজকার্য পরিচালনের প্রধান স্থান করেন। কলিকাতার অতি সুন্দর মসজিদ, প্রাসাদ ও সরকারী স্মৃতিমন্দিরসমূহের মধ্যে অনেকগুলি গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে উত্তোলিত ইষ্টক ও প্রস্তর দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ পাণ্ডুয়া, রাজমহল ও টাণ্ডার সরকারী অট্টালিকাসমূহের অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত গৌড়নগরের লুণ্ঠিত উপাদানসমূহে বিরচিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে, মুর্শিদাবাদের গোরাবাজারস্থিত প্রধান বণিজাধ্যক্ষের আবাসবাটী গৌড়ের ইষ্টক দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। বর্তমান কলিকাতা ১৭৭২-৭৩ অব্দ হইতে বঙ্গের সর্বপ্রধান নগর এবং বৃটিশ ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

কলিকাতার ভুবৃত্তান্ত ও অধিবাসী

ডাক্তার জেমস্ রানাল্ড মার্টিন লিখিয়াছেন:

"দেখা গিয়াছে যে, যে সকল ইউরোপীয় জাতি বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, তন্মধ্যে ইংরেজরা সর্বত্রই তাহাদের ঔপনিবেশিক নগরসমূহের স্থাননির্বাচনে যারপরনাই অনবধানতা প্রদর্শন করিয়াছেন।" কাপ্তেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন ১৬৮৮ হইতে ১৭২৩ অব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা সম্বন্ধে বলেন,—"সমগ্র নদীতীরে ইহা অপেক্ষা অধিকতর অস্বাস্থ্যকর স্থানের নির্বাচন হইতে পারিত না।" বস্তুতঃ বাণিজ্যের সুবিধা বিষয়ে ডাক্তার মার্টিন স্বীয় মত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: "কিন্তু এস্থলে বাণিজ্যের সুবিধার জন্যই যে এই স্থানটিকে আমাদের রাজধানীরূপে মনোনীত করা হইয়াছে, এ প্রবোধও আমাদের নাই; কারণ আমার বিশ্বাস এই যে, এই স্থান ও সমুদ্রের মধ্যে এমন অনেক স্থান আছে যে, তাহা জাহাজ লাগাইবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী, অথচ এমন একটিও স্থান নাই, যাহা সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহার ন্যায় অনুপযুক্ত বোধ হয়।" পাদরি লঙ্ সাহেব বাণিজ্যের হিসাবে কলিকাতায় অবস্থান যারপরনাই সুবিধাজনক বিবেচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: "এই একটি প্রশ্ন অনেক সময়ে উঠিয়াছে যে, হুগলী নদীর

দক্ষিণপার যখন ফরাসীদিগের, দিনেমারদিগের ও ওলন্দাজদিগের নিকট অধিকতর স্বাস্থ্যকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তখন কলিকাতা সেই পারে স্থাপিত হইল না কেন? আমার মতে ইহার প্রধান কারণ এই, বাম পারের জল দক্ষিণ পার অপেক্ষা অধিকতর গভীর ছিল, যে সকল তন্তুবায় কোম্পানিকে কাপড়-.চাপড় বিক্রয় করিত, তাহাদের অধিকাংশেরই বাস বাম পারে ছিল, হাবড়ার পারের ন্যায় এ পারে মারহাট্টাদিগের উৎপাত তত অধিক ছিল না।" পাদরি লঙ্ সাহেব এ বিষয়টি যেভাবে দেখিয়াছেন, ওয়াল্টার হেমিলন্টনও বহুদিন পূর্বে ১৮১৫ অব্দে উহা ঠিক সেই ভাবেই দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেনঃ "কলিকাতা হইতে দেশের অভ্যন্তরভাগে নানা স্থানে নৌ-চালনের বিলক্ষণ অসুবিধা আছে, বিদেশের আমদানি মাল গঙ্গা ও তাহার তোয়দাসমূহ দিয়া হিন্দুস্থানের উত্তরাংশের নানা স্থানে অনায়াসে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে, এবং মফঃস্বলের মূল্যবান্ উৎপন্ন দ্রব্যসমূহও পরে কলিকাতায় আনান যাইতে পারে।"

কলিকাতা ভাগীরথীর পূর্ব অর্থাৎ বাম তীরে অবস্থিত। ইহার দ্রাঘিমান্তর ৮৮°২৩´ ৫৯´ পূর্ব এবং অক্ষান্তর ২২°৩৪´ ২´ উত্তর। ইহা সমুদ্র হইতে ৮০ মাইল দূরবর্তী। ১৯০১ অব্দে যে লোকসংখ্যা গণনা করা হয়, তাহাতে ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ৫,৪২,৬৮৬ স্থির হইয়াছিল, কিন্তু এই সংখ্যার মধ্যে বন্দরের, কেল্লার এবং পরে যে উপনগরাংশ নব মিউনিসিপাল বিধি অনুসারে ইহার সহিত সংযোজিত হইয়াছে, তাহার লোকসংখ্যা ধরা হয় নাই। এইচ. জে. রেইনি সাহেব কলিকাতার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেনঃ "কলিকাতা নিম্ন, প্রশস্ত, সমতলভূমি, জোয়ারের জল সর্বোচ্চ যে সীমায় উঠে, তাহা অপেক্ষা ঈষৎমাত্র উন্নত, এবং গঙ্গানদীর দ্বীপের নিম্নতর অংশের মধ্যে অবস্থিত ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে ভূতলে ছিদ্র করিয়া অভ্যন্তরভাগের অবস্থা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ১৮৩৫-৪০ অব্দে নিয়োজিত কমিটির সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে এইরূপ লিখিত আছে,—'পার্বত্য স্রোতস্বতীসমূহের গর্ভে যেরূপ সূক্ষ্ম অঙ্গার পাওয়া যায়, ৩৯২ ফুট নিম্নে সেইরূপ কয়েক খণ্ড অঙ্গার ও কয়েক টুকরা গলিত কাষ্ঠ বালুকা হইতে বাছিয়া তোলা হইয়াছিল, এবং ৪০০ ফুট নিম্ন হইতে একখণ্ড চূর্ণ প্রস্তর উত্তোলিত হইয়াছিল। ৪০০ হইতে ৪৮১ ফুটের মধ্যে, সাগরতটে যেরূপ বালুকা পাওয়া যায়, সেইরূপ সূক্ষ্ম বালুকা এবং তাহার সহিত সমধিক পরিমাণে মিশ্রিতভাবে, প্রাথমিক শিলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে গঠিত শিঙ্গল (উপলবিশেষ), শিলা-স্ফটিক, ফেলস্পার (স্ফটিকবৎ খনিজ-বিশেষ), মাইকা (এক প্রকার খনিজ পদার্থ), শ্লেট পাথর ও চূর্ণপ্রস্তর প্রচুর ছিল, আর এই স্তরেই ছিদ্র সমাপ্ত হইয়াছিল।" এই স্থূল পরস্পর প্রোথিত-প্রস্তরখণ্ড রচিত শৈলের গভীরতা নিশ্চিতরূপে অবধারিত হয় নাই, কিন্তু অনেকে অনুমান করেন, ইহা অনধিক ৮০ ফুট বিস্তৃত; তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ইহার সন্নিধানে উচ্চ পর্বত আছে, এবং বোধ হয়, ক্রমে ক্রমে তাহা বসিয়া গিয়াছে। আর

ভূ-পৃষ্ঠের নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন গভীরতার যেসব স্তর দৃষ্ট হয়, তাহাদের প্রকৃতি ও ব্যবস্থার বিষয় পর্যালোচনা করিলে এই অনুমান অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। যথা, ভূপৃষ্ঠ হইতে ৮০ ফুট নিম্নে এক স্তর পীট (গলিত উদ্ভিজ্জবিশেষ) আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এবং দেখা গিয়াছিল যে, সেই পীটের সহিত মাদ্রাজী শসার বীজ, শর্করা-তৃণের পত্র প্রভৃতি ছিল। আর ডাক্তার লুকার বলেন,—এই সকল দ্বারা বুঝা যায় যে, কলিকাতার ভূ-পৃষ্ঠের অবস্থা এক্ষণে যেরূপ দৃষ্ট হয়, ইহার সঞ্চয়কালে তাহা হইতে ভিন্ন অন্য এক প্রকার অবস্থা ছিল, এবং নদীমুখের জলও বর্ত্তমান সময়াপেক্ষা অনেকাংশে বিশুদ্ধতর ছিল। ১৫৯ ফুট নিম্নে পীতবর্ণ শিরা সমন্বিত এক প্রকার অনমনীয় আঠাল কাদা দৃষ্ট হইয়াছিল, এবং ১৯৬ ফুট নিম্নে এক প্রকার লৌহ-মিশ্রিত আঠাল কাদা পাওয়া গিয়াছিল; ৩৪০ ফুট ও পুনরায় ৩৫০ ফুট নিম্নে একখণ্ড প্রস্তরীভূত অস্থি উত্তোলিত হইয়াছিল, সেটা কোনও কুকুরের পায়ের জানুসন্ধির উপরিভাগের অস্থি বলিয়াই অনুমান হইয়াছিল; তদ্ভিন্ন ৩৭২ ফুট নিম্নে অন্যান্য অস্থিও পাওয়া গিয়াছিল।"

"আবার অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে, দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা আমরা এক্ষণে যেরূপ দেখিতেছি, তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার ছিল সন্দেহ নাই। কারণ তৎকালে হুগলী নদীর অস্তিত্ব ছিল না, কয়েক শতাব্দী পূর্বে গঙ্গার প্রবাহ এখনকার ন্যায় পদ্মা দিয়া প্রবাহিত হইত না; নদীয়া (নবদ্বীপ) ত্রিবেণী প্রভৃতির নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইত; যাহাকে এক্ষণে টলির নালা বলে, তাহাকেই এতদ্দেশীয়েরা প্রাচীন গঙ্গার গর্ভ বলিয়া নির্দেশ করে এবং তাহাকে বুড়ী গঙ্গা বা আদি গঙ্গা বলে। গঙ্গার প্রবাহধারার মহাপরিবর্ত্তন ঠিক কোন্ সময়ে ঘটিয়াছিল, তাহা সুনিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না; পরন্তু এ সম্বন্ধে ডাক্তার বুকানান ও হ্যামিল্‌টনের অনুমানই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়, অর্থাৎ গঙ্গার সহিত কুশীনদীর মিলন হইতেই এই ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। গঙ্গার স্বর্গ হইতে অবতরণ সম্বন্ধে রামায়ণে মহর্ষি বাল্মীকি যে আখ্যায়িকার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। গল্পটি এইরূপ: মহারাজ সাগরের ষষ্টি সহস্র পুত্র পিতার নিমিত্ত অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিবার সময়ে কপিল মুনির শাপে ভস্মীভূত হন। অনন্তর সগরের প্রপৌত্র ভগীরথ স্তবে তুষ্ট করিয়া গঙ্গাকে মর্ত্যলোকে আনয়নপূর্বক পূর্বপুরুষগণের উদ্ধার সাধন করেন। সেইজন্যই হিন্দুরা গঙ্গাকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া তাঁহার আরাধনা করেন। এই নদীর নিম্নভাগ ভাগীরথী নামে অভিহিত। এতদ্দেশীয়েরা অদ্যাপি তাহাকে ভাগীরথীই বলে, হুগলী বলে না। এ নামটি সম্পূর্ণ আধুনিক এবং হুগলী নগরের নাম হইতে উৎপন্ন, আর তাহাও অধিক দিনের কথা নহে। প্লিনির সময় হইতে বাঙ্গালার সর্বপ্রধান বাণিজ্য স্থান এবং প্রাচীনদিগের নিকট Gangees Regia আখ্যায় অভিহিত সুপ্রসিদ্ধ সাতগাঁ সপ্তগ্রাম নামক নগরের ধ্বংসের পর হুগলী নগর প্রাধান্য লাভ করিতে আরম্ভ করিলে এই নদীও ঐ নামে অভিহিত হইতে

আরম্ভ করে। পর্তুগীজেরা হুগলীকে Ports piquens নামে অভিহিত করিত। ১৬৩২ অব্দে উহা রাজকীয় বন্দররূপে পরিণত হয়, আর সম্ভবতঃ ঐ সময় হইতে ভাগীরথী নদীও হুগলী নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ করে।

কলিকাতার বায়বীয় আর্দ্রতা সাধারণতঃ অত্যন্ত অধিক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ব্ল্যানফোর্ড সাহেব অবধারণ করিয়াছেন যে, কলিকাতায় সম্বৎসরে এক ইঞ্চির সহস্রতম ভাগের বাষ্প ৭৬২, কিন্তু লণ্ডন নগরে ইহার অর্ধ অপেক্ষাও অল্প, মোটে ৩৭৬ মাত্র; পক্ষান্তরে বায়ুতে আর্দ্রতার অনুপ্রবেশ ১০০ ধরিলে, সংবৎসরের গড় পারম্পরিক আর্দ্রতা ৭৬ মাত্র; কিন্তু লণ্ডনে উহা অপেক্ষা অনেক অধিক, ৮৯। ব্ল্যানফোর্ড সাহেব আরও বলেন যে, 'বায়ুর তাপশৈত্যের ভাবের পর, এই দুই স্থানে যাহা কিছু স্বাস্থ্যের পরিবর্তন সংঘটিত করে, তাহাদের মধ্যে এই বায়বীয় আর্দ্রতার পার্থক্য সবাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব-বিশিষ্ট কারণ বলিয়া বোধ হয়।"

ব্ল্যানফোর্ড সাহেবের সুবিস্তৃত হিসাব ও তালিকা অনুসারে কলিকাতার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় ৬৬·০৪ ইঞ্চি, কিন্তু ইহার ১০০ মাইল অপেক্ষা অল্প নিম্নস্থ সাগরদ্বীপে উহা অপেক্ষা অনেক অধিক অর্থাৎ ৮২·২৯ ইঞ্চি।

বায়ুমান যন্ত্রদ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে যে, কলিকাতার বায়বীয় চাপের গড় সাগরতলের ১৮ ফুট উর্দ্ধে ২৯·৭৯৩ ইঞ্চি। কলিকাতাবাসীরা অনেকবার ভীষণ ঝটিকাবর্তের হস্তে বহু দুর্ভোগ ভুগিয়াছে, এই সকল ঝড় বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়া কলিকাতার বিষম সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। এই সমস্ত ঝটিকাবর্ত সাধারণতঃ বৎসরের মধ্যে দুইটি নির্দিষ্ট সময়ে সমাগত হইয়া থাকে—দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রারম্ভকালে একবার এবং উহার অবসান কালে আর একবার। শেষোক্ত সময়ে যে সকল ঝড় হয়, সেগুলি সাধারণতঃ উপসাগরের উচ্চতা অংশে উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু বায়ুমানযন্ত্রে তাহাদের আগমনের কোনরূপ নিদর্শন প্রায়ই সূচিত হয় না।

কলিকাতা "প্রাসাদময়ী নগরী" আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। এই আখ্যা ইহা কতদিন হইতে উপভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহা বলা দুষ্কর। কথিত আছে যে, ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইয়া জবচার্ণক এই স্থানটি মনোনীত করেন। ফোর্ট উইলিয়ম ও এসপ্ল্যানেড এবং তাহাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। চাঁদপাল ঘাট হইতে খিদিরপুর পর্যন্ত সমস্তটাই কেবল জঙ্গল ছিল। চৌরঙ্গীর যে স্থানে অধুনা রম্য সৌধশ্রেণী দণ্ডায়মান, ১৭১৭ অব্দে উহা একটি অতি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম ছিল; সেখানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি গৃহ এবং তাহাদের চতুর্দিকে একটা জলাশয় ছিল। তৎকালে চৌরঙ্গী নগরের বহির্ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইত। তথায় দস্যুতস্করের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। রাত্রিকালে ভৃত্যেরা ডাকাতের ভয়ে দলবদ্ধ হইয়া গমনাগমন করিত। কলিকাতার সীমার বহির্ভাগে অশ্বারোহণে গমন করা সে সময়ে বড় বিপজ্জনক

ব্যাপার ছিল। ফরাসী, পর্তুগীজ, মগ, মারহাট্টা—ইহারা সকলেই বিশিষ্ট ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। কথিত আছে যে, ১৭১৭ অব্দে মগেরা সুন্দরবন হইতে ১৭০০ লোক ধরিয়া লইয়া যায় এবং তাহাদিগকে ২০ হইতে ৭০ টাকা দরে আরাকানে চিরদাসরূপে বিক্রয় করে। এরূপ অনুমান করা হইয়া থাকে যে, বর্তমান আরাকানদিগের তিন-চতুর্থ ভাগ সুন্দরবনবাসীদিগের সন্তান। ১৭৭০ অব্দ পর্যন্ত এইরূপ উৎখাত বিদ্যমান ছিল। উক্ত বৎসর, এই সকল মনুষ্যাপহারকদিগের হস্ত হইতে কলিকাতার বন্দর রক্ষা করিবার নিমিত্ত শিবপুর রাজকীয় উদ্ভিদ উদ্যানের নিকটস্থ মুকুয়া থানা দুর্গের সন্নিধানে নদীর এপার হইতে ওপার পর্যন্ত একটি লৌহ-শৃঙ্খল প্রসারিত করা হয়। মারহাট্টারা উহার নিকটেই চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং থানা দুর্গ অধিকার করিল। উক্ত দুর্গ যেস্থানে অবস্থিত ছিল, সেই স্থানে এক্ষণে রাজকীয় উদ্ভিদ উদ্যানের মধ্যস্থ ডাক্তার আণ্ডার্সনের গৃহ দণ্ডায়মান। উত্তরপাড়ায় অদ্যাপি এমন অনেক প্রাচীন লোক আছেন, যাহারা তাঁহাদের পিতা, পিতামহ প্রভৃতির নিকট শুনিয়াছেন যে, মারহাট্টা বর্গীর দৃষ্টি পরিহার করিবার নিমিত্ত স্ত্রীলোকেরা কলসী মাথায় করিয়া পুষ্করিণীর জলে আত্মগোপন করিত। "বর্গীর হাঙ্গামা" কথাটি এখনও একটি প্রবাদবাক্য হইয়া রহিয়াছে এবং সে কালের সেই ভীষণ দৌরাত্ম্যের কথা স্মৃতিপথে জাগরূক করিয়া রাখিয়াছে। এতদ্দেশে দাসব্যবসায় বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল। কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত দাসব্যবসায়ের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ, পর্তুগীজ হিন্দু মুসলমান সকলেই এই প্রথার পক্ষপাতী ছিল। এক্ষণে দাসব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও আমেরিকা অপেক্ষা বঙ্গের দাসগণের অবস্থা অপেক্ষাকৃত অনেকাংশে ভাল ছিল।

মুসলমান রাজত্বকালে কেবল কলিকাতা কেন, সমস্ত বঙ্গদেশই অতীব অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া বিবেচিত হইত। গ্লাডুরিয়া সাহেব স্বপ্রণীত বঙ্গদেশের বিবরণীতে এ সম্বন্ধে মুসলমানদিগের অভিপ্রায় এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:

"পূর্ব পূর্ব রাজাদিগের রাজত্বকালে জলবায়ুর অপকৃষ্টতা নিবন্ধন বঙ্গদেশ মোগল ও অন্যান্য বৈদেশিকগণের স্বাস্থ্যের প্রতিকূলস্বরূপে বিবেচিত হইত; সেই জন্য যে সকল কর্মচারী রাজার বিরাগভাজন হইত, তাহারাই বঙ্গদেশে প্রেরিত হইত। সুতরাং এই উর্বর ভূখণ্ডে চিরবসন্ত বিরাজমান থাকিলেও, ইহা অন্ধকারময় কারাগার, প্রেতভূমি, ব্যাধিনিকেতন ও যমালয় স্বরূপে পরিগণিত হইত।" বোধ হয়, য়্যাটকিন্সন সাহেবের কবিতা নগরের তদানীন্তন অবস্থা সুন্দররূপে বর্ণনা করিতেছে। সেই কবিতার মর্ম এইরূপ:

"হে কলিকাতে! তোমার অবস্থা তখন কি ছিল? তোমাকে তখন উদ্বিগ্ন হৃদয়ে অতি কষ্টে-সৃষ্টে জীবন ধারণ করিতে হইত; তখন তোমার অঙ্গ নিবিড় জঙ্গলে ও অনিষ্টকর জলায় সমাচ্ছন্ন ছিল; তাহাতে অনেক সাহসী উচ্চা-

ভিলাষী লোককেই প্রাণ দিতে হইয়াছে, চতুর্দিকে উচ্চ উচ্চ বৃক্ষসমূহ আলোক রুদ্ধ করিত এবং ইউপাস্ তরুর ন্যায় বিষাক্ত বাষ্প উদ্গীর্ণ করত; দিনমান প্রগাঢ় উত্তাপে জ্বলিতে থাকিত এবং তিমিরাচ্ছন্ন রজনী অতিরিক্ত আর্দ্রতা ও জ্বরসঙ্কুল শয্যা আনয়ন করিত, সায়ংকালে যে সকল পর্যটক সজীব ছিল, প্রভাতে তাহারা জীবনশূন্য হইত।

১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে কাপ্তেন হ্যামিলটন একটি হাসপাতালের কথা বলিয়াছেন যে, অনেক রোগী তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু অতি অল্প লোকই জীবিত অবস্থায় সেখান হইতে বহির্গত হইয়া আপনাদের চিকিৎসাবিবরণ প্রচার করিয়াছিল। সর্বদা রৌদ্র, বৃষ্টি, হিম প্রভৃতির প্রভাবাধীনে অবস্থান ও উগ্র বীর্য সুরাপান জন্য যে একপ্রকার রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাতে এক এক জাহাজের সমস্ত লোকজনের মধ্যে গড়ে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হইত। তৎকালে মৃত্যু-সংখ্যা যে অত্যন্ত অধিক ছিল, সাহেবদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-সাধকগণের (মুর্দ্দফরাসদিগের) বিপুল অর্থোপার্জনই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বর্ষাকালেই তাহাদের উপার্জন অধিক হইত; সে-সময়ে কোন কোন বৎসর ইউরোপীয় অধিবাসিবর্গের তিন-চতুর্থাংশ কালগ্রাসে পতিত হইত এবং এক-চতুর্থাংশ মাত্র বাঁচিয়া থাকিত। তৎকালে উত্তরজীবীরা কোনও প্রকারে প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছে বলিয়া পরস্পরের মধ্যে আনন্দ প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে প্রতি বৎসর ১৫ই অক্টোবর তারিখে এক সুবৃহৎ ভোজ্যোৎসবের অনুষ্ঠান করিত। হ্যামিলটন বলেন, ১৭০০ অব্দে কলিকাতায় ১২০০ ইংরেজ ছিল, কিন্তু পরবর্তী জানুয়ারী মাসে ৪৬০ জনকে গোর দেওয়া হয়। ম্যালেরিয়া ও আমাশয় তৎকালে অত্যন্ত প্রবল ছিল, এবং 'পাকা-জ্বর' নামক প্রকার জ্বর রোগে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রোগীরা শমনভবনে গমন করিত।' বিবিকিওালি এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন: "এই রোগে কলিকাতার অধিকাংশ রোগীকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যমালয়ে লইয়া যায়—ডাক্তারেরা অনুমান করেন, গলিত অবস্থার চরমে ইহা অবশ্যম্ভাবী।"

কলিকাতা রিভিউ নামক সাময়িক পত্রে জনৈক লেখক লিখিয়াছেন: "কলিকাতার যে জ্বরের প্রাবল্য ছিল, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। লোকে নিম্নতলে শয়ন করিত, গৃহের ছাদ উন্নত করা হইলেও এবং তাহাতে সিঁড়ি লাগান হইলেও অতি অল্পসংখ্যক গৃহেরই উপরিতল ছিল। ক্ষৌরকার আখ্যায় অভিহিত ইতর শ্রেণীর ইউরোপীয়দিগের মধ্যে একটা রোগ সাধারণতঃ প্রবল ছিল; উহা এক প্রকার পক্ষাঘাত; সুরাপানজনিত মত্ততা ও উত্তেজনার পর অঙ্গে স্থলবায়ু লাগানতে ইহা উৎপন্ন হইত। যকৃতের স্ফোটক অতি মারাত্মক হইত; কাউণ্ট লালির বিরুদ্ধে অন্যান্য দোষারোপের মধ্যে একটি এই যে, স্ফোটক জন্মিবার পূর্বে তিনি এইরূপ ভাবে চিকিৎসিত হইতেন, যেন যকৃৎ স্ফোটক হইয়াছে; কিন্তু তাহা যদি সত্য সত্যই হইত, তাহা হইলে

তাঁহাকে শমনভবনে যাইতে হইত। ঐ কথাটি নিতান্ত অসম্ভব হইলেও, স্ফোটক সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব কিরূপ ছিল, তাহা ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে কয়েক প্রকার জ্বরের প্রাদুর্ভাব ছিল, তৎ-সম্বন্ধে ডাক্তার লিণ্ড লিখিয়াছেন ঃ

"ব্যাধিসমূহ প্রধানতঃ অবিরাম বা সবিরাম শ্রেণীর জ্বর; কখন কখন ঐ সকল জ্বর আরম্ভ হইয়া ক্রমিক চলিতে থাকে এবং কয়েকদিন যাবৎ স্পষ্ট বিরামের কোনও রূপ চিহ্ন বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু সাধারণতঃ মধ্যে মধ্যে বিরাম হইয়া থাকে। তাহাদের সহিত প্রায়ই প্রবল কম্পন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বাভিমুখে দুই দিকেই পিত্তনিঃসরণ হইতে থাকে। ঋতুটি যদি খুব ব্যাধিসঞ্চারপ্রবণ হয়, তাহা হইলে কেহ কেহ উৎকট জ্বরে আক্রান্ত হইয়া অচিরে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়; সমস্ত শরীর সীসবর্ণ চাক্‌রা চাক্‌রা দাগে সমাচ্ছন্ন হয়, এবং শবদেহ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গলিত হইয়া উঠে। এই সময়ে ভেদও প্রবল হয়। আর এক প্রকার ভেদের সহিত অন্ত্রপ্রবাহ থাকে, তাহা হইতে এইগুলিকে পৃথক করিবার নিমিত্ত ইহাদিগকে পৈত্তিক বা দূষিত বলা যাইতে পারে। বঙ্গদেশে এই সমস্ত রোগে 'ল্যান্সেট' (ছুরিকাস্ত্র) খুব সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। অনেকে বলেন, বাঙ্গালার সবিরাম জ্বরের উপর চন্দ্রের বা জোয়ার-ভাটার আশ্চর্য প্রভাব দৃষ্ট হয়। একান্ত সত্যবাদী ও চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রচুর জ্ঞানবিশিষ্ট জনৈক ভদ্রলোক আমাকে বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালার জ্বরে কোন্ সময়ে রোগী মারা যাইবে, তাহা তিনি পূর্বেই সঠিকরূপে বলিয়া দিতে পারিতেন, কারণ সাধারণতঃ ভাটার সময়েই প্রায় তাহা ঘটিত। সে যাহা হউক, এটা নিশ্চিত অবধারিত হইয়াছে যে, ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রগ্রহণ সময়ে যে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাধি উপস্থিত হইয়া বঙ্গদেশে ৩০,০০০ কৃষ্ণকায় ও ৮০০ ইউরোপীয়ের প্রাণ হরণ করে, সেই ব্যাধির পর যে সকল ইংরেজ বণিক্ ও অন্যান্য লোক 'বার্ক' (সিঙ্কোনা) খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল, তাহারা ঐ রোগে পুনর্বার আক্রান্ত হইয়াছিল। গ্রহণের দিনে এই জ্বর প্রায় সকল রোগীকে আক্রমণ করিত; সুতরাং গ্রহণের সহিত যে ইহার সম্বন্ধ আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু মাত্র কারণ নাই।"

কলিকাতায় কলেরা-রোগের প্রথম আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে ডাক্তার লিণ্ড বলেন;—"১৭৬২ অব্দে যে মহামারীতে বঙ্গদেশে ৩০,০০০ কৃষ্ণকায় ও ৮০০ ইউরোপীয় কালগ্রাসে পতিত হয়, সেই রোগে দেখা গিয়াছিল যে, পুনঃ পুনঃ এক প্রকার সাদা আঠাল স্বচ্ছ শ্লেষ্মা বমন এবং তাহার সহিত অবিরত ভেদ, ইহাই অতীব মারাত্মক লক্ষণস্বরূপে বিবেচিত হইত।" কলেরার চিকিৎসা ছিল, বমন-কারক ঔষধ, অহিফেনঘটিত নিদ্রাকারক ঔষধ, আমোনিয়া দ্রব্য, আর জল; উহাতে রোগী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা যাইত। মোসিয়র ডেলন ১৬৯৮ অব্দে Indian mordechi নামক এক প্রকার রোগের কথা লিখিয়াছেন উহার সহিত ভেদ বমন থাকে, এবং উহাতে লোক কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পঞ্চত্ব

প্রাপ্ত হয় ; অন্যান্য চিকিৎসার মধ্যে লোহা পুড়াইয়া লাল করিয়া পাদগুল্ফে ছেকা দেওয়া এবং গোলমরিচের সহিত কাঁজি খাওয়ান সবিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কলেরা যৎকালে ব্যাপক আকারে মাকুইস্ অব হেষ্টিংসের বিপুল সেনাদলে প্রথম প্রকাশ পায়, সে সময়ে দেশীয় লোকেরাই প্রথম অক্রান্ত হইয়াছিল ; ইউরোপীয় রোগীদিগের প্রবল আক্ষেপ (খেঁচুনি) ও তুর্নিবার পিপাসা হইত, কিন্তু ডাক্তারেরা তাহাদিগকে এক বিন্দুও জল খাইতে দিতেন না,—অথচ যাহারা গোপনে জল খাইতে পাইত, তাহারা শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া উঠিত। ব্র্যাণ্ডি ও লডেনম ভিন্ন অন্যান্য চিকিৎসার মধ্যে রোগীকে গরম জলের মধ্যে আকণ্ঠ মগ্ন করিয়া তাহার বাহু হইতে রক্ত মোক্ষণ করা হইত,—তবে কথা এই যে, যদি রক্ত বাহির হইত তাহা হইলেই ঐরূপ করা হইত। ডাক্তারেরা এই রোগের বীজ বায়ুতে থাকে বলিয়া মনে করিতেন, এবং প্রথম প্রথম ইহাকে স্পর্শ সংক্রান্ত কাজ বলিয়াও বিবেচনা করা হইত ; শিবিরানুচরেরা এত শীঘ্র মারা পড়িয়াছিল যে, মার্কুইস অব হেষ্টিংস গোয়ালিয়রের নিকট স্থায়ী শিবির সন্নিবিষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

তৎকালে আমাশয়ের চিকিৎসা কিরূপ হইত, তাহা স্বর্গীয় ডাক্তার গুডিভ সাহেবের লিখিত 'প্রাচ্য ভূখণ্ডে ইউরোপীয় চিকিৎসার প্রসার' বিষয়ক একটি প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারা যায়। তিনি বলিয়াছেন—"আমাশয় রোগীর বল রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য—এই বিবেচনার মদ ও সসার মাংসময় খাদ্য অতীব উপযুক্ত পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। এই সকল স্থলে রোগীকে ইচ্ছানুসারে পোলাও, কালিয়া, মুরগীর কাবাব ও গোলমরিচযুক্ত 'চিকেনব্রথ' (কুক্কুট শিশুর যুষ) এবং তাহার সহিত তুই এক গেলাস ঔষধ বা কিঞ্চিৎ ব্র্যাণ্ডি ও জল এবং প্রচুর পাকা ফল খাইতে বলা হইত। দেশীয় চিকিৎসকেরা গরম ও ঠাণ্ডা রোগের নিমিত্ত গরম ও ঠাণ্ডা ঔষধ—মন্ত্র ও কবচ ব্যবহার করিত ; আবার ডাক্তার লিণ্ড বলেন যে পর্তুগীজ ডাক্তারেরা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীকাররূপে রোগীর দেহের সমস্ত ইউরোপীয় শোণিতকে দেশীয় শোণিতরূপে পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিত। এই কার্য কি প্রকারে সংসাধন করিবার চেষ্টা করিত, শুনিবেন ? তাহারা রোগীর শরীরের শিরা ছেদন করিয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলিত এবং যতক্ষণ না তাহাদের বিশ্বাস হইত যে, সমস্ত রক্ত বহির্গত হইয়া গিয়াছে, ততক্ষণ পুনঃপুনঃ শিরাব্যবচ্ছেদ করিতে থাকিত। তৎপরে তাহারা রোগীকে নিরবচ্ছিন্ন এতদ্দেশোৎপন্ন দ্রব্য খাইতে দিত, কারণ তাহারা মনে করিত যে, এই উপায়ে রোগীর দেহে পূর্ব শোণিতের পরিবর্তে ভারতীয় শোণিতের সঞ্চার হইবে, এবং তাহা হইলে ঐ রোগী পূর্বে যে সকল রোগ ভোগ করিয়াছে, সে সকল ব্যাধি আর তাহাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না! ডাক্তার বোগ্ বলেন, জ্বররোগে রক্তমোক্ষণ চিকিৎসাই সচরাচর অবলম্বিত হইত। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার লেস্কার্ড চীনাবাজারের ৩৭নং বাটীতে স্নানাগার স্থাপন করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির

স্নানের মূল্য এক টাকা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ ব্যবসায়ে তাঁহার লাভ হয় নাই।

ইংরেজেরা যদি খাদ্য, পানীয়, পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিষয়ে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপযোগী জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিতেন, তাহা হইলে অনেক রোগের আক্রমণ হইতে যে মুক্ত থাকিতে পারিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরেজ সমাজে দেশাচাররূপ রাক্ষসের প্রভুত্ব যেরূপ বদ্ধমূল, বোধহয় আর কোনও সমাজে সেরূপ নহে। ইংরেজজাতি আপনাদের দেশাচারের দাস ইংরেজ সমাজে দেশাচারের আধিপত্য কিরূপ গভীরভাবে বিস্তৃত, তাহার যথাযথ বর্ণনা করিয়া জনৈক লেখক কোনও সাময়িক পত্রে লিখিয়াছেন: ইংরেজ ভূমণ্ডলের যেখানেই গিয়াছেন, সেইখানেই তিনি আপনার দেশাচারটিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। তিনি লণ্ডনেও যেরূপ টুপিওয়ালা, কলিকাতাতেও সেইরূপ টুপিওয়ালা। এ বিষয়ে ব্যাটেভিয়ার ওলন্দাজের সহিত তাঁহার সুন্দর সাদৃশ্য আছে, ব্যাটিভিয়াব ওলন্দাজেরা জলার মধ্য দিয়া খাল বা দুর্গন্ধময় পয়ঃপ্রণালীসকল খনন করিয়াছে, কেননা আমস্টার্ডাম নগরে খাল ও পয়ঃপ্রণালী আছে—তাহার ফল হইল মহামারী জ্বর, সুতরাং দেশীয়দিগের তরবারি অপেক্ষা খালেই জাবাদ্বীপে অধিকসংখ্যক ওলন্দাজের প্রাণসংহার করিয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, ১৭৮০ অব্দে কলিকাতার লোকদিগকে এইরূপ সতর্ক করা হইয়াছিল —সম্প্রতি অনেকগুলি আকস্মিক মৃত্যুঘটনা হইয়াছে, অতএব যতদিন গ্রীষ্ম থাকিবে, ততদিন ভদ্রলোকেরা যেন অতিরিক্ত আহার না করেন; কোন ভারত-বাণিজ্য-রত বড় বড় জাহাজের ডাক্তার খানার সময় আকণ্ঠ গোমাংস ভোজন করিয়া রাস্তায় পড়িয়া মরিয়াছিল; সেদিন তাপমান যন্ত্র ৯৮ দাগে উঠিয়াছিল।"

সে সময়ে ভাল ডাক্তারও পাওয়া যাইত না। আমাশয় রোগের চিকিৎসা-প্রণালী ইতঃপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পাদরী লঙ সাহেব বলেন, তখন কলিকাতায় দুইজন ডাক্তার ছিলেন; তাঁহারা প্রত্যেকে বার্ষিক ২৫ পাউণ্ড (২৫০ টাকা) বেতন পাইতেন, তবে অন্যান্য কর্মচারীর ন্যায় তাঁহাদেরও কতকগুলি দ্রব্যে শতকরা দস্তরি পাওনা ছিল—এমন কি ম্যাডিরা নামক মদ্যও বাদ যাইত না। হ্যামিল্টন সাহেব বলেন—"এই সময়ে (১৭০৯) ডাক্তারদের বিদ্যাবুদ্ধি তেমন ভাল ছিল না, তাঁহারা তেমন বেতনও পাইতেন না। "হাঁড়ির একটা ভাত টিপিলেই সমস্ত ভাতের অবস্থা বুঝিতে পারা যায়; বোম্বাই প্রদেশের একজন গবর্ণরের সম্বন্ধে এইরূপ একটা গল্প প্রচলিত আছে যে, এক সময়ে তিনি ব্যয়লাঘব-সাধন দ্বারা তাঁহার ইংলণ্ডস্থ মাননীয় প্রভুর অনুরাগ আকর্ষণ করিবার অভিলাষী হইয়া দেখিলেন যে, ডাক্তারের বেতন মাসিক ৪২্ টাকা; ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, এ বিষয়ে অবশ্যই কোনও প্রকার ভুল হইয়াছে, অঙ্ক দুইটি উলটপালট্ হইয়া গিয়াছে। এই কথা বলিয়াই তিনি কলমের এক খোঁচায় ৪২্ টাকার পরিবর্তে ২৪্ টাকা লিখিয়া ফেলিলেন।

১৭৮০ অব্দে কলিকাতার কোনও ইংরেজী সাময়িক পত্রে এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর সরস ব্যঙ্গকবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা এস্থলে তাহার মর্মার্থ উদ্ধৃত করিলাম। বলা বাহুল্য, অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য বা রস রক্ষা করা অসাধ্য।

"যে সকল ডাক্তার কখনও লীডেন বা কাণ্ডার্স দেখে নাই, তাহারা যুক্তিবিরুদ্ধ পথে চলে, এবং রক্তহীনতা (নেবা) রোগে রক্ত মোক্ষণ করায়। যদি তোমার স্ত্রীর শিরঃপীড়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাঙ্গ্রোডো * সাহেবকে ডাকাইয়া তোমার পত্নীকে স্পর্শ করিতে দাও; সে শূকর-ঘাতক কসাইয়ের মত অবিলম্বে রোগিণীর শরীরে ল্যান্সেট বসাইয়া দিবে। ধসা পচা রোগে শরীর অতি দ্রুত ক্ষয় পাইতে থাকিলেও শোণিতের জলীয়াংশ অধিকতর তেজোহীন করিবার নিমিত্ত সে তোমার শরীর হইতে রক্ত বাহির করিয়া দিবে। কিন্তু ভাই! ব্যাপারটা বেশ করিয়া বুঝিয়া দেখ, একজন বেশ ভাল মিড্‌শিপম্যান (সর্বনিম্ন পদস্থ নৌসৈনিক কর্মচারী) সহসা 'ডাক্তার' উপাধি পাইয়া বসিল। কি মজা! সে ব্যক্তি তোমার নাড়ী ধরিল, ঠিক যেন জাহাজের কাছি ধরিয়াছে, আবার অমনি সঙ্গে সঙ্গে ঠিক পোপের মত তোমার রোগ ঠাওর করিয়া ফেলিল! আজ যদি গ্রীকদার্শনিক প্লেটো বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের কোন কোন ডাক্তারকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া যাইত; যদি তোমার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে উহারা বলিয়া বসিবে, ওটা পিত্তের দোষ এবং খুব গম্ভীরভাবে ভয়ঙ্কর মুখভঙ্গি করিয়া এবং অতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ঘোড়ার উপযুক্ত একতাল জোলাপ এবং ক্ষারময় বটিকা দিবে।"

পরন্তু ১৭৮০ অব্দে দেখা যায়, চিকিৎসা ও আইন উভয়ই তত্তৎ ব্যবসায়ী-দিগের পক্ষে সুবর্ণের আকরস্বরূপ হইয়াছিল। তৎকালে ডাক্তারেরা পাল্কী চড়িয়া রোগীদের বাড়ী যাইতেন এবং সাধারণ রোগে প্রত্যেক বারে এক একটি সোনার মোহর দক্ষিণা লইতেন; অসাধারণ স্থলে বা অতিরিক্ত বাবদে দক্ষিণার পরিমাণ অত্যধিক ছিল। ঔষধের মূল্যও অত্যন্ত উচ্চ ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পুরাতন কেল্লায় একখানি ডাক্তারী ঔষধের দোকান খুলিয়াছিলেন। কয়েকটি ঔষধের মূল্য এস্থলে দেওয়া গেল: এক আউন্স বার্ক ৩্ টাকা, একটা বেলেস্তারা (Blistar) ২্ দুই টাকা, একটা ঔষধের বড় বটিকা ১্ এক টাকা ইত্যাদি ইত্যাদি। বর্তমান সময়ে কাহারও অমূল্য জীবন রক্ষা করিতে হইলে তাহাকে সর্বস্বান্ত হইতে হয়, থালা ঘটিবাটি বাঁধা দিতে হয়। আধুনিক কবিরাজ মহাশয়েরাও ইউরোপীয় প্রণালীর চিকিৎসা ব্যবসায়ী ডাক্তারদিগের ন্যায়

---

* সাঙ্গ্রোডো সুবিখ্যাত 'জিলব্লাস' নামক উপন্যাসের একটি চরিত্র—এক-জন প্রসিদ্ধ ডাক্তাররূপে চিত্রিত; রক্তমোক্ষণই তাঁহার একমাত্র চিকিৎসা প্রণালী।

প্রত্যেকবার রোগী দেখার প্রদর্শনী লইয়া থাকেন। ইহাদের ঔষধের মূল্য এরূপ অত্যধিক যে, ইহারা কি প্রণালীতে যে মূল্য নির্ধারণ করেন, তাহা স্থির করিতে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়। পূর্বকালে—অধিক দিনের কথা নহে, ৫০ বৎসর পূর্বেও দেশীয় কবিরাজেরা পরিমিত মত অর্থ লইতেন এবং তাহাও নিতান্ত মমতাশূন্য ভাবে লইতেন না। আমাদের সমাজের ইতর-ভদ্র সকল শ্রেণীর প্রতিই তুল্য-রূপ দয়ামায়া, স্নেহমমতা ছিল বলিয়া তাঁহারা যথোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র ছিলেন। লোকে তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির ও চিকিৎসা-নৈপুণ্যেরও যথেষ্ট সুখ্যাতি করিত; আজ পর্যন্ত কেহ তাঁহাদিগকে অতিক্রম করা দূরের কথা, তাঁহাদের সমকক্ষও হইতে পারেন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সকল বিষয়েই প্রাচীন প্রথা শীঘ্র শীঘ্র তিরোহিত হইতেছে, এবং সকল দিকেই নব নব প্রথা লোকের উপর চাপিয়া বসিতেছে।

বলা বাহুল্য যে, স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় যথোচিত ব্যবস্থার অভাব এবং মৃত্তিকাস্থিত নানাপ্রকার দূষিত পদার্থ কলিকাতার মৃত্যুসংখ্যা বহুপরিমাণে বর্ধিত করিয়াছিল। যে পাকা জ্বরের বিষয় পূর্বে লিখিত হইয়াছে, অনেকে অনুমান করিতেন, কলিকাতার মধ্যে সর্বত্র যে ভয়ানক জঙ্গল এবং পচা পুকুর ও ঝিল বিদ্যমান, তাহাই ঐ জ্বরের প্রধান কারণ। কেবল পশুদের কেন, মনুষ্যদের মৃতদেহও ক্রমাগত কয়েকদিন যাবৎ প্রখর রৌদ্রে রাস্তায় পড়িয়া পচিতে থাকিত। শৃগাল ও অন্যান্য পশু সেই সকল পচা শবদেহ একাদিক্রমে কয়েকদিন পর্যন্ত খাইতে থাকিত। তৎপরে সেই মৃতদেহ নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইত—সময়ে সময়ে পুষ্করিণীতেও যে নিক্ষেপ করা না হইত, তাহাও নহে।

সেকালে ব্ল্যাকিয়ার নামক কলিকাতাবাসী একজন সাহেব সমাজে বেশ সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ট্যাঙ্ক স্কোয়ার (বর্তমান নাম ড্যালহাউসি স্কোয়ার) নামক স্থানে বন্য পক্ষী শিকার করিতেন। ঐ সাহেব বলিয়াছেন, ১৭৯৬ অব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারি মাসে বসন্ত মহামারী উপস্থিত হইয়া অনেক মানুষ ও গবাদি গৃহপালিত পশুর প্রাণসংহার করিয়াছিল। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে, মাদ্রাজের ফিজিশিয়ান জেনারল ডাক্তার জেম্‌স আণ্ডারসন কলিকাতার ইংরেজ উপনিবেশে টিকা দিবার প্রথা প্রবর্তিত করেন। তিনি দুইটি ইউরোপীয় বালককে গো-বসন্তের বীজে টিকা দিয়া তাহাদিগকে জাহাজে করিয়া ফোর্ট উইলিয়ামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উইলিয়াম রাসেল নামক একজন সাহেবই কলিকাতায় গোবীজে টিকা দিবার প্রণালী সর্বপ্রথম আরম্ভ করেন এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে ডাক্তার জেনারের আবিষ্কারের সুফলের অধিকতর প্রসারসাধন বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করেন। এই সময়ে (১৮০২) আর একটি মহোপকারজনক ব্যবস্থা প্রণীত হয়। পূর্বে কতকগুলি ভ্রান্ত হিন্দু বিপথে চালিত হইয়া গঙ্গাসাগরে (সাগরদ্বীপের নিকট সমুদ্রে) সন্তান ভাসাইয়া দিত; গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত করিয়া দিলেন। শাস্ত্র কোনও

কালেই এই অমানুষিক নির্দয় প্রথার অনুমোদন করে নাই। এই আদেশ যাহাতে লঙ্ঘিত না হয়, তাহা দেখিবার জন্য এবং আবশ্যক হইলে বল প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত একদল সৈন্য তথায় প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু কেহ কোন প্রকার বাধা জন্মাইবার চেষ্টা করে নাই।

কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতির নিমিত্ত 'লটারি কমিটি' যে সকল কার্য করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা বিলক্ষণ উপকার হইল। সেকালে লটারির সুব্যবস্থা করিবার জন্য কয়েকজন 'লটারি-কমিশনার' ছিলেন। তাঁহারা ১৭৯৪ অব্দে সাধারণের হিতজনক ও দাতব্যকার্যের নিমিত্ত প্রতি টিকিট ৩২৲ টাকা দরে ১০,০০০ টিকিট বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। এইরূপ টিকিট বিক্রয়দ্বারা যে অর্থলাভ হইল, তাহা দ্বারা কয়েকটি অত্যুৎকৃষ্ট রাস্তা ও গির্জা নির্মিত হইয়াছিল। পাদরী লঙ সাহেব বলেন,—"লটারি সেকালের সাধারণ প্রথা ছিল; মাসিক ১০০০৲ টাকা ভাড়ায় বড় বড় বাড়ী ৬০০৲ টাকা দরের সুতি টিকিট ধরাইয়া বিক্রয় করা হইত; তদ্ভিন্ন বাগানবাড়ী সকল, এবং নদীর ধারে যেখানে বাস করা উচিত নহে, এমন স্থানে অবস্থিত হাবড়ায় একটা বাড়ীও লটারিদ্বারা বিক্রীত হয়। হার্মোনিক হাউস নামক একটা বিখ্যাত হোটেল ১৭৮০ অব্দে লটারিদ্বারা নীলামে ধরান হয়, এবং মাননীয় জাস্টিস্ হাইড্ তাহা প্রাপ্ত হন। এণ্টালি (ইটিলি) নামক স্থানের একটা বাগানবাড়ী ১৭৮১ অব্দে ৭৫৲ টাকা দরের লটারি টিকিট ধরাইয়া ৬০০০৲ টাকায় বিক্রীত হয়। উত্তরকালে লটারি টিকিট বিক্রয় দ্বারা লব্ধ অর্থে কলিকাতায় কয়েকটি সর্বোৎকৃষ্ট রাজপথ নির্মিত হইয়াছিল।*

---

* সাধারণের হিতকর কার্যের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের প্রথা ১৭৯৩ অব্দে প্রথম প্রবর্তিত হয়। উক্ত বৎসরের বঙ্গীয় লটারি কমিশনারগণ লটারি দ্বারা যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা প্রথমে দেশীয়দিগের হাসপাতালের কমিটির হস্তে অর্পণ করিতে চাহেন, কিন্তু ঐ কমিটি তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হওয়ায় পরে সেই অর্থ ঋণ পরিশোধে অসমর্থ (দেউলিয়া) অধমর্ণদিগের উদ্ধারসাধন কল্পে অর্পিত হয়। প্রথমবার প্রতি টিকিট ৩২৲ টাকা দরে ১০,০০০ টিকিট বিক্রীত হয়। লটারির ব্যয় নির্বাহার্থ শতকরা ২৲ টাকা এবং লোকহিতকর ও দাতব্য কার্যের নিমিত্ত শতকরা ১০৲ টাকা কাটিয়া রাখার পর, অবশিষ্ট সমস্ত টাকাই পুরস্কার বিতরণে ব্যয়িত হইয়াছিল। ১৮০৫ সালে ১০০০৲ টাকা করিয়া ৫,০০০ টিকিট বিক্রয় করা হয়। তৎকালে যত টাকা উঠিয়াছিল, তাহার শতকরা ১০৲ টাকা টাউনহলের নিমিত্ত ও শতকরা ২৲ টাকা ব্যয়নির্বাহার্থ লওয়া হইয়াছিল। ১৮০৬ সালে সাড়ে সাত লক্ষ টাকার লটারি খেলা হইয়াছিল; এবং অনেকদিন পর্যন্ত এইরূপ চলিয়াছিল। লর্ড ওয়েলস্‌লি শহরের উন্নতি সাধনার্থ যে কমিটি স্থাপন করেন, সেই কমিটির অস্তিত্ব যতদিন ছিল, ততদিন

দমদম, বারাসত, চন্দ্রনগর, কাশিমবাজার, চট্টগ্রাম, শুকসাগর ও হুগলির নিকট বিরকুল,—এই কয়েকটি স্থান তৎকালে সবিশেষ প্রীতিপ্রদ ও স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হইত। ১৭৪৯ সালের পূর্বে কলিকাতায় এক প্রকার মিউনিসিপ্যালিটি ছিল। সে যাহা হউক, ইংরেজদিগের বসতি স্থানটিকে মনোরম ও স্বাস্থ্যকর করিবার অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্ট ১৭৪৯ সালে নর্দমাগুলি পুনর্বার জরিপ করিবার আদেশ প্রদান করেন। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বণিক্ কোম্পানির এজেণ্টগণ এক আদেশ প্রচার করিয়া তাঁহাদের জমিদারীর ভিতর শৃঙ্খলাশূন্য গৃহনির্মাণ করিতে সকল লোককেই নিষেধ করেন। এরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রচার আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ অনেক লোকই তাঁহাদের অনুমতি না লইয়া গৃহ, পুষ্করিণী ও প্রাচীর নির্মাণ করিত। এতাদৃশ অবস্থায় ইংরেজ-শাসনকর্তাদিগের কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতির প্রয়াস যে কতদূর প্রশংসনীয়, তাহা

লটারি দ্বারা লব্ধ অর্থ সেই কমিটির হস্তে অর্পণ করা হইত। লটারি দ্বারা সংগৃহীত অর্থে ১৮০৫ হইতে ১৮১৭ সাল পর্যন্ত বহু প্রয়োজনীয় ও হিতকর কায সাধিত হয়। স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল এই সকল লটারির 'পেট্রন্' (পৃষ্ঠপোষক) ছিলেন। লটারির টাকায় কয়েকটি বড় বড় পুষ্করিণী ও বেলেঘাটা খাল খনন করা হয় এবং টাউন হল ও ইলিয়ট রোড প্রভৃতি কয়েকটা প্রশস্ত রাজপথ নির্মিত হয়। শহরের উন্নতি সাধনকল্পে লটারির লাভ হইতে অন্যূন সাড়ে সাত লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। ১৮১৭ সালে কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেণ্ট (সহ-সভাপতি) সুপ্রসিদ্ধ 'লটারি কমিটি' প্রতিষ্ঠিত করেন। উক্ত কমিটি ভূতপূর্ব ১৭টি লটারির উদ্‌বৃত্ত সাড়ে চারি লক্ষ টাকা স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এই কমিটি ১৮৩৬ অব্দ পর্যন্ত ২০ বৎসর কাল এক কন্‌সার্ভেন্সি (রাস্তাঘাট প্রভৃতির অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রক্ষাবিধান কার্য) ব্যতীত শহরের আর সমস্ত বিষয়েরই তত্ত্বাবধান করিতেন। কন্‌সার্ভেন্সি বিভাগটা পূর্বের ন্যায় ম্যাজিস্ট্রেটগণের হস্তেই ছিল। ১৮৩৬ সালে লটারি-প্রথা বিলুপ্ত হয়। দেখা যাইতেছে যে, কমিটির কল্যাণে রাস্তায় জল দেওয়ার প্রথা প্রথম প্রবর্তিত হয়। ১৮১৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলকাতার গেজেটে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল :

"ধর্মতলার কোণ হইতে চৌরঙ্গি থিয়েটার পর্যন্ত রাস্তায় জল দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় চৌরঙ্গিবাসীদিগের সুখস্বচ্ছন্দতা বর্ধনের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে, ইহাতে আমরা সাতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি।"

"লটারি কমিটি যে সকল শ্রীবৃদ্ধিকর ও লোকহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার সবিস্তার বর্ণনা পাঠকের বিরক্তিকর হতে পারে। আমরা এস্থলে কেবল অপেক্ষাকৃত প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করিব। সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, লটারি কমিটির যত্নে ও তত্ত্বাবধানে শৃঙ্খলাশূন্য কলিকাতাকে পুনর্গঠিত করিয়া আধুনিক শহরসমূহের ন্যায় সুশৃঙ্খল আকারে

বলিয়া শেষ করা যায় না। স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় আধুনিক ভাবসমূহ যে পাশ্চাত্য দেশ-সম্ভূত, তাহাতে সন্দেহ নাই; সুতরাং স্বাস্থ্যবিধানের বর্তমান উপায়াবলী ও যন্ত্রাদিও পাশ্চাত্য জগতের আবিষ্কৃত। কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধিসাধনার্থ ইংরেজরা যে প্রভূত আয়াস স্বীকার ও অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে ইহার প্রাকৃতিক অবস্থা ও দৃশ্য সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ইংরেজদিগের প্রথম আমলে যে সকল শাসনকর্তা কলিকাতার উৎকর্ষবিধানকল্পে সুধারাসম্মত প্রণালীক্রমে যত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, তন্মধ্যে মার্কুইস অব ওয়েলেসলির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয় শ্রেণীর কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে লইয়া একটি কমিটির সংগঠন করেন। সেই কমিটি শ্রীবৃদ্ধিসাধনের প্রণালী নির্দেশ করিয়া যে রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেন, তদ্দৃষ্টে উক্ত মার্কুইস্ মহাত্মা এবিষয়ে কিরূপ আন্তরিক যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। তিনি গবর্ণমেণ্টের ধনাগার উন্মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পয়ঃপ্রণালীসমূহের সংস্কারসাধনের দিকেই তাঁহার প্রথম মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজ উক্তির ধর্ম উদ্ধৃত করাই সঙ্গত বোধ হইতেছে: "বর্ষাকালের শেষভাগে কলিকাতার স্বাস্থ্য যে অত্যন্ত বিকৃত হইয়া উঠে, তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত

পরিণত করিবার কার্য কেবল যে প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা নহে, প্রত্যুত ঐ কার্য সতেজে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। যে সুন্দর সুপ্রশস্ত রাজপথ কলিকাতাকে উত্তর-দক্ষিণে ভেদ করিয়া বরাবর সরল রেখাক্রমে বিস্তৃত হইয়াছে, —কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট, ওয়েলিংটন স্ট্রীট, ওয়েলেস্‌লি স্ট্রীট ও উড স্ট্রীট, যার এক-একটি খণ্ডের নাম মাত্র, সেই সুন্দর রাস্তাটি, এবং সেই রাস্তার পার্শ্বে স্থানে স্থানে অবস্থিত কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার, কলেজ স্কোয়ার, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ও ওয়েলেস্‌লি স্কোয়ার নামক পুষ্করিণী মধ্যস্থ প্রমোদোদ্যানগুলি উক্ত কমিটির কল্যাণেই নির্মিত হইয়াছিল। ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কীড স্ট্রীট, হেস্টীংস স্ট্রীট, ক্রীক রো, ম্যাঙ্গো লেন, বেণ্টিং স্ট্রীট, প্রভৃতি রাস্তাগুলিও কমিটি উন্মুক্ত করিয়া সরল করেন এবং তাহাদের বিস্তারিত বর্ধিত করেন। কমিটি বড় বড় রাস্তা ও ছোট পাদচরণপথের নির্মাণ এবং পুষ্করিণীসমূহের খনন ও তৎপার্শ্বে ইষ্টকরচিত অনুচ্চ স্তম্ভবৃতির নির্মাণ দ্বারা ময়দানের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন। স্ট্রাণ্ডরোডও কমিটি কর্তৃক নির্মিত হয়। কমিটি কলুটোলা স্ট্রীট, আমহার্স্ট স্ট্রীট, ও মির্জাপুর স্ট্রীট —এই তিনটি রাস্তার জরিপ ও স্থান নির্ণয়াদি করিয়া সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া দিয়াছিলেন এবং মির্জাপুর ট্যাঙ্ক ও সুরতিবাগান ট্যাঙ্ক নামক দুইটি পুষ্করিণী ও শার্টের বাজারের কয়েকটা পুষ্করিণীও খনন করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন লটারি-কমিটি কয়েকটি রাস্তা পাকা করিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন ও অনেকগুলি রাস্তায় জল দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাস্তায় জল দিবার জন্য চাঁদপালের ঘাটে একটা কলও স্থাপিত হইয়াছিল।

হইলে দেখা যায় যে, নর্দমা ও পয়ঃপ্রণালীসমূহের কদর্য অবস্থা এবং শহরের মধ্যে ও তাহার সন্নিহিত স্থানসমূহে জল জমিয়া থাকাই তাহার প্রধান কারণ।" উক্ত মহানুভব এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, "ভারতবর্ষ শাসন করিতে হইলে, রাজপ্রাসাদে থাকিয়া, রাজার ন্যায় মনোভাব লইয়া, ঐ কার্য করা উচিত, সামান্য দোকানঘরে থাকিয়া মখমল ও নীলের খুচরা দোকানদারের মনোভাব লইয়া ভারতবর্ষ শাসন করা শোভা পায় না।" গভর্ণর ভ্যান্‌সিটার্ট, লর্ড ক্লাইভ, গভর্ণর ভেরেলেস্ট, গভর্ণর কার্টিয়ার, গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস—ইহারাও নগরের পরিচ্ছন্নতা বিধান করিবার ও ইহাকে সুখস্বচ্ছন্দকর ও স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত কবিবার পক্ষে যত্ন চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। সার উইলিয়াম হাণ্টার বলেন: "যখন হেস্টিংস সাহেব শাসনকর্তা হইলেন, তখন আরও কয়েকটি নূতন বিধি প্রণয়ন করিলেন, পুলিসের কর্মচারীদিগকে আরও কিঞ্চিৎ অধিক ক্ষমতা দিলেন, কৃষ্ণ ও শ্বেত শহরকে ৩৫টি ওয়ার্ডে (বিভাগে) বিভক্ত করিলেন, এবং দেশীয়দিগের আরও কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়া যাইবার সম্মতি ক্রয় করিলেন।"

প্রথম অবস্থায় মিউনিসিপ্যাল কার্য মেয়র এবং নয় জন অলডারম্যান দ্বারা পরিচালিত হইত; তাঁহারা সকলেই গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিয়োজিত হইতেন। কিন্তু পয়ঃপ্রণালীর সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তৎকালে একটি কমিটি ও স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট এবং গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত ডাক্তার নগরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করিতেন। ইতিমধ্যে জাস্টিসগণ আসরে অবতীর্ণ হইলেন। ইহারা যাবজ্জীবন কালের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। পরলোকগত সার জর্জ ক্যাম্বেল একটি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়া মিউনিসিপালিটির সংস্কারসাধনের বিফল চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য এইরূপ ছিল: "মিউনিসিপাল কমিশনারদিগের ক্ষমতাবৃদ্ধি, ম্যাজিস্ট্রেটদিগের সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত অল্প মিউনিসিপাল কার্য ও দায়িত্ব-অর্পণ, নির্বাচনপ্রণালী দ্বারা মিউনিসিপাল কমিশনারদিগের নির্বাচন, এবং অন্যান্য প্রকারে মিউনিসিপাল স্বায়ত্তশাসনের প্রসারবর্ধন।" তিনি নিজে বলিয়াছেন, টেক্স বৃদ্ধি করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, স্বায়ত্ত শাসনপ্রথার প্রবর্তনই তাঁহার উদ্দেশ্য। আর একস্থলে তিনি বলিয়াছেন: "মিউনিসিপাল-স্বায়ত্তশাসন এদেশে অজ্ঞাত নূতন পদার্থ নহে; উহা এতদ্দেশের স্বভাবসিদ্ধ, কারণ উহা হিন্দুজাতির অতি প্রাচীন নীতি ও অভ্যাস।" তাঁহার উত্তরাধিকারী পরলোকগত সার রিচার্ড টেম্পল ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনক্রমে কলিকাতার করদাতাদিগকে কয়েকজন কমিশনারের নির্বাচনের অধিকার প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু ঐ সকল কমিশনারের ক্ষমতা ও অধিকার স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কলিকাতায় স্বায়ত্তশাসনপ্রথা প্রবর্তিত হওয়ার যে সমস্ত সংস্কার সাধিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এইগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, যথা—নর্দমা ও পয়ঃপ্রণালীসমূহের সংস্কার,

রাস্তাগুলিতে গ্যাস ও তাড়িতালোক প্রদান, বস্তিজমির উন্নতিবিধান, ময়লা ও জঞ্জাল আবর্জনার দূরীকরণ, এবং বর্তমান কলের জলের ব্যবস্থা। নগরের মিউনিসিপাল-শাসনের ইতিহাস সবিশেষ কৌতুকাবহ। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের এরূপ স্থান নাই যে, আমরা তাহা সবিস্তারে বর্ণন করিতে পারি; সুতরাং সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে। জব চার্ণকের সময়ে ইংরেজ বণিকৃগণ যৎকালে কলিকাতায় বসতি স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় হইতেই তাঁহারা ইহার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য সবিশেষ উদ্যোগী হন। এই অস্বাস্থ্যকর স্থানকে বসবাসযোগ্য করিবার নিমিত্ত তাঁহারা প্রভূত প্রয়াস পাইয়াছিলেন। জমিসকল পুনঃ পুনঃ জরিপ করিয়া নকশা ও ম্যাপ প্রস্তুত করা হইতে লাগিল; রাস্তাসকল নির্মিত হইতে লাগিল; জঙ্গল দূরীকৃত হইতে লাগিল; স্থলভাগকে সমতল করিবার উপায় অবলম্বিত হইতে লাগিল এবং অন্যান্য প্রকারে স্বাস্থ্যসম্পর্কীয় ও গৃহসম্বন্ধীয় সংস্কারসাধনের উপায় সকল স্থিরীকৃত হইয়া কার্য আরম্ভ হইল। উপনিবেশটিকে মনোজ্ঞ ও স্বাস্থ্যকর করিবার নিমিত্ত তৎকালে ব্যক্তিগত চেষ্টার বিলক্ষণ প্রয়োজনীয়তা ও কার্য-কারিতা ছিল। বস্তুতঃ বাণিজ্য ও লোকহিতৈষণাই স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ও গৃহ-সম্পর্কীয় সংস্কারসাধনের পদপ্রদর্শক হইয়াছিল, এবং গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎসম্বন্ধে দায়িত্ব ও কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিলেও, তাহার পর দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যক্তিগত চেষ্টায় এ বিষয়ে অনেক কাজ হইয়াছিল।

বর্তমান কলিকাতার সূত্রপাত ১৭৫৭ অব্দে। পলাশীর যুদ্ধের পর মিরজাফর বাঙ্গলার মসনদে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং সিরাজুদ্দৌলা ১৭৫৬ ও ১৭৫৭ সালে কলিকাতা লুণ্ঠন করায় তত্রত্য বণিকৃগণের ও অপরাপর অধিবাসীদিগের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার পরিপূরণার্থ সন্ধির নিয়মানুসারে প্রচুর অর্থ প্রদান করেন। তাহাতে ইংরেজরা ৫,০০,০০০ পাউণ্ড, হিন্দু ও মুসলমানগণ ২,০০,০০০ পাউণ্ড, এবং আর্মানীরা ৭০,০০০ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতে কলিকাতার ইতিহাস সবিশেষ কৌতুকাবহ হইয়া উঠে। তদবধি নগরের শ্রীবৃদ্ধি বেশ সমানভাবে ও অব্যাহতরূপে চলিয়া আসিতেছে। যে জলাময় স্থান এক সময়ে নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ ও বন্যপশুর আবাসস্থল ছিল, তাহাই বর্তমানে বহু রাজপথসঙ্কুল সুন্দর 'স্থানে' পরিণত হইল। পুরাতন কেল্লা পরিত্যক্ত হইল, এবং তাহার স্থানে 'কাস্টম হাউস' ও অন্যান্য সরকারী অট্টালিকা নির্মিত হইল। ক্লাইভের অভিপ্রায়মত বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মিত হইল। ইংরেজরা প্রথমে বর্তমান ডালহাউসি স্কোয়ার হইতে টাঁকশাল পর্যন্ত নগরের এই মধ্য অংশে বাস করিতেন, তাঁহারা এক্ষণে তথা হইতে ক্রমে ক্রমে উঠিয়া চৌরঙ্গি ও তন্নিকটবর্তী স্থানে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন, এবং দেশীয় অধিবাসীরা গোবিন্দপুর ও তৎসন্নিহিত গ্রামসমূহ (যেস্থানে বর্তমান দুর্গ নির্মিত হইয়াছে) হইতে নগরের উত্তরাংশে উঠিয়া গেলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

কলিকাতার ভুবৃত্তান্ত ও অধিবাসী

পূর্বে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, প্রথম প্রথম যে সকল মহাপুরুষ এদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহারা যে নগরের মিউনিসিপাল ব্যাপারে কেবল নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে যত্ন প্রকাশ করিতেন তাহা নহে, প্রত্যুত তাঁহারাই ইহার সর্বময় কর্তা ছিলেন। যে প্রজাদের স্বার্থ এই মিউনিসিপ্যাল ব্যাপারের সহিত বিশেষভাবে বিজড়িত, সেই প্রজাদিগের এ বিষয়ে কোনও হাতই ছিল না। পরন্তু ইংরেজের ন্যায় জ্ঞানলোকপ্রাপ্ত ও উদারহৃদয় রাজার পক্ষে চিরদিন প্রকৃতিবর্গকে তাহাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট নগরের পৌর-শাসনকার্যের তত্ত্বাবধানরূপ ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা কখনই সম্ভবপর নয়। সেইজন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, মিউনিসিপাল-শাসন মেয়র ও অলডারম্যানদিগের হস্ত হইতে ক্রমে ক্রমে 'জাস্টিস অব্ দি পীস্' আখ্যাধারী ব্যক্তিগণের হস্তে চলিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু এই শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের প্রধান কার্য ছিল,—রাস্তাগুলি মেরামত করা ও পরিষ্কার রাখা। এক্ষণে ইহা অবশ্য সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, কলিকাতার দ্রুত ক্রমোন্নতির সহিত নগরের মিউনিসিপালকার্যও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অথচ জাস্টিসদিগের হস্তে যে সামান্য ক্ষমতা ও কার্যভার অর্পিত হইয়াছিল, তাহাতে কাজের বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। অবশেষে গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগকে মিউনিসিপাল শাসন-ব্যাপারে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ প্রদান করিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বাঙ্গালার লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর সার রিচার্ড টেম্পলের শাসনকালে প্রজাদিগকে আংশিক স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতা প্রদত্ত হইল ; তদবধি গবর্ণমেণ্ট কেবল মিউনিসি-পালিটির কার্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। অতঃপর স্বায়ত্তশাসনবিষয়ক রাজবিধি সময়ে সময়ে সংশোধিত হইয়াছে, এবং সে পক্ষে যেমন মিউনিসিপালিটির হস্ত হইতে পুলিসের ভার তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, অপর পক্ষে তেমনই অন্যান্য ক্ষমতা ও কার্যভার অর্পিত হইয়াছে। লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর সার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জির সময়ে উক্ত রাজবিধির সংশোধনার্থ একটি পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত হইয়াছিল ; তাঁহার উত্তরাধিকারী সার জন্ উডবার্ণের শাসন গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইয়া আইনরূপে পরিণত হইয়াছে। আইনটি বিধিবদ্ধ হওয়ায় ভারতীয় জনসাধারণ নিতান্ত মর্মাহত হইয়াছে, কারণ তাহাদের বিশ্বাস এই যে, উহা দ্বারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার

মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। তাহাদের প্রতিবাদ, আবেদন প্রভৃতি সমস্তই অরণ্যে রোদন হইয়াছে।

জব চার্ণক সাহেব ১৬৯০ অব্দে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া সকল জাতিকেই কোম্পানির জমিদারিতে, অর্থাৎ সূতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর—এই তিনখানি গ্রামে বসবাস করিবার জন্য আহ্বান করেন। এই নূতন স্থানে আসিয়া বাস করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য তাহাদিগকে করাদি অনেক বিষয় হইতে অব্যাহতি ও নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে চাহেন। অতঃপর পর্তুগীজ, আর্মানী, গ্রীক, ইহুদী, হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য জাতীয় লোক ক্রমে ক্রমে আসিতে লাগিল। এম. জে. শেঠ প্রণীত ভারতীয় আর্মানীদিগের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, জব চার্ণক সাহেবের ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা স্থাপনের পূর্বেও আর্মানীরা সূতানুটি গ্রামে একটি ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। আর্মানীরা কোন্ সময়ে প্রথম কলিকাতায় আগমন করেন, শেঠ সাহেব তাহার নির্দেশ করেন নাই, কিন্তু তিনি সম্প্রতি একটি ক্ষোদিত লিপির আবিষ্কার করিয়াছেন; ঐ লিপিটি কলিকাতাস্থ আর্মানীদিগের গোরস্থানে সমাহিত একটি আর্মানী-মহিলার কবরের উপরিস্থ সমাধিপ্রস্তরে ক্ষোদিত; উহার ভাষা আর্মানী এবং উহার তারিখ ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই। শেঠ সাহেব আপনার পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন যে, চার্ণক এই মৃত্তিকায় পদার্পণ করিবার বহু পূর্বে আর্মানীরা এখানে বাণিজ্য করিতেন এবং সে সময়ে সূতানুটি পণ্যদ্রব্যের একটি প্রধান বাজার বলিয়াবিখ্যাত ছিল। উক্ত লেখক আরও বলেন যে, চার্ণক সাহেবের আমন্ত্রণানুসারে পর্তুগীজ এবং আর্মানীরা চুঁচূড়া হইতে আগমন করেন। আর্মানীরা এই স্থানে বসবাস করিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ১৬৮৮ অব্দের সনন্দ দ্বারা প্রদত্ত অধিকারসমূহ উপভোগ করিতে থাকেন। স্টার্ক সাহেব বলেন: "অনেকে তাঁহার আমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছিলেন এবং উপনিবেশের উত্তর প্রান্তে সমবেত হইয়াছিলেন। আর্মানী ঘাট ও আর্মানী স্ট্রীট—এই নাম দুইটি অদ্যাপি এই ব্যাপারের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এইস্থানে থাকিয়া তাঁহারা ইংরেজদিগের যারপরনাই উপকার করিয়াছিলেন; তাহাদিগকে মধ্যবর্তী করিয়া তবে ইংরেজেরা দেশীয় বাজারের লোকের সহিত ক্রয়-বিক্রয় করিতে সমর্থ হইতেন। তাঁহারা ইংরেজ নাগরিকের তাবৎ অধিকার উপভোগ করিতেন, এবং তাহাদের মধ্যে ধনাঢ্য ও প্রভাবসম্পন্ন হইয়া মর্যাদাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন।"

এই উৎসাহশীল উদ্যোগী জাতি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। মোগল-রাজসভার ঐশ্বর্যাড়ম্বরদর্শনে প্রলুব্ধ হইয়া এ দেশের ঐশ্বর্যের অংশভাগী হইবার আশায় কতকগুলি নবানুরাগসম্পন্ন আর্মানী স্বদেশ হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। যৎকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তৎকালে আর্মানীদিগের বাণিজ্য খুব বিস্তৃত

ভাবে চলিতেছিল। ইংরেজরা ১৬১২ অব্দের জানুয়ারী মাসে সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট সনন্দ প্রাপ্ত হইলে আর্মানীরা তাঁহাদের পরম সুহৃদ ও সহায় হইলেন। পাদরি লঙ্ সাহেব আর্মানীদিগের সম্বন্ধ এইরূপ লিখিয়াছেন: "আর্মানীদিগের মধ্যে কেহ কেহ পারস্য উপসাগর দিয়া ভারতবর্ষে আসিলেন; আবার কেহ কেহ খোরাসান, কান্দাহার ও কাবুল হইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। বৈদেশিক-দিগের মধ্যে তাঁহারাই প্রথম বসতি স্থাপন করেন, এবং ক্রমে ক্রমে গুজরাট ও সুরাট হইতে বারাণসী ও বিহারে আগমন করেন। ১৬২৫ অব্দে ওলন্দাজেরা চুঁচূড়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিলে পর, আর্মানীরা তথায় বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। পরে ১৬৯০ অব্দে কলিকাতা স্থাপিত হইলে এবং গভর্ণর চার্ণক তথায় বাস করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলে, আর্মানীরা পর্তুগীজদিগের ন্যায় সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং ক্রমে ক্রমে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠেন; সেইজন্যই ১৭৫৭ অব্দে তাঁহারা ক্ষতিপূরণস্বরূপ সাত লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। তাঁহারাই মধ্য এশিয়ায় বাণিজ্যের পথপ্রদর্শক; উক্ত বাণিজ্যের এখনও অনেক বাকি—ভবিষ্যতে উহার বিস্তর আশা ভরসা আছে।"

গ্রীকজাতি ১৭৫০ অব্দে তৎসমকালে কলিকাতায় আগমন করেন।

ভারতবর্ষে পর্তুগীজ জাতির অবস্থা কিরূপ ছিল, এক্ষণে তাহাই দেখা যাক। হ্যামিল্টন সাহেব বলেন, এক সময়ে পর্তুগীজদিগের ভাষা এরূপ প্রভাবসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল যে, ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই পরস্পরের সহিত সাধারণভাবে কথোপকথনের ক্ষমতা লাভ করিবার নিমিত্ত পর্তুগীজ ভাষা শিক্ষা করিতেন। উহা তৎকালে ভারতবর্ষের lingua franca * হইয়া উঠিয়াছিল। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে পর্তুগীজেরাই সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করে এবং তাহাতে কৃতকার্য হয়। কলম্বস ভারতবর্ষে আসিবার অভিপ্রায়েই পর্তুগীজ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ভারতের পরিবর্তে আমেরিকায় যাইয়া উপস্থিত হন। তাহার পাঁচ বৎসর পরে, ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে, ভাস্কো-ডা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া কালিকটে আগমন করেন। কিন্তু তাঁহার পূর্বে আর একজন পর্তুগীজ কালিকটে আসিয়াছিলেন। তাঁহার নাম কভিলহাম। তিনি ১৪৮৭ অব্দে স্থলপথে আসিয়াছিলেন। আরবেরা নবাগতের প্রতি অত্যন্ত শত্রুতা প্রকাশ করিতে লাগিল। দিল্লীর সিংহাসনে তৎকালে লোদীবংশীয় একজন পাঠান সম্রাট প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বাঙ্গালার শাসনকর্তাও পাঠানজাতীয় ছিলেন। দক্ষিণ ভারতবর্ষ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। দক্ষিণাঞ্চলে বিজয়-নগরের হিন্দুরাজাই সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ভূপতি ছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের একপ্রকার মণ্ডলেশ্বর ছিলেন এবং তাঁহার ক্ষমতা তৎকালে দিল্লীশ্বরের ক্ষমতা অপেক্ষাও অধিক ছিল।

---

* যে মিশ্র ভাষায় ইউরোপীয়েরা প্রাচ্য জগতে কথোপকথন করে।

ভাস্কো-ডা-গামা মালাবার উপকূলে কয়েক মাস থাকিয়া জামোরিন উপাধিধারী কালিকটরাজের নিকট হইতে এক পত্র লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত হইলেন, এবং কলম্বসের ন্যায় তিনিও মহাসমাদরে ও আড়ম্বরে অভ্যর্থিত হইলেন। পর্তুগীজবাসীরা অদম্য উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। পর্তুগীজেরা তৎকালে কেবল সামান্য বণিক্ ছিল না; ধন বা খ্যাতি অর্জনের নিমিত্ত অথবা বাহাদুরি দেখাইবার জন্য বিদেশভ্রমণ তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না, পরন্তু তাহারা পৌত্তলিকদিগকে খ্রীষ্টান করিয়া চতুর্দিকে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের পবিত্র ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিল। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাব্রাল নামক এক ব্যক্তির অধ্যক্ষতাধীনে কয়েকখানি জাহাজ লোকজন সহিত প্রেরিত হইল। ইহাদের উপর আদেশ ছিল যে, ইহারা প্রথমে উপদেশ প্রদান দ্বারা ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহাতে যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তরবারি প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। ইতিমধ্যে পর্তুগালের রাজা ১৫০২ অব্দে পোপের নিকট হইতে যে সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন, তদ্বারা পোপ তাঁহাকে সমুদ্রে নৌচালন, দিগ্বিজয় এবং ইথিওপিয়া, আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষের বাণিজ্যের সর্বময় প্রভুপদে বরণ করিলেন। এদিকে ক্যাব্রাল নানাপ্রকার ভাগ্যবিপর্যয়ের পর কালিকট ও কোচিনে কুঠি স্থাপন করলেন। ১৫০২ অব্দে ভাস্কো-ডা-গামা কয়েকখানি জাহাজ লইয়া পুনর্বার প্রাচ্য ভূখণ্ডে আগমন করেন, এবং যে সকল রাজ্য ও জাতি প্রথমবারে তাঁহার প্রতি সৌহৃদ্য ও অনুকূলভাব প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির সহিত তিনি যুদ্ধ করেন। অবশেষে ১৫০৫ অব্দে নৌসেনাধ্যক্ষ ফ্রান্সিস্কো-ডি-আলডামা অনেকগুলি রণপোত ও বহুসংখ্যক সৈন্যসহ প্রেরিত হন। তিনিই ভারতে প্রথম পর্তুগীজ গভর্ণর ও রাজপ্রতিনিধি বলিয়া পরিচিত।

তাঁহার পর সুপ্রসিদ্ধ আলবুকার্ক ১৫০৯ অব্দে পর্তুগীজদিগের গভর্ণর হন। এই ব্যক্তি প্রকৃত খ্রীষ্টানের ন্যায় দেশীয়দিগের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ ও সদয় ব্যবহার করিয়া তাহাদের এতদূর বিশ্বাস ও অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন যে, তাহারা মুসলমানদিগের অপেক্ষা পর্তুগীজদিগের শাসনাধীনে বাস করা শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিতে লাগিল। পাদরি লঙ্ সাহেব বলেন, ১৫০০ অব্দে পর্তুগীজেরা গৌড়েশ্বরের অধীনে বেতনভোগী বৈদেশিকরূপে বঙ্গদেশে প্রথম উপস্থিত হয়, এবং তৎপরে দেশীয় রাজন্যবর্গের একপ্রকার শরীর-রক্ষী সৈন্যরূপে কার্য করিতে থাকে। কিন্তু চিরদিন কাহারও সমান যায় না। স্পেনীয়েরা ক্রমে মাথা তুলিয়া উঠায় পর্তুগীজদিগের পতনের সূত্রপাত হইল। ১৫৩০ অব্দে স্পেনপতি দ্বিতীয় ফিলিপ পর্তুগালের রাজমুকুট প্রাপ্ত হইলেন, এবং তদবধি পর্তুগালের স্বার্থ স্পেনের স্বার্থের অধীন হইয়া পড়িল। ইতোমধ্যে ওলন্দাজ ও ইংরেজজাতি প্রাচ্য ভূখণ্ডে আসিয়া দর্শন দিলেন। অতঃপর ১৬৪০ অব্দে পর্তুগাল স্পেন হইতে বিচ্ছিন্ন হইল বটে, কিন্তু উহা আর পূর্বের ন্যায় মাথা তুলিতে পারে নাই।

সার উইলিয়ম হাণ্টার বলেন, ১৫০০ হইতে ১৬০০ অব্দ পর্যন্ত ঠিক এক শতাব্দকাল পর্তুগীজেরা প্রাচ্য বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার উপভোগ করিয়াছিল। জাপান ও স্পাইন দ্বীপপুঞ্জ হইতে লোহিতসাগর ও উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত তাহারাই প্রাচ্য ধনরত্নের একমাত্র স্বামী ও বিধাতা ছিল; ওদিকে আবার আফ্রিকায় আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলস্থ ও ব্রাজিল দেশস্থ অধিকারগুলি তাহাদের সামুদ্রিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহাদের অধঃপতনের কারণ সম্বন্ধে সার উইলিয়াস হাণ্টার এইরূপ লিখিয়াছেন:

"পরন্তু এরূপ সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে হইলে যাদৃশ রাজনৈতিক শক্তি ও ব্যক্তিগত চরিত্রবল থাকা আবশ্যক, পর্তুগীজদিগের তাহার কিছুই ছিল না। স্বদেশে মুরদিগের সহিত সংগ্রামে তাহাদের জাতীয় চরিত্র গঠিত হইয়াছিল। তাহারা প্রকৃতপক্ষে পণ্যজীবী বণিক্ ছিল না, তাহারা অবমানাদ্বেষী ও ধর্মযোদ্ধা ছিল এবং অন্য ধর্মাবলম্বীমাত্রকেই পর্তুগাল ও খ্রীষ্টের শত্রু জ্ঞান করিত। তাহাদের পূর্বে ভারতীয় ইতিহাস কিরূপ ঘোর ভ্রমান্ধতাপূর্ণ কুসংস্কার ও নিষ্ঠুরতায় কলঙ্কিত, তাহা যাঁহারা তাহাদের তৎকালীন দিগ্বিজয়ের বিবরণ পাঠ না করিয়াছেন, তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।···পর্তুগীজেরা কোনও কালেই কোম্পানি স্থাপনের চেষ্টা করে নাই, তাহারা তাহাদের প্রাচ্য বাণিজ্য, রাজকীয় অবদান ও একচেটিয়া অধিকারস্বরূপ রক্ষা করিত।" ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিম উপকূলস্থ গোয়া, দমন ও দিউ—কেবল এই তিনটি স্থানই এক্ষণে পর্তুগীজদিগের অধিকারে আছে। আর পর্তুগীজ জাতি হইতে উৎপন্ন ফিরিঙ্গি নামক সঙ্কর জাতি ক্যানিং স্ট্রীট বা মুরগীহাটা ও চিনাবাজার অঞ্চলেই বাস করে। ইহাদের অধঃপতনের কথা ভাবিলে মন বিষাদসাগরে নিমগ্ন হয়। ইংরেজরা কলিকাতায় বসতি স্থাপন করিলে ইহারা কেরানীর কাজ করিত, কিন্তু ইহারা আপনাদের কর্তব্যকর্ম এমন জঘন্যভাবে সম্পাদন করিত যে, ডিরেক্টর সভা তাহাব যথেষ্ট নিন্দা করিতে বাধ্য হন। ইহারা খানসামা ও গোলাম রূপে নিযুক্ত হইত। ইহাদের মধ্যে অনেকে দস্যুতা ও বোম্বেটেগিরি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল। সেই অধঃপতনের দিনে উহারা ভবঘুরে ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং শান্তিপ্রিয় নিরীহ লোকদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইয়া অন্য দেশে বিক্রয় করিত। উহাদের স্ত্রীলোকেরা এক্ষণে সুসভ্য ইংরেজ মহিলাদিগের আয়া হইয়া তাঁহাদের সেবা করিতেছে। লোকে বলে যে, Janala (জানালা), Caste (জাতি), Compound (অঙ্গন) প্রভৃতি কথাগুলি পর্তুগীজ ভাষা হইতে উৎপন্ন অথবা তাহাদের দ্বারা প্রবর্তিত।

বাবু রামকমল সেনের মতে, ইংরেজরা ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে বা তৎসমকালে বাঙ্গালায় প্রথম আগমন করেন। তাঁহারা তাঁহাদের প্রথম বসতিস্থান গোবিন্দপুর ও সুতানুটীতে উপস্থিত হইলে দেশীয় লোকেরা তাঁহাদের কথা বুঝিতে পারিত না বলিয়া তাঁহাদের নিকট যাইতে সাহস পাইত না। কাজকর্ম

অনেকটা অঙ্গভঙ্গিতে ও সঙ্কেত ইসারায় সম্পন্ন হইত। বসাক বা শেঠেরা সে সময়ে বড় বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন; তাঁহারা নানাপ্রকার খুচরা কাপড়-চোপড়ের কারবার করিতেন। ইংরেজরা তাঁহাদিগকে একজন দু-বাস (অর্থাৎ দোভাষী) পাঠাইয়া দিতে বলেন, কারণ এই শ্রেণীর লোক দ্বারা মান্দ্রাজে বেশ কাজ চলিয়াছিল। বসাকেরা ইংরেজদিগের কথার প্রকৃত মর্ম বুঝিতে না পারিয়া মনে করিলেন, ইংরেজরা বুঝি কাপড় কাচাইবার জন্য ধোপা চাহিতেছেন; তদনুসারে তাহারা কয়েকজন রজককে পাঠাইয়া দিলেন। ঐ সকল ধোপা সর্বদা ইংরেজদিগের নিকটে থাকিয়া এবং তাঁহাদের কথা শুনিয়া তাঁহাদের ভাষা কতক কতক বুঝিতে লাগিল। কথিত আছে যে, এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে ধোপারাই প্রথমে কিছু কিছু ইংরেজী শিখিয়াছিল। রতন সরকার নামক একজন এদেশীয় ধোপাকে ইংরেজরা প্রথম দোভাষী নিযুক্ত করেন।

জব চার্ণক নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোক আনাইয়া বাস করাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি কিছুদিন বাঁচিয়া উহা কেমন জাঁকিয়া উঠে, তাহা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, কারণ তিনি তাহার অল্প দিন পরেই, ১৬১২ অব্দের জানুয়ারি মাসে, মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি যে স্থানে সমাহিত হইয়াছিলেন, তাহার উপর একটি সুন্দর সমাধিস্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে। ঐ সমাধিস্তম্ভটি অদ্যাপি পূর্বতন কালেক্টরী কাছারির ঠিক সম্মুখস্থ পুরাতন সেন্ট জন্‌স্ ক্যাথিড্রাল নামক গির্জার প্রাঙ্গণে বিদ্যমান আছে। পরন্তু ইহা কলিকাতাবাসীদিগের পক্ষে বড়ই নিন্দার কথা যে, ঐ সমাধিস্তম্ভ ব্যতীত এই মহানগরীর স্থাপয়িতার আর কোনওরূপ স্মৃতিচিহ্ন নাই। স্টার্ণডেল্স সাহেব বলেন, আমাদের ছোট-বড় সকল রকম রাস্তাতে অপেক্ষাকৃত অনেক স্বল্পপ্রসিদ্ধ লোকের নামও অদ্যাপি সংযুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু এমন একটিও রাস্তা, প্রমোদোদ্যান বা স্মৃতিস্তম্ভ নাই, যাহাতে বঙ্গদেশে বৃটিশশক্তিপ্রবেশের পথপ্রদর্শক ও কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা সেই জব চার্ণকের নাম অঙ্কিত।

জে. রেইনি সাহেব বলেন—"ব্রুস সাহেবের মতে চার্ণক সকলেরই সবিশেষ সম্মানাস্পদ থাকিয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন; আবার আর্মি বলেন যে, 'তাঁহার সামরিক অভিজ্ঞতা কিছুমাত্র ছিল না বটে, কিন্তু সাহস যথেষ্ট ছিল, এবং নবাব এক সময়ে তাঁহাকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিলেন ও কশাঘাত করিয়াছিলেন বলিয়া যে গবর্ণমেণ্টের হাতে তিনি নিজে এইরূপ লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইয়াছিলেন, সে গবর্ণমেণ্টকে উপযুক্ত প্রতিফল দিবার জন্য সর্বদা অধৈর্য প্রকাশ করিতেন।' এবং যে সার জন গোল্ডস্‌বরো ১৭৯৪ অব্দে কমিসারি জেনারেল হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি চার্ণককে অব্যবস্থিতচিত্ত ও শ্রমকাতর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।"

চার্ণক সাহেবের জীবনের একটি ঘটনা কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা

আবশ্যক বোধ হইতেছে। ১৬৭৮ সালে একদা চার্ণক সাহেব হুগলি নগরে নদীর ধারে বেড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, একটি পরমাসুন্দরী হিন্দু বিধবা মহাড়ম্বরে বেশভূষা পরিধান করিয়া তাহার বৃদ্ধ পতির চিতায় অনুমৃতা হইবার জন্য শ্মশানাভিমুখে যাইতেছে, কিন্তু বোধ হইল যেন সে নিজে আত্মবিসর্জন করিতে ইচ্ছুক নয়। কোমলহৃদয় চার্ণক তাহার সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইলেন, এবং কয়েকজনের সাহায্যে তাহাকে উদ্ধার করিয়া নিজ বাটিতে লইয়া গেলেন। অতঃপর যুবতী তাঁহার পত্নী হইল। তাহার গর্ভে সাহেবের কয়েকটি সন্তানও জন্মিয়াছিল। স্ত্রীলোকটি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাহার মৃতদেহ সেণ্ট জনস্ গির্জার প্রাঙ্গণে সাহেবের পারিবারিক সমাধিস্থানেই গোর দেওয়া হইয়াছিল। কাপ্তেন হ্যামিণ্টন বলেন, তাহার স্বামী প্রতি বৎসর তাহার মৃত্যুর দিবসে ঐ স্থানে একটি করিয়া মুরগী জবাই করিতেন।' *

১৭৪২ হইতে ১৭৫২ অব্দ পর্যন্ত এই কয়েক বৎসরে নগরে দেশীয়দিগের বাড়ীর সংখ্যা অতি দ্রুতগতিতে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। বাড়ীগুলি কাঁচা-পাকা দুই প্রকারেরই ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই কাঁচা, এবং সেগুলি ইউরোপীয় শহরের বহির্ভাগে অথচ মারহাট্টা-খাতের অন্তর্ভাগে নির্মিত হইয়াছিল। ইহাই ঐ কয়েক বৎসরের নগরের প্রধান উন্নতি। ১৭৫৬ অব্দের ম্যাপে তাহা অপেক্ষা অধিক উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকগুলি জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়াছে; পেরিন্স্ পয়েণ্ট হইতে লাল বাজার রোড পর্যন্ত সমস্ত শহরে ইষ্টকালয়ের চিহ্ন অঙ্কিত, এবং ১৭৪২ অব্দের মানচিত্রে যেস্থান জঙ্গলময় ছিল, সেখানে এখন লোকালয়ের চিহ্ন অঙ্কিত। আরও দেখা যায় যে, পুষ্পোদ্যান ও ফলোদ্যান নির্মাণের উপযুক্ত জমিসকল চিহ্নিত এবং জঙ্গল বহুপরিমাণে বিলুপ্ত হইয়াছে। আবার ১৭৪২ অব্দের মানচিত্রে কেবল ১৬টি বড় বড় রাস্তা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ১৭৫৬ অব্দের মানচিত্র অন্যূন ২৭টি বড় বড় রাস্তা এবং ৫২টি অপেক্ষাকৃত ছোট রাস্তা স্পষ্টরূপে চিহ্নিত হইয়াছে। পরন্তু সর্বপ্রধান উন্নতি হইয়াছে পাকা বাড়ীতে। মোটামুটি গণনায় দেখিতে পাওয়া যায়, যেস্থলে কেবল ২১টি ইষ্টকালয় ছিল (তাহাদের মধ্যে ৫টি মাত্র একটু বড় রকমের), সেস্থলে ১৭৫৬ সালের ম্যাপে অন্যূন ২৬৮টি পাকা বাড়ী দেখান হইয়াছে। কুটীরগুলিও দেখান হইয়াছে বটে, কিন্তু সেগুলি সম্বন্ধে তেমন যত্ন বা সাবধানতা অবলম্বিত হয় নাই, এবং অনেকগুলি পরিত্যক্তও হইয়াছে।

মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরও ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে ও অন্যান্য জাতীয় লোকদিগকে কলিকাতায় বাস করাইবার জন্য বিলক্ষণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সকল লোককে জমি দিতেন, বাড়ী করিয়া দিতেন, এবং অন্যান্য অনেক প্রকারে তাহাদের সাহায্য করিতেন। সুদূর উড়িষ্যা হইতে আগত ব্রাহ্মণগণকে

---

* এই প্রথা বিহারের ইতরজাতীয় হিন্দুদের মধ্যে অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

তিনি কলিকাতার সমাজে পাচকরূপে চালাইয়াছিলেন। সে কালে উড়িয়া ব্রাহ্মণের পাক খাওয়া সামাজিক হিসাবে বড় বিপদের কথা ছিল। এখনও এমন অনেক হিন্দু পরিবার আছেন, যাঁহারা উড়িয়া ব্রাহ্মণের হাতে খান না। উক্ত মহারাজের ন্যায় তাঁহার বংশধরেরাও উড়িয়াদিগের প্রতি অদ্যাপি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন—তাহাদের অনেককে আপনাদের বাড়ীতে বিনা ভাড়ায় থাকিতে দেন। জনৈক লেখক উড়িষ্যা বেহারাদের বিষয় বর্ণনা করিতে করিতে বলিয়াছেন, উহারা অতি প্রাচীনকাল হইতে কলিকাতায় আছে, কারণ সেকালে পাল্কীই প্রধান যান ছিল। ১৭৭৬ অব্দে যে হিসাব করা হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায় উহারা শিবিকা বহন করিয়া প্রতি বৎসর তিন লক্ষ টাকা স্বদেশে লইয়া যাইত। অধুনা এই অতি প্রয়োজনীয় শ্রমজীবী শ্রেণীর লোকেরা ইউরোপীয় ও দেশীয় ধনবানদিগের গৃহে চাকরের কাজে নিযুক্ত হইয়া থাকে। অন্যান্য বিবিধ কাজে উড়িয়ারা দিনমজুরিও করে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত বিশ্বকোষ নামক বাঙ্গালা অভিধানে বলিয়াছেন, মহারাজ নবকৃষ্ণের সময়ে * কলিকাতায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাঁতি, কলু ও অন্যান্য জাতির সর্বশুদ্ধ ৩,০০০ ঘর লোকের বাস ছিল।

আমরা এক্ষণে কলিকাতায় বিভিন্ন অংশের উৎপত্তি ও নামকরণ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিবার চেষ্টা করিব। জনৈক লেখক বলেন, "সার্কুলার রোডে প্রফুল্লচিত্ত যুবকগণ স্বাস্থ্য-রথে আরোহণ করিয়া আরামদায়ক সুগন্ধি প্রভাত-সমীরণ সেবন কবিত।" জনৈক মুসলমানের নাম হইতে 'আলিপুর' নামটি উৎপন্ন। আলিপুর সেতুর নিকট 'বিনাশতরু' নামে অভিহিত দুইটি গাছ ছিল। ঐ বৃক্ষতলে হেস্টিংস ও ফ্রান্সিস্ দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরস্পরের প্রতি পিস্তল ছুঁড়িয়াছিলেন। সার ইলাইজা ইম্পের পার্ক † (প্রমোদ-কানন) হইতে পার্ক স্ট্রীট নামের উদ্ভব। অপজন সাহেবের ১৭৯৪ সালের কলিকাতার মানচিত্রে উহা বেরিয়েল গ্রাউণ্ড রোড (গোরস্থানের রাস্তা নামে পরিচিত ছিল। হলওয়েল সাহেব ১৭৫৪ অব্দে বলিয়াছিলেন যে, চৌরঙ্গী রোড কালীঘাট ও ডিহি কলিকাতায় যাইবার রাস্তা; সে সময়ে ঐ স্থানে একটি বাজার বসিত। ১৭৯৪

---

* মহারাজা নবকৃষ্ণ লর্ড ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে জীবিত ছিলেন।

† সার ইলাইজা ইম্পের প্রমোদ-কানন পশ্চিমে চৌরঙ্গী রোড হইতে উত্তরে পার্ক স্ট্রীট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং যে-স্থান এক্ষণে মিডলটন স্ট্রীট নামে খ্যাত, ঐ স্থানের উপরিস্থ দুই সারি গাছের মধ্য দিয়া তাঁহার বাড়ী হইতে পার্ক স্ট্রীট পর্যন্ত একটি পথ ছিল; উহার চতুর্দিকে সুন্দর প্রাচীর এবং সম্মুখে একটি পুষ্করিণী ছিল; একদল সিপাহী প্রহরী বাড়ী ও বাগানের চতুর্দিকে রাত্রিকালে ঘুরিয়া পাহারা দিত এবং সময়ে বন্দুক ছুঁড়িয়া ডাকাতদিগকে ভয় দেখাইত।

সালে, উত্তরে ধর্মতলা হইতে দক্ষিণে বৃজিতলা এবং পশ্চিমে সার্কুলার রোড হইতে পূর্বে ময়দান পর্যন্ত এই চতুঃসীমার মধ্যে চৌরঙ্গীতে ২৪টি বাড়ী দেখাইয়াছেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে তিনি চৌরঙ্গীতে অতি অল্পসংখ্যক বাড়ীই দেখিয়াছিলেন; তৎকালে কোম্পানির অধিকারের এক-তৃতীয়াংশ জঙ্গলাকীর্ণ ও বন্য পশুর বাসস্থান ছিল।

ধর্মতলার যেস্থানে এক্ষণে কুক কোম্পানির আস্তাবল (অশ্বশালা) অবস্থিত, ঐ স্থানে পূর্বে একটি বৃহৎ মসজিদ ছিল। মসজিদের জমি ও তৎসন্নিহিত সমস্ত ভূমি ওয়ারেন হেস্টিংসের জমাদার জাফের নামক এক ভক্ত মুসলমানের সম্পত্তি ছিল। ঐ মসজিদ এক্ষণে নাই, কিন্তু পূর্বে উহা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। যে কারবালা উৎসব উপলক্ষে সহস্র সহস্র মুসলমান মিলিত হইয়া এক্ষণে সার্কুলার রোডে সমবেত হয়, পূর্বে তাহা ঐ মসজিদের নিকটস্থ ভূমিতে সমবেত হইত; সুতরাং স্থানটি অতি পবিত্রস্বরূপে বিবেচিত হইত। এইজন্যই এ স্থানের নাম ধর্মতলা হয় এবং উহার নামানুসারে সমস্ত রাস্তাটি ধর্মতলা স্ট্রীট নামে খ্যাত হয়।

গার্ডেনরীচ একটি প্রাচীন স্থান। জেনারেল মার্টিন বলিয়াছেন, ১৭৬০ সালে তথায় ১৫টি বাড়ী ছিল। সার উইলিয়াম জোন্স ঐ স্থানে একটি বাঙ্গলোয় থাকিতেন। খিদিরপুরকে ইংরেজীতে 'কিডারপুর' বলে। কর্ণেল কিড নামক একজন সাহেবের নাম হইতে ঐ নামের উৎপত্তি।

হলওয়েল সাহেবের সময়ে লালবাজার একটি প্রসিদ্ধ বাজার বলিয়া পরিচিত ছিল। বিবি কিণ্ডার্সলি বলেন, ১৭৬৮ সালে লালবাজার স্ট্রীট কলিকাতার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট রাস্তা ছিল। তৎকালে উহা কাস্টম হাউস হইতে বৈঠকখানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

১৭৫৭ সালের পূর্বে শোভাবাজার ও পাথুরিয়াঘাটা জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল। মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর, ঠাকুরগণ ও অন্যান্য প্রাচীন বংশ ঐ সকল স্থান বাসযোগ্য করেন। রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট নামক রাস্তাটি তিনি নিজ ব্যয়ে নির্মাণ করাইয়া গবর্ণমেণ্টকে অর্পণ করেন। তিনি বেহালা হইতে কুলপি পর্যন্ত ৩২ মাইল দীর্ঘ আর একটি রাস্তাও নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

টিরেটা নামক একজন ফরাসী রাস্তা ও অট্টালিকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে 'টিরেটাবাজার' নাম হইয়াছে। তিনি ১৭৮৮ সালে বাজার বসান; তৎকালে মাসিক আয় ৩৮০০৲ টাকা ছিল, এবং উহার মূল্য দুই লক্ষ টাকা নির্ধারিত হইয়াছিল। টিরেটা সাহেব দেউলিয়া হওয়ায়, তাঁহার বিষয়সম্পত্তি সমস্তই লটারিতে বিক্রীত হইয়া যায়।

মিশন রো নামক রাস্তাটির পূর্ব নাম রোপওয়াক্; পরে মিশন চার্চ নামক গির্জার নামানুসারে ঐরূপ নামকরণ হয়। ১৭৫৭ সালের কলিকাতা অবরোধকালে ঐ স্থানে একটি তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই সময়ে নবাবের সৈন্যেরা গির্জাটি

ভাঙ্গিয়া ফেলে; পরে ১৭৬৭ অব্দে উহা পুনর্নির্মিত হয়। প্রথম প্রোটেস্টাণ্ট মিশনারি (ধর্মপ্রচারক) কির্ণাণ্ডার ঐ গির্জা নির্মাণ করিয়াছিলেন।

ওল্ড কোর্ট হাউস (প্রাচীন সভাগৃহ) বা টাউন হলের নামানুসারে ওল্ড-কোর্ট হাউস স্ট্রীটের নামকরণ হইয়াছে। ঐ গৃহটি ১৭২৫-২৭ এই কালমধ্যে কোনও সময়ে বুর্শিয়ার নামক জনৈক বণিক কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। উক্ত ব্যক্তি লাটসাহেবের পরে ১৭৩৪ অব্দে বোম্বাইয়ের গভর্ণর নিযুক্ত হন; গৃহটি প্রথমে একতল ও চ্যারিটি স্কুলের (দাতব্য বিদ্যালয়ের) সম্পত্তি ছিল। আবার কেহ কেহ বলেন, ১৭৬৭ অব্দে বা তৎসমকালে বুর্শিয়ার সাহেব সাধারণের প্রদত্ত চাঁদার সাহায্যে এই কোর্ট হাউস নির্মাণ করেন; উহার উপরের অংশও চাঁদার টাকায় নির্মিত হয়। স্টাভোরিনস্ সাহেব ১৭৭০ সালে লিখিয়াছেন: কোর্ট হাউসের উপরে দুইটি সুন্দর সভাকক্ষ (দরবারগৃহ) আছে। এই দুইটি প্রকোষ্ঠের একটিতে ফ্রান্সের রাজার এবং পরলোকগতা রাণীর প্রতিমূর্তি সজ্জিত আছে। চিত্রপট দুইটি সজীব মনুষ্যাকারের ন্যায় বৃহদায়তন। ইংরেজেরা যৎকালে চন্দননগর অধিকার করেন, সেই সময়ে ঐ স্থান হইতে চিত্রপট দুইটি আনীত হইয়াছিল।" ১৭৯২ সালে কোর্ট হাউস গবর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রীত হয়, এবং সেই বৎসরেই গবর্ণমেণ্ট উহার জীর্ণ অবস্থা দেখিয়া উহা ভূমিসাৎ করিয়া ফেলেন। অর্মি ১৭৫৬ সালে উহার বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, "গৃহটি একতল হইলেও অতি বিস্তৃতায়তন; উহাতে মেয়রের কাছারি ও দায়রা আদালত বসিত।" গৃহটি কিরূপে প্রাচীন কলিকাতা দাতব্য ভাণ্ডারের সম্পত্তি হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

বাবু রাজচন্দ্র দাস নামক কলিকাতার একজন কোটিপতি কর্তৃক 'বাবুঘাট' নির্মিত হইয়াছিল। একটা নিমগাছ হইতে নিমতলাঘাট স্ট্রীট নাম হইয়াছে। ক্লাইভ স্ট্রীট এক সময়ে বৃহৎ কারবারের স্থান ছিল। যে স্থানে এক্ষণে ওরিএণ্টাল ব্যাঙ্ক অবস্থিত, ঐ স্থানে লর্ড ক্লাইভের বাড়ী ছিল। বাগবাজার (বা বাচবাজার), শ্যামবাজার, হাটখোলা, জানবাজার, বড়তলা—এই স্থানগুলির নামোল্লেখ ১৭৪৯ সালেও দেখিতে পাওয়া যায়। মৎস্যবাজার বা মেচোবাজার বিগত শতাব্দীতে মৎস্য বিক্রয়ের একটা প্রধান স্থান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। বড়বাজার কলিকাতার অতি প্রাচীন ইতিবৃত্তে একটি অতি প্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

লোকে বলে, চিৎপুর রোডের পূর্ববর্তী নগরের যে অংশে দেশীয়দিগের বাস, তাহা আধুনিক। দেবী চিত্তেশ্বরীর নামানুসারে চিৎপুর ও তাহা হইতে চিৎপুর রোড নাম হইয়াছে। চিত্তেশ্বরীর মন্দির অদ্যাপি চিৎপুরে বিদ্যমান আছে। প্রাচীনকালে ঐ স্থানে নরবলি হইত। দেশীয় সকল শ্রেণীর লোকেরই দৃঢ় বিশ্বাস যে, চিত্তেশ্বরী জাগ্রত দেবতা; এজন্য অদ্যাপি অনেকে আপন আপন মনস্কামনাসিদ্ধির নিমিত্ত চিত্তেশ্বরীর নিকট নানাপ্রকার মানসিক করে ও পূজা

দেয়। কলিকাতার মধ্যে এই রাস্তাটিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং কালীঘাট হইতে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত যে রাস্তা বিস্তৃত হইয়াছে, তাহারই এক অংশ।

১৭৪২ অব্দে সিমলা ও মির্জাপুরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইটি স্থান ধানক্ষেত ও পচাপুকুরে আচ্ছন্ন ছিল, এবং তাহা হইতে স্বাস্থ্যের হানিকর বিষম দুর্গন্ধ বাষ্প উত্থিত হইত। সিমলা চোর জুয়াচোর প্রভৃতি দুর্বৃত্তগণের আড্ডা বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এমন কি, ১৮২৬ অব্দ পর্যন্ত সন্ধ্যার পর কোনও ব্যক্তি অর্থলোভেও সিমলার পথ দিয়া চলিতে স্বীকৃত হইত না। এক সময়ে এই স্থানে বহু তাঁতির বাস ছিল, এবং সিমলার কাপড় সুশোভন-পরিচ্ছদপ্রিয় ভদ্রসমাজের সবিশেষ আদায়ের সামগ্রী ছিল। যে স্থানে এক্ষণে কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার ও সারকুলার কেনাল অবস্থিত, তাহা অনেকদিন পযন্ত নরহত্যার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল; ঐ স্থানে অনেক খুন হইয়া গিয়াছে।

যেস্থান বৈঠকখানা স্ট্রীট নামে খ্যাত ছিল, তাহা এক্ষণে বৌবাজার ও বৈঠকখানা স্ট্রীট দ্বারা অধিকৃত। ঐ স্থানে একটি অতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ বৃক্ষ ছিল; যে সকল বণিক্ বাণিজ্যার্থে কলিকাতায় আসিত, তাহারা ঐ বৃক্ষটিকে বৈঠকখানারূপে ব্যবহার করিত, অর্থাৎ ঐ গাছতলায় পণ্য দ্রব্যাদি নামাইয়া বিশ্রামলাভ করিত; তাহা হইতেই স্থানটির ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। মাণিক নামক মুসলমান পীরের নাম হইতে মাণিকতলা নাম হইয়াছে। বিবি কাউণ্টেস্ অব্ লাউডনের নামানুসারে লাউডন স্ট্রীট, জাস্টিস্ রসেল সাহেবের নামানুসারে রাসেল্ স্ট্রীট, এবং পর্তুগীজ বণিক্ জোসেফ ব্যারোটার নামানুসারে ব্যারোটা স্ট্রীট নাম হইয়াছে। হলওয়েল সাহেব ১৭৫২ অব্দে যে বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন, তাহাতে ধোপাপাড়া, বেনেপুকুর, ট্যাংরা প্রভৃতির নামোল্লেখ আছে।

কলিকাতার কোন কোন অংশের নাম স্থানীয় অধিবাসীদিগের বৃত্তিব্যবসায়ে নামানুসারে হইয়াছে; যেমন কুম্ভকার হইতে কুমারটুলি, মদ্যবিক্রেতা শৌণ্ডিক হইতে শুঁড়িপাড়া, কাংস্যকার হইতে কাঁসারিপাড়া, সূত্রধর হইতে ছুতোরপাড়া, জালজীবী হইতে জেলেপাড়া, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল লোক যে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিব্যবসাই পরিচালনা করিত তাহা নহে, প্রত্যুত তাহাদের জাতিও ভিন্ন ভিন্ন ছিল, এবং তাহাদের জাতীয় ও সামাজিক আচারব্যবহার তাহাদের বাসস্থানের চতুর্দিকে পরিস্ফুট হইয়া পড়িত। আজকাল কিন্তু সকল বিষয়ই পর পর এমন দ্রুতগতিতে ঘটিয়া যায় এবং লোকেরা এত অধিক সংখ্যক বিষয়ে ব্যাপৃত থাকে যে, কেহই স্বজাতীয়দিগকে লইয়া সভাসমিতি করিবার কথা ভাবিবার অবসর পায় না। এই জন্যই কোনও পল্লী বা রাস্তার সহিত অধিবাসী-দিগের কোনরূপ সংস্রবই দৃষ্ট হয় না।

শহরের উত্তরাঞ্চলের বাড়ী অতি বিশৃঙ্খলভাবে নির্মিত হইয়াছে; উহাদের নির্মাণে কোনওরূপ শৃঙ্খলা বা পারিপাট্য দৃষ্ট হয় না, কিংবা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয় নাই। ওয়ারেন্ হেস্টিংস

সাহেবই সর্বপ্রথম কার্যতঃ স্থাপত্য-শিল্পের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগের পরিচয় প্রদান করেন। রাজকীয় স্থাপত্যশিল্পী উইলিয়াম হজেস বলেন: "পরন্তু ইহার (কলিকাতার) সৌন্দর্যের ও ঐশ্বর্যাড়ম্বরের নিমিত্ত ইহা একমাত্র ভূতপূর্ব গভর্ণর জেনারেলের উদারতা ও সুরুচির নিকট ঋণী; এবং ইহা অবশ্য স্বীকার করিবে হইতে যে, প্রকৃত স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শনরূপে পরিচিত হইবার যোগ্য। প্রথম সৌধ হেস্টিংস সাহেব কর্তৃক নির্মিত হয়; বস্তুতঃ উক্ত গৃহটি উত্তরকালে নির্মিত অনেক অট্টালিকা অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন হইলেও, উহার রচনাপ্রণালী যে সকলগুলি অপেক্ষা বিশুদ্ধতর, তাহাতে সন্দেহ নাই।" ১৭৮০ অব্দে বিবি কে ওয়ারেন্ হেস্টিংসের বেলভেডিয়ার ভবনের বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন: "ভবনটি একটি নিখুত রত্ন এবং অগাধ অর্থে যতদূর হইতে পারে, সেইরূপ আড়ম্বর-সহকারে উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সজ্জিত। ভবনসংলগ্ন চত্বরে বৃক্ষলতাতৃণাদি যে ভাবে সজ্জিত হইয়াছে, তাহাতে সুরুচির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।" কিছুদিন পরে তিনি 'হেস্টিংস হাউস্' নামে আর একটি ভবন নির্মাণ করিয়াছিলেন। বর্তমান রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জন বাহাদুর সেই ভবনটি সম্প্রতি ক্রয় করিয়া অভ্যাগত করদরাজগণের বাসের নিমিত্ত পরিপাটি করিয়া সাজাইয়াছেন। হেস্টিংস সাহেব তাঁহার প্রিয় জলবিহার স্থল সুখসাগর নামক স্থানে আর একটি ভবনও প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বারাসাতেও একটি পল্লীভবন ছিল,— সেটি গভর্ণর কার্টিয়ারের প্রিয় বাসস্থান; উহা ১৭৬০ অব্দে বা তৎসমকালে নির্মিত হইয়াছিল। দমদমায় লর্ড ক্লাইভেরও একটি বিশ্রামভবন ছিল।

অনেক স্বনামখ্যাত দেশীয় ভদ্রসন্তানও কলিকাতায় ও তৎসন্নিহিত স্থানে বাসভবন নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রায় রাঁয়া মহারাজ রাজবল্লভ বাহাদুর সুতানুটিতে বাস করিতেন। মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র রায় রাঁয়া মহারাজ রাজবল্লভ বাহাদুর সুতানুটিতে বাস করিতেন। মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র রায় রাঁয়া মহারাজ গুরুদাস সুতানুটির মধ্যস্থ চড়কডাঙ্গায় বাড়ী করিয়াছিলেন। গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট সাহেবের বেনিয়ান (মুৎসুদ্দি) ও আন্দুল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান রামচরণ পাথুরিয়াঘাটায় থাকিতেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের জোড়াসাঁকোতে বাড়ী ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের বেনিয়ান কান্তবাবুও জোড়াসাঁকোয় থাকিতেন। হুইলার সাহেবের দেওয়ান দর্পনারায়ণ ঠাকুর পাথরিয়াঘাটায় থাকিতেন। রিচার্ড বারওয়েল সাহেবের পারস্যশিক্ষক মুন্সি সদরুদ্দীন মেছোবাজারে থাকিতেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পূর্বপুরুষ রাজা পীতাম্বর মিত্রও মেছোবাজারে থাকিতেন। রামকৃষ্ণ দত্তের পুত্র মদনমোহন দত্ত সুতানুটির অন্তর্গত নিমতলায় বাস করিতেন। পাটনার কমার্শ্যাল রেসিডেন্টের দেওয়ান বনমালী সরকার এবং তাঁহার নায়েব দেওয়ান দুই জনেই কুমারটুলিতে থাকিতেন। কলিকাতায় ইংরেজ জমিদারের দেওয়ান গোবিন্দরাম মিত্রও কুমারটুলিতে

থাকিতেন। তিনি চিৎপুর রোডের উপর একটি নবরত্ন-মন্দির নির্মাণ করেন। ঐ মন্দিরের নয়টি চূড়া, এবং তাহার সর্বোচ্চ চূড়াটি গড়ের মাঠের অক্টারলোনি মনুমেণ্ট অপেক্ষাও উচ্চতর। প্রধান মন্দির ও সর্বোচ্চ চূড়াটি ১৭৩৭ সালের প্রবল ঝড়ে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ ধনপতি ও কুঠিয়াল উমিচাঁদ রাজা অপেক্ষাও মহাড়ম্বরে কলিকাতায় বাস করিতেন। তাঁহার ভবন রাজপ্রাসাদের ন্যায় বিবিধ বিভাগে বিভক্ত ছিল। কলিকাতার অধিকাংশ ভাল ভাল বাড়ীই তাঁহার সম্পত্তি ছিল। ১৭৫৭ অব্দে কলিকাতা অবরোধকালে নবাব সিরাজুদ্দৌল্লা উমিচাঁদের বাগানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া প্রধান আড্ডা স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ স্থান এক্ষণে হাল্‌সি বাগান নামে খ্যাত।

শোভাবাজারে মহারাজ নবকৃষ্ণের দুইটি বাসভবন ছিল; সে দুইটিই সুন্দর রচনাপ্রণালী এবং মনোহর শোভা সাজসজ্জা ও ঐশ্বর্যাড়ম্বরের জন্য বিখ্যাত ছিল। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে ঐ দুইটি বাটিই প্রাচ্যদেশবাসীদিগের বিবেচনায় প্রাসাদময়ী নগরী আখ্যাধারিণী মহানগরীতে প্রকৃত প্রাসাদ-সৌধের আদর্শ। চিৎপুরে বাঙ্গালার নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁর একটি বাটী ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহীশূরের টিপুসুলতানের বংশধরেরা টালিগঞ্জে আসিয়া বাস করেন; এবং উক্ত শতাব্দীর মধ্যভাগে অযোধ্যার নবাব-বংশ খিদিরপুরের দক্ষিণস্থ মাটিয়াব্রুজে আসিয়া বাস করিলেন। রাজা রামমোহন রায় আমহার্স্ট স্ট্রীটে থাকিতেন। দেওয়ান কাশীনাথের বাসভবন বড়বাজারের নিকটবর্তী কোনও স্থানে ছিল। সাধুশীল বণিক্ ও লক্ষপতি বলিয়া বিখ্যাত বাবু বৈষ্ণবচরণ শেঠের বাড়ী বড়বাজারে ছিল। গৌরী সেনের বাড়ীও বড়বাজারে ছিল। গৌরী সেন মুক্তহস্ত মহাপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। যে সকল অধমর্ণ ঋণশোধে অসমর্থ হইয়া জেলে যাইত, গৌরী সেন তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিয়া তাহাদিগকে কারামুক্ত করিতেন। যাহারা কোনও সৎকার্যের জন্য ঝগড়া-বিবাদ করিয়া বিপন্ন হইত এবং বিচারে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইত, তিনি তাহাদের জরিমানার টাকা দিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিতেন। এই সকল কারণে তাঁহার নাম "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন" ইত্যাকার প্রবাদবাক্যে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বাবু শোভারাম বসাক নামক অতি ধনাঢ্য বণিকের বাসভবন বড়বাজারে ছিল।

বড়বাজারের এবং চোরবাগানের অতি প্রাচীন ও ধনাঢ্য গোষ্ঠী মল্লিকবংশ রাজা সুখময় রায়ের পূর্বপুরুষগণ, রামদুলাল দে, মতিলাল শীল, কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্বপুরুষগণ, বাগবাজারের গোকুল মিত্র এবং আরও অনেক প্রসিদ্ধ বংশ —ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কলিকাতায় ইংরেজদিগের বসতিস্থাপনের পূর্বে এবং কেহ বা পলাশীর যুদ্ধের পর কলিকাতায় বসবাস করিতে আরম্ভ করেন।

পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গটি ১৬৯২ অব্দে নির্মিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের প্রাচীনকালের 'ফিউড্যাল' দুর্গসমূহের ন্যায় উহা নগরের সকলের আশ্রয়স্থল

স্বরূপ হইয়াছিল; দেশীয়েরা বিপদে রক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায় এবং বাণিজ্যের বিবিধ অধিকার লাভ করায়, অতি অল্পকাল মধ্যে সুতানুটি ও গোবিন্দপুরে বাস করিতে আরম্ভ করে। সার জন গোল্ড্‌স্‌বরো ডিহি কলিকাতার পুরাতন কেল্লার স্থান নির্বাচন করেন; যে গোরস্থানে চার্ণক ও গোল্ড্‌স্‌বরো সমাহিত হন, তাহার উত্তরে এবং যে বড়বাজার ইংরেজ উপনিবেশে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করিত, তাহার দক্ষিণে উহা অবস্থিত ছিল। হ্যামিলটন বলেন, কেল্লার মধ্যস্থ গভর্ণরের বাসভবন যেমন দেখিতে সুদৃশ্য ও মনোহর, তেমনই স্থাপত্যশিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন ছিল। তদ্ভিন্ন কেল্লার ভিতর পুরাতন জমিদারের কাছারি, সৈন্যদিগের জন্য একটি ভাল হাসপাতাল ও তাহাদের থাকিবার ব্যারাক, এবং কোম্পানির আনুকূল্যে ও সাধারণের চাঁদায় নির্মিত একটি গির্জা ছিল; গির্জাটি সেণ্ট য়্যানের নামানুসারে অভিহিত হইত। বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ পুরাতন কেল্লা হইতে কিয়দ্দূরে হুগলী নদীর নিম্নদিকে লর্ড ক্লাইভ কর্ত্তৃক ১৭৫৭ অব্দে আরব্ধ হয়, এবং ১৭৭৩ অব্দে ইহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। ইহাতে ২০,০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল। ইহা অষ্টভুজাকার; ইহার মধ্যে পাঁচটী পার্শ্ব বেশ সামঞ্জস্যবিশিষ্ট ও যথানিয়মে নির্মিত, কিন্তু অবশিষ্ট যে তিনটি পার্শ্ব নদীর অভিমুখীন, তাহার নির্মাণপ্রণালী নিয়মানুগত না হইয়া ইঞ্জিনিয়ারের ইচ্ছানুসারে নির্মিত হইয়াছে।

সমগ্র অট্টালিকাটি একটি পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। পরিখাটি শুষ্ক, কিন্তু উহার মধ্যস্থলে একটি খাত আছে; দুইটি কপাটে পোলদ্বারা তাহাতে নদী হইতে জল প্রবেশ করান যাইতে পারে। কেল্লার ভিতরে কেবল নিতান্ত আবশ্যক কতকগুলি গৃহ আছে, যেমন সেনাধ্যক্ষের বাসভবন, সৈনিক কর্মচারিগণের ও সৈন্যদিগের বাসস্থান ও অস্ত্রাগার। প্রত্যেক তোরণের উপরে মেজর সাহেবের বাসের নিমিত্ত এক-একটি গৃহ আছে। কয়েকজন প্রধান রাজপুরুষ একত্র মিলিত হইয়া ১৭৫৭ অব্দের জানুয়ারী মাসে কেল্লার ও তন্মধ্যস্থ অট্টালিকাগুলির যে মূল্য নিরূপণ করেন, তাহাতে উহার মূল্য ১,২০,০০০্ টাকা নির্ধারিত হয়। মেজর রাল্‌ফ স্মিথ বলেন, "১৮৩৯ অব্দে ইহার নানা স্থানে ৬১৯টি কামান যুদ্ধার্থ তুলিয়া সাজান ছিল; ইহার ভিতর যে বারুদখানা ছিল, তাহা এতবড় যে, তাহাতে এক একটি ১০০ পাউণ্ড ওজনের, ৫,৯০০ ব্যারেলের বারুদ ধরিত, এবং ইহার অস্ত্রাগারে ৪০ হইতে ৫০ হাজার বন্দুক ও তদ্ভিন্ন পিস্তল এবং তরবারি ছিল। ভিন্ন ভিন্ন পরিধির তিন হইতে চারি হাজার লোহার ও পিতলের বড় বড় কামান এবং তদনুরূপ গোলাগুলি বোমা ছিল; 'কেস' ও 'গ্রপশট' ব্যতীত কেবল সেই গোলাগুলিতে ২০ লক্ষ বার কামান ছাড়া যাইতে পারিত। তৎকালে ইহাতে ১৫,০০০ লোক স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিত…। ১৮৫৭ সাল হইতে অট্টালিকার ক্রমশঃই উন্নতি হইতেছে।"

বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট হাউস। (বড়লাটের বাসভবন) ময়দানের (গড়ের মাঠের) উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। মার্কুইস অব ওয়েলেসলি ১৭৯১ অব্দে ইহার

নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করেন, এবং ১৮০৪ অব্দে তাহা সমাপ্ত হয়। ইহাতে সর্বসমেত প্রায় ১,৫০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল ; জমির জন্য ৮,০০০ পাউণ্ড, অট্টালিকার জন্য ১,৩০,০০০ পাউণ্ড, এবং প্রথম বার সাজানর জন্য ৫,০০০ পাউণ্ড। জমির পরিমাণ প্রায় ৬ একর (১৮ বিঘা ৩ কাঠা) হইবে। বরাট আতাম কর্তৃক নির্মিত লর্ড স্কার্সডেলের ডার্বিশায়ারস্থ কেড্‌লস্টন হল নামক প্রাসাদের অনুকরণে ইহার নক্সা প্রস্তুত হইয়াছিল। রাজপ্রতিনিধি ও তাঁহার অনুচরবর্গের বাসগৃহ ব্যতীত ইহার ভিতর একটি কাউন্সিল চেম্বার (মন্ত্রি-সভাগৃহ) আছে; তথায় উচ্চতম ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। ইহার নিমিত্ত সময়ে সময়ে যে সকল চিত্র, প্রতিমূর্তি এবং অন্যান্য সাজসজ্জা ও ভূষণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে প্রাসাদের সৌন্দর্য বহু পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ঐতিহাসিক মূল্যও অত্যন্ত অধিক।

হাইকোর্ট মন্দির গবর্ণমেণ্ট হাউসের পশ্চিমে নদীর নিকটে অবস্থিত। ঐ স্থানে পূর্বে সুপ্রীম কোর্ট ছিল। বর্তমান বাটি ১৮৭২ সালে নির্মিত হয়। বেলজিয়ম দেশান্তর্গত Ypres (ঈশ্বর) নগরের টাউন হলের অনুকরণে ইহার নক্সা প্রস্তুত হইয়াছিল।

হাইকোর্টের পূর্ব ও গবর্ণমেণ্ট হাউসের পশ্চিমে, অর্থাৎ উভয় ভবনের মধ্যস্থলে, টাউনহল দণ্ডায়মান। কলিকাতার অধিবাসীরা প্রায় ৭,০০,০০০৲ টাকা ব্যয়ে ১৮০৪ সালে ইহা নির্মাণ করেন। এই ভবনে যে সকল অতি মনোহর চিত্রপটাদি শিল্প-সামগ্রী আছে, তন্মধ্যে ওয়ায়েন হেস্টিংসের ও রমানাথ ঠাকুরের দুইটি মর্মর প্রস্তরখচিত প্রতিমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক সরকারী অট্টালিকা আছে, যথা—স্ট্যাণ্ডের উপরিস্থ বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, সেনট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস, জেনারেল পোস্ট অফিস, রাইটার্স বিল্ডিং নামক বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের দপ্তরখানা ইত্যাদি ইত্যাদি।

ময়দান (গড়ের মাঠ) যে কেবল কলিকাতার বায়ুকোষ বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা নহে, অধিকন্তু উহার উপর বহু স্মৃতিনিদর্শন বিদ্যমান। সুপ্রসিদ্ধা মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া বহু রাজপ্রতিনিধি, গবর্ণর জেনারেল, প্রধান সেনাপতি এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ বিখ্যাত রাজপুরুষগণের প্রতিমূর্তি এই ময়দানের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। ঐ সমস্ত প্রতিমূর্তির অধিকাংশই ভাস্কর-বিদ্যার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধর্ম, বদান্যতা ও বিদ্যাশিক্ষা

সেকালে কলিকাতাবাসীদিগের স্বভাবচরিত্র যেরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে জনৈক উদারহৃদয় লেখক এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন: "কলিকাতার অধিবাসীরা বদান্যতার জন্য প্রসিদ্ধ; জগতের কোনও জাতি এ বিষয়ে ইহাদের সমকক্ষ নহে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে; ইহাদিগকে সমষ্টিভাবে ধরিয়া ধীরভাবে বিচার করিলে এই অবিচলিত সত্য স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে। আমি যে কেবল অধ্যয়ন ও দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ হইতে একথা বলিতেছি তাহা নহে, প্রত্যুত আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি। স্বভাবতঃ এইরূপ বদান্যতার প্রবৃত্তি-সম্পন্ন জাতি যে পরোপকারপরায়ণ মহাপ্রাণ ইংরাজগণকর্তৃক পরিচালিত হইতে পারিয়াছিল, ইহা তাহাদের সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। সে সময়ে পরোপকারপরায়ণ সদাশয় ইংরেজের সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। বহু সদ্গুণকর্তৃক প্রণোদিত হইয়া ইরেজগণ যে বিবিধ লোকহিতকর কার্যে যোগদান করিয়া জনসাধারণের সুখস্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি ও তাহাদের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষবিধান করিয়াছেন, ইতিহাসে তাহার বহু জাজ্বল্যমান প্রমাণ বিদ্যমান। প্রোক্ত লেখক চার্লস ওয়েস্টন নামক একজন সাহেবের মহাপ্রাণতার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহা অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। চার্লস ১৭৩১ সালে কলিকাতা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মেয়র্স কোর্টের একজন রেকর্ডার ছিলেন। হলওয়েল সাহেব তাঁহার সুহৃৎ ও সহচর ছিলেন। নবাব সিরাজুদ্দৌলা যৎকালে ১৭৫৬ অব্দে কলিকাতা আক্রমণ করেন, তৎকালে তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিকরূপে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। শ্রমশীলতা দ্বারা তিনি প্রচুর ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে একথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহা অপেক্ষা যোগ্যতর বরপুত্রের প্রতি কখনও প্রসন্ন হন নাই। তাঁহার সকল সাধু কার্যের উল্লেখ করা দুঃসাধ্য। দীন-দুঃখীর ক্লেশ অপনোদনের নিমিত্ত তিনি যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। "যাহারা এক সময়ে সুখের মুখ দেখিয়াছে, যাহাদের প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী বিরূপ হইয়াছে, চার্লস ওয়েস্টন তাহাদের দুঃখমোচন করেন।" তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও অনুচর সহচরগণকে তাহাদের অভাবের সময়ে তিনি অকাতরে সাহায্য করিতেন। এই সকল কারণে অনেকে কৌতুক করিয়া যে তাঁহাকে 'মানবের সাধারণ বন্ধু' নাম রাখিয়াছিলেন, তাহা অসঙ্গত হয় নাই। কর্ণেল স্টুয়ার্ট পুণ্যানুষ্ঠান ও বিনয়-প্রদর্শন দ্বারা সকলেরই হৃদয়ের অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণ ও

খ্রীষ্টকে তুল্যরূপ ভক্তির চক্ষে দেখিতেন। এজন্য তিনি 'হিন্দুস্টুয়ার্ট' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অন্যান্য জাতীয় সাধু পুরুষেরাও নানাবিধ সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। সে সমস্ত সবিস্তারে উল্লেখ করা অনাবশ্যক বটে, অসম্ভবও বটে। এই দুই চারিটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। কীর্ন্যাণ্ডার নামক একজন পর্তুগীজ ১৭৫৮ অব্দে এদেশে আগমন করেন। তিনিই কলিকাতার প্রোটেস্টান্ট মিশনারী। তিনি ষষ্ঠ সহস্রাধিক সিক্কা টাকা ব্যয় করিয়া ১৭৬৭ সালের ২৪শে মে প্রোটেস্টান্ট গির্জা স্থাপন করেন। প্রায় ইহার সমকালে তাঁহার মিশন স্কুলও স্থাপিত হয়। পর বৎসর তিনি ১৭৫টি বালকবালিকা প্রাপ্ত হন, তাহাদের মধ্যে ৩৭টির ব্যয়ভার তিনি নিজে বহন করিতেন। কিছুকাল তাঁহার বিদ্যালয় ও গির্জার জন্য তাঁহাকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একটি বাড়ী দিয়াছিলেন, কিন্তু পরে উভয়ই স্থানান্তরিত হয়, এবং তিনি নিজে উভয়ের নিমিত্ত বর্তমান মিশন স্ট্রীটে বাটী নির্মাণ করেন। কর্ণেল ক্লাইভ ও তাঁহার পত্নী এবং ওয়াটস্ সাহেব ও তাঁহার সহধর্মিণী কীর্ন্যাণ্ডারের সবিশেষ বন্ধুরূপে পরিগণিত ছিলেন। দিল্লীর মোগল সম্রাট তাঁহার প্রতি খ্রীষ্টীয় ধর্মপুস্তকগুলি আরবীয় ভাষায় অনুবাদ করিবার ভার অর্পণ করেন। তিনিও তাহা সমাধা করিয়া অনুবাদগুলি এলাহাবাদে সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি দুইবার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী আপনার সমস্ত সম্পত্তি স্বামীর বিদ্যালয় ও গির্জার নামে দান করিয়া যান। সেই সদাশয়া রমণীর সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থে কীর্ন্যাণ্ডার সাহেব আপনার মিশন স্কুলবাড়ীতে একটা প্রকাণ্ড ঘর সংযোজিত করেন; তাহাতে ২৫০টি বালক-বালিকা ধরিতে পারিত। সার আয়ার কুট এবং তাঁহার পত্নী এই মিশনের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ করিতেন, এবং বিবি কুট এইখানেই তাঁহার সেক্রামেণ্ট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৭৮৬ সালে কীর্ন্যাণ্ডার নিজে ১০০০, তাঁহার পুত্র ৩০০০, এবং সার আয়ার কুট ৫০০, টাকা এই মিশনে দান করেন। কীর্ন্যাণ্ডারের জীবনকাল মধ্যে তিনি ইহার আনুকূল্যার্থে ১২,০০০ পাউণ্ড দান করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি ভাগ্যবিপর্যয়ে দারুণ দুর্দশায় পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্কুল গির্জাও আইনের হস্ত হইতে অব্যাহতি পায় নাই। এই সময়ে গ্রাণ্ট সাহেব অগ্রসর হইয়া ১০,০০০, টাকা প্রদান করিয়া গির্জাটি রক্ষা করেন। ১৭৮৭ সালে এই গির্জা ও স্কুল সাধারণের সম্পত্তি হইয়া পড়ে এবং উহাদের কর্তৃত্ব তিনজন ট্রাস্টির হস্তে অর্পিত হয়। কীর্ন্যাণ্ডার ১৭৯৯ সালে কালগ্রাসে পতিত হন। সুইডেনের অন্তঃপাতী অক্স্টাণ্ড নামক স্থানে ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে নবেম্বর তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বজাতীয় পর্তুগীজদিগের উপকারসাধনের চেষ্টায় যে সদাশয়তা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তাঁহার গির্জাকে সাধারণ লোকে 'লালগির্জা' বলিত। তাঁহার স্কুলে পর্তুগীজ ও

ইংরেজী—এই উভয় ভাষাই শিক্ষা দেওয়া হইত। আর্মানী ও বাঙ্গালী বালকেরাও তাঁহার বিদ্যালয়ে পড়িতে পাইত। তাঁহার বড় আশা ছিল যে, তাঁহার হিন্দু ছাত্রেরা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হইবে, কিন্তু সে আশায় তাঁহাকে যারপরনাই বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছিল।

কলিকাতায় সকলেই অবাধে আপন আপন ধর্মবিশ্বাস অনুসারে চলিতে পারে। কোন্ সময়ে প্রথম খ্রীষ্টানী গির্জা নির্মিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না। আগ্রা নগরে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের অনুমতিক্রমে নির্মিত একটি গির্জা ছিল। কাপ্তেন হ্যামিল্টন ১৬৮৮ হইতে ১৭২৩ খ্রীঃ পর্যন্ত এদেশে ছিলেন। তিনি ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার যে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত করেন, তাহার এক স্থলে লিখিয়াছেন : "ফোর্ট উইলিয়ম হইতে প্রায় ৫০ গজ দূরে একটি গির্জা দণ্ডায়মান ; কলিকাতাবাসী বণিক্‌দিগের বদান্যতায় এবং যে সকল সমুদ্রগামী লোক কার্যবশতঃ তথায় বাণিজ্য করিতে যায়, তাঁহাদের দানশীলতায় উহা নির্মিত ; পরন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের প্রচারকেরা অমর নহেন, এজন্য অনেক সময়ে যুবক বণিক্‌দিগকে পৌরোহিত্য করিতে হয় ; তাঁহারা কোম্পানির প্রদত্ত বেতনের অতিরিক্ত রবিবারে প্রার্থনা ও ধর্মোপদেশ পাঠ করার জন্য বার্ষিক ৫০ পাউণ্ড বেতন পাইয়া থাকেন।" ১৭০৯ সালে লণ্ডনের বিশপ উহার নাম সেণ্ট আন্ চর্চ রাখেন। পাঁচটি উচ্চ পার্শ্ব-শিখর ও একটি চূড়ায় সুশোভিত এই মন্দিরটি রাইটার্স বিল্ডিংস্ নামক অট্টালিকার যেস্থলে এক্ষণে অষ্টভুজাকার অংশটি বর্তমান, সেইস্থলে দণ্ডায়মান ছিল। ১৭৫৬ অব্দে নবাব সিরাজুদ্দৌলার ফৌজ উহার ধ্বংস সাধন করে। ১৭৩৭ সালের প্রবল ঝড়ে উহার চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছিল।......১৭৫৬ সালের গোলযোগের পর কলিকাতায় শান্তি বিরাজ করিতে আরম্ভ করিলেই একটি নূতন গির্জা নির্মাণ করিবার নিমিত্ত সকলেই সমুৎসুক হইয়া উঠিল। কিছুদিন পর্তুগীজদিগের Our Lady of the Rosary নামক গির্জাটি রাজ-গির্জারূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল, কিন্তু উহা আর্দ্রভাবাপন্ন ও অস্বাস্থ্যকর বিবেচিত হওয়ায় পুনর্বার পর্তুগীজদিগকে প্রত্যর্পিত হয়। ১৭৬০ সালের জুলাই মাসে পুরাতন কেল্লার ভগ্ন প্রাচীরের মধ্যেই একটি অস্থায়ী ভজনালয় নির্মিত হয়, এবং সেণ্ট জন্‌স্ চ্যাপেল নামে আখ্যাত হয়।

১৭৭৪ অব্দে অনেককে অনুযোগ করিতে শুনা গিয়াছিল যে, কলিকাতায় মনোহর ক্রীড়াগার আছে বটে, কিন্তু গির্জা নাই। কিন্তু তথাপি কলিকাতা-বাসীরা ১৭৮২ অব্দের পূর্বে ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানীর উপযুক্ত সাধারণের উপাসনা-মন্দির নির্মাণ বিষয়ে আন্তরিকতার সহিত মনোনিবেশ করেন নাই। উক্ত বৎসর একটি চার্চ-কমিটি (গির্জা-সমিতি) গঠিত হইল ; ওয়ারেন হেস্টিংস এবং তাঁহার মন্ত্রিসভার সদস্যগণ উহার পৃষ্ঠপোষক হইলেন। লণ্ডন নগরের ওয়ালব্রুক নামক স্থানের সেণ্ট স্টিফেন গির্জার আদর্শে একটি গির্জা নির্মাণের প্রস্তাব হইল। যেমন আদর্শ স্থির হইল, অমনই তাহার একটি নক্সা কর্ণেল

পোলিয়ার এবং আর একটি নক্সা কর্ণেল ফোর্টন্যাম অঙ্কন করিলেন। ১৭৮৩ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে, বিল্ডিং কমিটির প্রথম অধিবেশন হয়, ৩৫,৭৫০, টাকা চাঁদা দ্বারা এবং ২৫,৫৯২, টাকা লটারি দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছিল। মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর ৬ বিঘা জমি দান করেন। তৎকালে উহার মূল্য ৩০, ০০, টাকা। কোম্পানি তাঁহাদের রাজস্ব হইতে শতকরা ৩, টাকা প্রদান করেন। এ বিষয়ে লোকে এতদূর আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, উহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিন গভর্ণর জেনারেল সর্বসাধারণ ইংরেজদিগকে প্রাতঃকালে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। প্রধান প্রধান গভর্ণমেণ্ট কর্মচারীরা মহাড়ম্বরে ঐ স্থানে গমন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে চার্লস গ্রাণ্ট গৌড় হইতে কতকগুলি বৃহদায়তন মর্মর প্রস্তর ও অন্যান্য আসল পাথর আনয়ন করেন। ডেভিস সাহেব গির্জাটি ভূষিত করিবার ভার গ্রহণ করেন। হল নামক একজন ব্যারিস্টার বিনা পারিশ্রমিকে চুক্তিনামা লেখাপড়া করিয়া দেন। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্য-ভাষাবিৎ উইলকিন্স বারাণসীতে প্রস্তুত প্রস্তরসমূহের গঠনের তত্ত্বাবধান করেন। আর্ল কর্ণওয়ালিস্ ৩,০০০ সিক্কা টাকা প্রদান করেন। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর জোফানি বিনামূল্যে বেদী চিত্রিত করিয়া দেন। এই নূতন গির্জা নির্মাণ করিতে তিন বৎসর লাগিয়াছিল। অবশেষে আর্ল অব্ কর্ণওয়ালিস্ ১৭৮৭ অব্দের ২৪শে জুন তারিখে ইহা উন্মুক্ত করেন। ইহার প্রাঙ্গণে অনেক বিখ্যাত লোকের সমাধি-মন্দির আছে; তন্মধ্যে হ্যামিল্টন, চার্ণক ও তাঁহার হিন্দু বিধবা পত্নী, এবং ওয়াটসনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৩৯ অব্দে ময়দানের দক্ষিণ কোণে সেণ্ট পল্স্ ক্যাথিড্রাল নামক গির্জার নির্মাণ আরম্ভ হয়। বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্স সম্প্রদায়ের মেজার ফার্বস্ ইহার নক্সা প্রস্তুত করেন। ১৮৪৭ সালের ৮ই অক্টোবর তারিখে গির্জাটি উৎসৃষ্ট হয়। ইহার নির্মাণার্থে প্রায় ৭৫,০০০ পাউণ্ড অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল; তন্মধ্যে বিশপ স্বয়ং ২০,০০০ পাউণ্ড দিয়াছিলেন, তাহার অর্ধাংশ নির্মাণকার্য ও অপরার্ধ স্থায়ী ধনভাণ্ডার। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভূমি এবং নগদ ১৫,০০০ পাউণ্ড দান করিয়াছিলেন। চাঁদায় ভারতবর্ষে ১২০০০ পাউণ্ড এবং ইংলণ্ডে ২৮,০০০ পাউণ্ড উঠিয়াছিল। মন্দিরের নির্মাণকার্যে ৫০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল। ইংলণ্ডে যে চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার মধ্যে Society for the propagation of the Gospel (সুসমাচারপ্রচার সমাজ) ৫,০০০ পাউণ্ড দিয়াছিলেন, Society for the Promotion of Christian Knowledge ৫,০০০ পাউণ্ড দিয়াছিলেন, এবং লণ্ডনের টমাস হ্যাট সাহেব ৪,০০০ পাউণ্ড দিয়াছিলেন। পরলোকগত ধর্মপ্রাণ বিশপ উইলসনের সাধু চেষ্টায় ভগবানের এই মন্দির নির্মিত হয়। কলিকাতার লর্ড বিশপ এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত; তিনি এখানকার উপাসনাদি কার্যনির্বাহ করেন, ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও অন্যান্য প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা এখানে উপস্থিত হইয়া তাহাতে যোগ দিয়া

থাকেন। আজকাল রোম্যান ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যাণ্ট, প্রেসবিটিরিয়ান ও মেথডিস্ট—এই সকল ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক গির্জা কলিকাতার গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। প্রাচীনকালে ১৬৮৯ সালেও আর্মানীদিগের ভজনালয় ছিল। ১৭২০ সালে ফানুস নামক একজন আর্মানী গির্জার জন্য একখণ্ড ভূমি ক্রয় করেন; তৎপরে ১৭২৪ অব্দে আগানাজার সেই ভূমি গ্রহণ করেন, এবং সাধারণের চাঁদায় সেণ্ট নাজারেথ নামে আর একটি আর্মানী গির্জা নির্মিত হয়। এইরূপ একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, প্রসিদ্ধ কুঠিয়াল উমিচাঁদের শ্যালক ও একজিকিউটার হুজুরি মল সেণ্ট নাজারেথ গির্জার একটি চূড়া নির্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন এই শহরে চীনাম্যান, ইহুদী, পার্শী, গ্রীক ও অন্যান্য জাতিরও উপাসনা-মন্দির আছে।

কলিকাতা শহরে, টালিগঞ্জে এবং চিৎপুরে তিন স্থানেই মুসলমানদিগের বহু মসজিদ আছে; ইহাদের সংখ্যা ৪৮৬ হইবে, তন্মধ্যে ৩৭৬টি সুন্নি সম্প্রদায়ের এবং ১১০টি শিয়া সম্প্রদাদের। এই সমস্ত মসজিদের মধ্যে পশ্চাল্লিখিত কয়েকটি সবিশেষ প্রসিদ্ধ:

১। সিন্দুরিয়াপটি মসজিদ ৯৮ নং লোয়ার চিৎপুর রোড; ইহার স্থাপয়িতা হাফিজ সমরুদ্দিন সাহেব। ইহার বর্তমান অধিকারী হাফিজ আবদুল আজিজ। ইহার সহিত একটি বাসভবন সংলগ্ন আছে; তথায় দরিদ্র মুসলমান ছাত্রেরা বিনা ব্যয়ে বাসস্থান ও আহার্য পাইয়া থাকে।

২। হাজি জাকারিয়া মহম্মদের মসজিদ লোয়ার চিৎপুর রোডে; ইহার প্রতিষ্ঠাতা হাজি জাকারিয়া মহম্মদ। ইহার বর্তমান অধিকারীর নাম হাজি নুর মহম্মদ জাকারিয়া। এই মসজিদে বহু সংখ্যক ছাত্র বিনাব্যয়ে বাসস্থান ও আহার্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৩। ধর্মতলা মসজিদ; ইহাকে সাধারণতঃ টিপুসুলতানের মসজিদ বলে; ডিরেক্টর সভা ১৮৪০ সালে প্রিন্স্ গোলাম মহম্মদকে তাঁহার পূর্ব প্রাপ্য সমস্ত বৃত্তির টাকা প্রদানের আদেশ করায় ভগবানের অপার করুণার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক এই মসজিদ ১৮৪২ সালে নির্মাণ করিয়া ইহার ব্যয়নির্বাহের সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দেন।

৪। মেছোবাজারের মসজিদ, মেছোবাজার ষ্ট্রীটে অবস্থিত; কটকবাসী ফতু কাঞ্চরিয়া কর্তৃক স্থাপিত; ইহার বর্তমান অধিকারীর নাম মহম্মদ গিয়াসুদ্দিন। এখানেও কয়েকজন ছাত্র বিনাব্যয়ে আহার্য ও বাসস্থান পাইয়া থাকে।

৫। হ্যারিসন রোডের পার্শ্বস্থ মসজিদ, দীন চামড়াওয়ালা নামক একজন সামান্য জুতাব্যবসায়ী কর্তৃক নির্মিত। এখানেও বিনাব্যয়ে আহার্যাদি পাইবার ব্যবস্থা আছে।

মুসলমানেরা এই সমস্ত এবং অন্যান্য মসজিদে নমাজ পড়িয়া থাকেন; নমাজ

পড়িবার জন্য প্রত্যেক মসজিদে এক একজন ইমাম অর্থাৎ পুরোহিত আছেন। সকল মসজিদেরই জমি নিষ্কর জমি এবং সর্বপ্রকার মিউনিসিপাল কর প্রদানের দায় হইতে মুক্ত।

ব্রাহ্মদিগের তিনটি প্রকাশ্য ভজনালয় আছে,—একটি পরলোকগত কেশবচন্দ্র সেনের যত্নে নির্মিত, উহা মেছোবাজার ষ্ট্রীটে অবস্থিত এবং নববিধান মন্দির নামে পরিচিত; দ্বিতীয়টি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে অবস্থিত এবং 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামে সুপরিচিত; এবং তৃতীয়টি আদি ব্রাহ্মসমাজ নামে খ্যাত; উহা একমাত্র স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পত্তি, কিন্তু ইচ্ছা করিলে সকলেরই তথায় যাইয়া উপাসনাদি করিতে পারেন। সুপ্রসিদ্ধ রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম ব্রহ্মসমাজ স্থাপন করেন।

হিন্দুদের মতে কালীঘাট বা কালীক্ষেত্র ভারতবর্ষের মধ্যে একটি অতি পবিত্র তীর্থ ও পূজার স্থান। সত্যযুগে আদর্শসতী 'সতী' পিতা দক্ষরাজের যজ্ঞে পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলে, তৎকালে বিষ্ণু সুদর্শনচক্র দ্বারা সেই অঙ্গ ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হন, সেই সময় সতীদেহের চারিটি অঙ্গুলী এই স্থানে পতিত হইয়াছিল। তদবধি এই স্থানে শাক্ত হউক, শৈব হউক, গাণপত্য হউক, সর্বসম্প্রদায়ের হিন্দুর নিকট ইহা মহাতীর্থ। অতি প্রাচীনকাল হইতে লোকে মনস্কামনাসিদ্ধির নিমিত্ত এই স্থানে মানসিক করিয়া থাকে, এবং প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, অনেক স্থলে কামনা সফলও হইয়াছে। যোগী, সন্ন্যাসী ও সাধু মহাপুরুষেরা এই স্থানে সমবেত হইয়া থাকেন এবং মহাদেবীর পূজা করিয়া আপনাদের গন্তব্য পথে চলিয়া যান। ভারতবর্ষের উত্তরাংশের হিন্দু করদ রাজারা কলিকাতায় আসিলে, মা কালীর পূজা না দিয়া তাঁহারা স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন না। দেশের সর্বত্রই এই মন্দিরের পবিত্রতার খ্যাতি পরিব্যাপ্ত। হিন্দুরা ইহাকে এতদূর ভক্তি করে যে, এই বিষয়ে ইহা কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের তুল্য বলা যাইতে পারে। কথিত আছে যে, সেকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও কালীঘাটে দেবীর পূজা দিতেন। প্রথম প্রথম তাঁহারা ধূমধামের সহিত পুণ্যাহ উৎসব যথানিয়মে সম্পন্ন করিতেন, এবং সেই উপলক্ষে দেবীর পূজানুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। *

---

* এ সম্বন্ধে খ্রীষ্টান মার্শম্যান সাহেব লিখিয়াছেন: "গত সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি কতকগুলি ইংরেজ কালীঘাটে গিয়াছিলেন, এবং ইংরেজরা সম্প্রতি এদেশে যে সকল বিজয় লাভ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত কোম্পানির নামে হিন্দুদেব-দেবীর নিকট পূজা দিয়াছেন। পাঁচ হাজার টাকার পূজা দেওয়া হইয়াছে। সহস্র সহস্র বাঙ্গালী এই প্রতিমার নিকট ইংরেজদিগের পূজা দেওয়া দেখিয়াছে। এই কার্যে আমরা সবিশেষ মর্মাহত হইয়াছি, কারণ এই ব্যাপারে বাঙ্গালীরা যেন-আমাদিগকে টিটকারী দিবার জন্যই উল্লাস প্রকাশ করিতেছে।"

এই তীর্থের উৎপত্তি ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে এস্থলে সবিশেষ আলোচনা করা অনাবশ্যক। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, তন্ত্রসার, এবং অন্যান্য পুরাণ ও তন্ত্রে এবিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা আছে। কথিত আছে যে মহাদেবীর মন্দির ঠিক নদীর ধারে অর্থাৎ ঘাটের উপর ছিল। এইজন্য সহজেই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, ইহা হইতেই বর্তমান কালীঘাট নামের উৎপত্তি। বৃহন্নীলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, অতি প্রাচীনকালে অতি অল্পসংখ্যক কয়েকজন ভক্ত মাত্র এই কালীদেবীর কথা জ্ঞাত ছিলেন। যৎকালে সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু নরপতি বল্লাল সেন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সময় হইতে যৎকালে মোগল সম্রাট্ আকবর রাজত্ব করিতেন এবং অমর কবিকঙ্কণ তাঁহার ভক্তিরসাত্মক চণ্ডীকাব্য প্রণয়ন করেন, সেই সময় পর্যন্ত নানস্থানে নানাভাবে এই তীর্থ প্রসঙ্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, কলিকাতার অদূরস্থ বড়িশানিবাসী সন্তোষ রায় ১৮০৯ সালে বর্তমান মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন।

পাদরি ওয়ার্ড সাহেব লিখিয়াছেন: "কলিকাতার নিকট কালীঘাটে এই দেবীর একটি বিখ্যাত মন্দির আছে; হিন্দুরা বলে, সমস্ত এশিয়া,—এমন কি সমস্ত পৃথিবী এই দেবীর পূজা করিয়া থাকে। এই দেবীর নিকট প্রতিদিন যে সকল পূজার সামগ্রী অর্পিত হয়, তাহার পরিমাণ এত অধিক যে, শুনিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়; অতি দুর্যোগের দিনেও অন্যূন ৩২০ পাউণ্ড (৪ মন) চাউল, ২৪ পাউণ্ড চিনি, ৪০ পাউণ্ড সন্দেশ, ১২ পাউণ্ড ঘি, ১০ পাউণ্ড ময়দা, ১০ কোয়ার্ট দুধ, এক পেক ডাল, ৮০০ কলা ও ন্যূনাধিক পাঁচ শিলিঙ্ মূল্যের অন্যান্য দ্রব্য প্রদত্ত হইয়া থাকে; তদ্ভিন্ন আট দশটি ছাগ-বলি হয়। সাধারণ দিনে এই পরিমাণের তিনগুণ, এবং প্রধান প্রধান উৎসব দিবসে, অথবা কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তি পূজা দিতে আসিলে, ইহার দশ গুণ, বিশ গুণ, চল্লিশ গুণ দ্রব্যও অর্পিত হইয়া থাকে, এবং ৪০ হইতে ৫০টি মহিষ ও ন্যূনাধিক এক সহস্র ছাগ বলি দেওয়া হয়।

"কথিত আছে যে, প্রায় ৫০ বৎসর হইল, কলিকাতার রাজা নবকৃষ্ণ কালীঘাট দর্শনে যাইয়া দেবীর পূজায় অন্যূন এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পূজার অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে ১০,০০০্ টাকা মূল্যের একছড়া সোনার কণ্ঠমালা, বহুমূল্য শয্যা, রূপার থালা, রেকাব, বাটি এবং একহাজার লোককে ভোজন করাইবার উপযুক্ত সন্দেশ ও অন্যান্য খাদ্য ছিল; তদ্ভিন্ন প্রায় দুই হাজার কাঙ্গালীকে কিছু কিছু নগদ অর্থও দেওয়া হইয়াছিল।

"প্রায় ২০ বৎসর হইল, কলিকাতায় নিকটস্থ খিদিরপুরনিবাসী জয়নারায়ণ ঘোষাল এই স্থানে পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন; তিনি ২৫টি মহিষ, ১০টি ছাগ ও ৫টি মেষ বলি দিয়াছিলেন, এবং দেবীকে চারিটি রূপার হাত, দুইটি সোনার চক্ষু, এবং সোনা-রূপার বিস্তর অলঙ্কার অর্পণ করিয়াছিলেন।

"প্রায় ১১০ বৎসর হইল, পূর্ববঙ্গের একজন মহাজন (বণিক্) এই দেবীর

পূজায় কেবল পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন ; তদ্ভিন্ন তিনি এক সহস্র ছাগ ক্রয় করিয়া বলি দিয়াছেন।

"১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের একজন ব্রাহ্মণ এই প্রতিমার পূজায় প্রায় ৪০০০, টাকা ব্যয় করেন ; ঐ টাকার কিয়দংশ দিয়া তিনি একছড়া সোনার কণ্ঠমালা কিনিয়া দিয়াছিলেন ; তাঁহার মালাগুলির আকার অসুরের মুণ্ডের মত।"

"১৮১১ সালে গোপীমোহন নামক কলিকাতাবাসী একজন ব্রাহ্মণ এই দেবীর পূজায় দশ হাজার টাকা ব্যয় করেন ; কিন্তু তিনি নিজে বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া কোনও পশু বলি দেন নাই। কেবল হিন্দুরাই যে এই কাল পাথরের পূজা করে তাহা নহে ; আমি অনেকবার শুনিয়াছি যে, ইউরোপীয়েরা, অথবা তাহাদের এতদ্দেশীয় উপপত্নীরা, এই মন্দির দর্শনে গমন করে এবং পূজায় সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করে। আমি যে ব্রাহ্মণের নিকট বসিয়া এই বিবরণ লিখিতেছিলাম, তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি যখন কালীঘাটের নিকট বড়িশায় থাকিয়া পড়িতেন, সেই সময়ে তিনি অনেকবার দেখিয়াছিলেন যে ইউরোপীয়দিগের ভার্যারা পাল্কী যোগে আসিয়া পূজা দিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু আমার বোধ হয়, এই সকল রমণী ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন, মন্দিরাধিকারীরা তাঁহাকে দৃঢ়তার সহিত নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন যে, সাহেবেরা সর্বদাই দেবীর পূজা দিয়া, তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করেন, এবং সম্প্রতি কোম্পানির একজন সাহেব কর্মচারী একটি মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া দুই তিন হাজার টাকা ব্যয় করিয়া কালীর পূজা দিয়া গিয়াছেন।...তদ্ভিন্ন ইহাও দৃঢ়তার সহিত কথিত হইয়া থাকে যে, প্রতিমাসে প্রায় চারি পাঁচশত মুসলমান কালীর পূজা দিয়া থাকে।"

পাদরি ওয়ার্ড সাহেব পুনরপি বলিয়াছেন : "এই মন্দিরের জন্যই কালীঘাটে লোকসংখ্যা এত অধিক ; কারণ প্রায় ৩০ ঘর সেবাইত ভিন্ন ন্যূনাধিক ২০০ ব্যক্তি এই মন্দিরকে উপলক্ষ করিয়া জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। কোন কোন সেবাইতের পালা একদিন, কাহারও অর্ধদিন, কাহারও দুই তিন ঘণ্টা মাত্র। যাঁহার পালার সময়ে যে-কিছু পূজার সামগ্রী অর্পিত হয়, তৎসমস্তই তিনি প্রাপ্ত হন।" উক্ত সাহেব বলেন, এই দেবীর পূজার ব্যয় সর্বপ্রকারে মাসিক ৬০০০, সিক্কা টাকা, অর্থাৎ বৎসরের ৭২,০০০, টাকা। কিছুদিন হইতে কালীঘাট ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলি কলিকাতা শহরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, এবং সকল শ্রেণীর লোকেই এখানে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে ; এই কারণে ইহা এক্ষণে কলিকাতার একটি জনবহুল উপনগরে পরিণত হইয়াছে। পাদরি ওয়ার্ড সাহেবের লেখার পর সেবাইতগণের সংখ্যা বহুপরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই তীর্থে শ্রীশ্রীনকুলেশ্বর ও শ্যামরায় নামে আরও দুইটি দেবতা আছেন ; হিন্দুরা ইহাদিগকেও যথেষ্ট ভক্তির সহিত পূজা করিয়া থাকে। গোবিন্দপুরে যে স্থানে বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ দণ্ডায়মান, ঐ স্থানে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মন্দির ছিল ;

গোবিন্দজীকে এক্ষণে কালীঘাটে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। লোকের দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, কালীঘাটে নকুলেশ্বর ভৈরব থাকায় এই তীর্থক্ষেত্রের মাহাত্ম্য আরও অধিকতর বর্ধিত হইয়াছে।

হিন্দুদিগের ধর্মপ্রবৃত্তির দৃষ্টান্তস্বরূপ ওয়ার্ড সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন যে, কৃষ্ণনগরের রাজা রামকৃষ্ণ 'বরানগরে' কালীদেবীর প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন।' শ্রীশ্রীব্রাহ্মণগণের ও দীন দরিদ্রদিগের ভরণপোষণার্থ উক্ত রাজার দান যথার্থই নদীয়ার রাজবংশের উচ্চ মর্যাদার অনুরূপ। গোবিন্দ-রাম মিত্রের নবরত্ন মন্দিরের কথা ইতঃপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বাগবাজারে আপার চিৎপুর রোডের পার্শ্বস্থ সিদ্ধেশ্বরীদেবীও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। সকল শ্রেণীর হিন্দুই এই দেবীকে পূজা দিয়া থাকে। বাগবাজারের বাবু গোকুলচাঁদ মিত্র মদনমোহন দেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার জন্য অন্য একটি সুন্দর বাড়ী নির্মাণ করাইয়া বিগ্রহের সেবার জন্য যথোচিত সম্পত্তি দান করেন। ঐ মন্দিরটি মদনমোহনের বাড়ী নামে পরিচিত। এইরূপ একটা কিংবদন্তী আছে যে, এই বিগ্রহটি প্রথমে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের রাজার ছিল ; তিনি বিস্তর টাকা লইয়া ধর্মপ্রাণ গোকুলবাবুর নিকট উহা বন্ধক রাখেন। পরে রাজা টাকা দিয়া বিগ্রহ ফিরাইয়া চাহিলে গোকুলবাবু অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং তাহা প্রত্যর্পণ করিতে অনিচ্ছাপ্রকাশ করেন। ইতোমধ্যে রাজার প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল যে, তিনি যেন উহার জন্য গোকুলের উপর পীড়া-পীড়ি না করেন ; সুতরাং "রাজা ঐ বিষয়ে ক্ষান্ত হইলেন ; মূর্তি গোকুলবাবুরই হইল।"

মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর স্বীয় ভবনে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগোপীনাথজীর যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে ওয়ার্ড সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন :

দুইজন সন্ন্যাসী [যাহারা উত্তরকালে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের মধ্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধলাভ করেন]—চৈতন্য ও নিত্যানন্দ তাঁহাদের শিষ্য ঘোষঠাকুরকে এই বলিয়া অগ্রদ্বীপ পাঠাইয়াছিলেন যে, তুমি এই পাথরটা লইয়া যাইয়া গোপীনাথ-জীর বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতে থাক। ঘোষঠাকুর গুরুর আদেশানুসারে পাথরখানা মাথায় করিয়া অগ্রদ্বীপে উপস্থিত হইলেন এবং দেববিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রতিদিন প্রকাশ্য পূজা করিতে লাগিলেন।"

এই দেবমূর্তি কিরূপে ধর্মপ্রাণ মহারাজের হস্তগত হইল, তৎসম্বন্ধে ওয়ার্ড সাহেব লিখিয়াছেন—

"এই বিগ্রহের (অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের) অধিকারী কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকট কলিকাতার রাজা নবকৃষ্ণ তিন লক্ষ টাকা পাইতেন ; সেই টাকা কৃষ্ণচন্দ্র শোধ করিতে না পারায় নবকৃষ্ণ এক সময়ে এই বিগ্রহ ক্রোক করেন।"

মহারাজ নবকৃষ্ণ দুইটি প্রকাণ্ড ঠাকুরবাড়ী নির্মাণ করান এবং দেববিগ্রহ-

গুলিকে নানাপ্রকার রত্নালঙ্কার ও সোনার বাসনকোসন প্রভৃতি দান করেন। সেই সমস্ত সম্পত্তির বর্তমান মূল্য চারি লক্ষ টাকার ন্যূন হইবে না। বর্তমান সময়েও এই দুইটি ঠাকুরবাড়ীর ন্যায় সুন্দর দেবালয় কলিকাতায় আর নাই।

জৈন সম্প্রদায়েরও স্বতন্ত্র দেবালয় আছে। মাণিকতলা ও হালসিবাগান রোডের বহির্ভাগে প্রসিদ্ধ জৈনমন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরসংলগ্ন ভূমি, সুন্দর সুন্দর পাদপচরণপথ, পুষ্পবৃক্ষ, নানাপ্রকার খোদিত মূর্তি, কৃত্রিম প্রস্রবণ, এবং ভোজন ও আমোদ-প্রমোদের নিমিত্ত নির্দিষ্ট রম্যভবনসমূহে সুশোভিত। মন্দিরটি দেখিতে অতি সুন্দর, উহার নির্মাণপ্রণালী অতি বিচিত্র। অধিকাংশ মাড়ওয়ারী জৈনসম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁহারা প্রতি বৎসর যেরূপ মিছিল সাজাইয়া বড়বাজারে যাইয়া থাকেন, সেরূপ নয়নমনোহর আড়ম্বরবিশিষ্ট মিছিল কলিকাতার রাস্তায় আর একটিও দেখিতে পাওয়া যায় না। পরেশনাথ, মহাবীর ও আদিনাথ—ইহারাই জৈনধর্মের প্রবর্তক ও সংস্কারক। জৈনগণ ইহাদের পূজা করিয়া থাকেন; তদ্ভিন্ন তাঁহারা তীর্থশঙ্কর বা জৈনগণেরও উপাসনা করেন। বৌদ্ধদিগের ন্যায় জৈনগণও প্রাণিহিংসা মহাপাপ বলিয়া জ্ঞান করেন। এজন্য তাহারা কলিকাতায় ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে কয়েকটি পিঁজরাপোল অর্থাৎ রুগ্ন পশুর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বাণিজ্যই এই সদাশয় সম্প্রদায়ের প্রধান অবলম্বন; বড়বাজারের মধ্যে ইহারাই সর্বাপেক্ষা ধনাঢ্য বণিক্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারা প্রধানতঃ কাপড় ও জহরতের কারবার করিয়া থাকেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপদেশ-প্রভাবে আর একটি নূতন ধর্ম-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। রামকৃষ্ণের শিষ্যেরা তাঁহাকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দই বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে ভাগীরথীর অপর পারে বেলুড় নামক স্থানে একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর এই স্থানে রামকৃষ্ণোৎসব নামে একটি মহোৎসব হইয়া থাকে; সেই সময়ে বহুসংখ্যক হিন্দু এই স্থানে সমবেত হন। এই সব সম্প্রদায়ের অনেকেই লোকহিতকর কার্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন।

কলিকাতা বদান্যতার জন্য প্রসিদ্ধ। পুরবাসিগণের এক-একজনের দান-শৌণ্ডতার বিষয় পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করা সহজ নয়। সেকালের ন্যায় একালেও দানধ্যানের কার্য সুস্পষ্ট দৃশ্যমান। নৌ-সেনাধ্যক্ষ ওয়াটসন সাহেবের চিকিৎসক ও বন্ধু, সদাশয় এডোয়ার্ড আইভিস্ তাঁহার সময়ে (১৭৫৬-৫৭ খ্রীঃ) কলিকাতায় বদান্যতার যেরূপ প্রাদুর্ভাব দেখিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন:

আমাদের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বসতিস্থানে যেরূপ উদারতার সহিত দানপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করা হইয়া থাকে, ভূমণ্ডলের আর কোনও অংশে যে সেরূপ হয়, ইহা নির্দেশ করা সম্ভবপর নয়। বহু দুঃস্থ পরিবারের প্রকৃত ক্লেশ বিমোচনের নিমিত্ত চাঁদা দ্বারা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রভূত অর্থ সংগৃহীত

হইয়া ঐ কার্যে নিয়োজিত হইয়াছে। এরূপ বিস্তর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে।"

কলিকাতায় যে বিবিধ লোকহিতকর দাতব্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে, আমরা এস্থলে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। এ পরিচয় যে নিতান্ত অসম্পূর্ণ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। সকলেই জানেন যে কলিকাতায় বহু ধর্মমন্দিরেই দরিদ্র-পোষণের রীতিমত ব্যবস্থা আছে। হিন্দু ও মুসলমান সমাজে প্রত্যেক ধর্মানুষ্ঠান উৎসবাদির পর কাঙ্গালীদিগকে ভোজন করান ও তাহাদিগকে অর্থসাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কলিকাতাবাসীদিগের এইরূপ একটা নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায় যে, কালসহকারে পূর্বভাবের পরিবর্তন হইয়াছে এবং কালিকাতাবাসীরা এক্ষণে অসহায় দীন দরিদ্র ও অনাথ আতুরদিগের দুঃখদুর্দশায় সম্পূর্ণ উদাসীন, তাঁহাদের দয়া-দাক্ষিণ্যের ভাব তিরোহিত হইয়াছে। এইরূপ নিন্দা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই যে, দরিদ্রদিগের প্রতি কলিকাতাবাসীদিগের সহানুভূতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা বড়ই সুখের বিষয় বলিতে হইবে। কয়েকটি প্রধান দাতব্য অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রকাশিত হইতেছে:

১। ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি (District Charitable Society)—বিশপ টার্ণার অপর কতকগুলি ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোকের সহযোগিতায় ১৮৩০ সালে লালবাজারে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার সহিত সংসৃষ্ট একটি আম্‌স্‌ হাউস (অন্নসত্র) কুষ্ঠাশ্রম আমহার্স্ট স্ট্রীটে আছে। ইহার অর্থ-ভাণ্ডারে গবর্ণমেণ্টে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুর এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন।

২। প্রেসিডেন্সি হাসপাতাল। হ্যামিণ্টন সাহেবের মতে ইহা ১৭০৯ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান প্রেসিডেন্সি জেলের দক্ষিণে ইহা অবস্থিত। এই স্থানে কেবল ইউরোপীয়েরাই চিকিৎসিত হইয়া থাকে।

৩। মেয়ো হাসপাতাল। ইহার আদি নাম নেটিভ হাসপাতাল। প্রধানতঃ পাদরি জন আওয়েন সাহেবের যত্নে ১৭৯২ সালের ৩ই সেপ্টেম্বরে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতার দেশীয় অধিবাসীরা, বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবীরা এইখানে চিকিৎসিত হইয়া থাকে। ইহার অর্থভাণ্ডারে রাজা বৈদ্যনাথ ৩০,০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। ইহা প্রথমে চিৎপুর রোডের উপর ছিল; তৎপরে ধর্মতলা রোডে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। এক্ষণে ইহা শহরের উত্তরাংশে স্ট্র্যাণ্ড রোডের উপর অবস্থিত। গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রথমে মাসিক ০০ টাকা ছিল, এবং সাধারণের নিকট হইতে ৫৪,০০০ হাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস ৩,০০৬ টাকা দিয়েছিলেন, কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্য ৪,৫০০ টাকা দিয়েছিলেন, এবং নবাব উজির ৩,০০০ টাকা দিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পরে বর্ধিত হইয়া মাসিক ২,০০০টাকা

নির্ধারিত হয়। ১৮৭১ সালে ইহাকে বর্ত্তমান স্থানে উঠাইয়া আনা স্থিরীকৃত হয়। তদনুসারে মেয়ো স্মৃতিভাণ্ডারের যে, ৫০,০০০ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল, তাহা হাসপাতালে প্রদত্ত হয়। তদবধি ইহা 'মেয়ো নেটিভ হাসপাতাল' নামে অভিহিত হয়। বাড়ী নির্ম্মাণার্থ ডিসুজা ১০,০০০ টাকা দান করেন, এবং ধর্ম্মতলার সম্পত্তির কিয়দংশ ৭৯,০০০ হাজার টাকায় বিক্রীত হয়। বাড়ীটি ত্রিতল; ইহাতে আউট ডোর রোগীদের জন্য (অর্থাৎ যে সকল রোগী হাসপাতালে থাকে না, কেবল-মাত্র আসিয়া ঔষধ লইয়া যায়, তাহাদের জন্য) কয়েকটি প্রকোষ্ঠ এবং রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসারের বাসভবন আছে। ধর্ম্মতলার পুরাতন হাসপাতালে একটি আউটডোর ডিস্পেনসারি রাখা হইয়াছিল। এই হাসপাতালের সহিত সংশ্লিষ্ট আর তিনটি ডিস্পেনসারি আছে,—একটি পার্ক স্ট্রীটে, দ্বিতীয়টি চিৎপুর রোডে, এবং তৃতীয়টি সুকিয়া স্ট্রীটে।

৪। মেডিকাল কলেজ হাসপাতাল। ইহা কলেজ স্ট্রীটে অবস্থিত। মার্ক্ইস অব ডালহাউসির শাসনকালে ১৮৪৮ সালে ইহা নির্মিত হয়। পুরাতন ও নূতন ফিভার হাসপাতালের টাকায়, লটারি কমিটির অর্থভাণ্ডারের উদ্বৃত্ত অর্থে, পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের এককালীন দানের ৫০,০০০ টাকায় এই হাসপাতাল নির্মিত হইয়াছিল। বাবু শ্যামাচরণ লাহার প্রদত্ত অর্থে হাসপাতালের উত্তর-পূর্বাংশে এক নূতন চক্ষু চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং মহানুভব দাতার নামানুসারে তাহার নামকরণ হইয়াছে। ইহুদী-দিগের চিকিৎসার নিমিত্ত মিসেস এজরা নাম্নী একটি ইহুদী মহিলার সম্পূর্ণ ব্যয়ে মূল হাসপাতাল বাড়ীর সংলগ্নভাবে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ নির্মিত হইয়াছে। কলিকাতার একটি বহুকালের অভাব দূর করিবার নিমিত্ত বাঙ্গলার ভূতপূর্ব ছোটলাট সার আশলি ইডেন স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের চিকিৎসার্থে ১৮৮২ সালের জুলাই মাসে ইডেন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই হাসপাতাল সম্বন্ধে জনৈক লেখক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন: "ইডেন হাসপাতাল অপেক্ষা, বোধ করি অধিকতর সর্বাঙ্গসুন্দর হাসপাতাল জগতে আর নাই।" ইহার আনুষঙ্গিক অট্টালিকাগুলির মধ্যে দুইজন হাসপাতালযাত্রীর জন্য দুইটি বৃহৎ বাসভবন আছে। কলুটোলায় বিখ্যাত শীলবংশের বদান্যতায় ইহার উপকারিতা সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; চুনীলাল শীলের আউট ডোর ডিস্পেন্সারি উক্ত মহানুভব দাতার বহু লোকহিতকর কার্যের একটি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।*

* কথিত আছে যে, যেদিন হিন্দু ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত মানবদেহ প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেন, সেই দিন ফোর্ট উইলিয়ামের দুর্গপ্রকার হইতে তাঁহার সম্মানার্থ তোপধ্বনি হইয়াছিল। মধুসূদনের চিত্রপট অদ্যাপি মেডিকেল

৫। ক্যাম্বেল হাসপাতাল। প্রথমে ইহার নাম ছিল 'পপার হাসপাতাল'। গবর্ণমেণ্ট এবং কলিকাতা মিউনিসিপালিটি ইহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন।

কলেজের শবব্যবচ্ছেদাগারে দেখিতে পাওয়া যায়। জে. ডবলিউ. কে. সাহেব লিখিয়াছেন:

"যখন লর্ড বেণ্টিঙ্ক প্রথম ভারতে পদার্পণ করিলেন, তখন বুদ্ধিমান ও বহুদর্শী লোকেরা মস্তক কম্পিত করিয়া বলিতে লাগিল, ভারতবাসীদিগের পক্ষে স্পর্শ ই যখন যৎপরোনাস্তি ঘৃণাজনক, তখন তাহাদিগকে ইউরোপীয় ছাত্রগণের ন্যায় শবব্যবচ্ছেদাগারে শারীর-বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে প্রবর্তিত করা অসাধ্য হইবে। পরন্তু তাঁহার যত্নে এ বিষয়টি পরীক্ষিত হইল। কেবল যে পরীক্ষিত হইল তাহা নহে, পরীক্ষায় সফলতা লাভ হইল। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইল এবং সর্বোচ্চজাতীয় হিন্দুরা শরীর-বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিল —মোম বা কাঠের আদর্শ হইতে নহে, প্রকৃত মানবদেহ হইতে। প্রারম্ভ খুব স্বল্পই হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহার ক্রমোন্নতি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। প্রথম বৎসরের হিসাব রাখা হইয়াছিল। ঐ বৎসরে ১৮৩৭ সালে—ছাত্রদের সমক্ষে ৬০টি শবদেহের ব্যবচ্ছেদ করা হয়। পর বৎসর ঐ সংখ্যা ঠিক দ্বিগুণিত হইয়াছিল। ১৮৪৪ সালে শবসংখ্যা পাঁচ শতেরও অধিক হইয়াছিল। কলেজটি অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়া উঠিল। দেশীয় যুবকদিগের ঔষধ-চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞানলাভের প্রবল বাসনা সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতে লাগিল।"

"১৮৪৪ অব্দে সেই সুশিক্ষিত ও বদান্য দেশীয় ভদ্রলোক দ্বারকানাথ ঠাকুর মেডিক্যাল কলেজের দুইজন ছাত্রকে নিজ ব্যয়ে ইংল্যাণ্ডে লইয়া যাইয়া তথায় তাহাদের শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ডাক্তার গুডীভ্ নিজব্যয়ে আর একটি ছাত্রকে লইয়া যাইতে চাহিলেন, এবং চতুর্থ আর একটিকে লইয়া যাইবার উপযুক্ত অর্থ লোকের নিকট হইতে চাঁদা করিয়া সংগ্রহ করিলেন। যে চারিজন ছাত্র অধ্যাপকের সহগামী হইয়া ৮ই মার্চ তারিখে বেণ্টিঙ্ক নামক ষ্টিমারে আরোহণ করেন, তাহাদের নাম, (১) ভোলানাথ বসু, ইনি লর্ড অকল্যাণ্ডের ব্যারাকপুর স্কুলের ভূতপূর্ব ছাত্র, লর্ড অকল্যাণ্ড ইঁহাকে পাঁচ বৎসর নিজ ব্যয়ে মেডিকেল কলেজে পড়াইয়াছিলেন, এবং গ্রিফিথ সাহেব ইঁহাকে কলেজের মধ্যে উদ্ভিদবিদ্যার সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র জ্ঞান করিতেন। (২) গোপালচন্দ্র শীল। (৩) দ্বারকানাথ বসু; ইনি একজন নেটিভ খ্রীষ্টান। পূর্বে জেনারেল এসেমবিলিজ ইনস্টিটিউসন নামক বিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলেন এবং কিছুদিন যাদুঘরে সহকারীর পদে কার্য করিয়াছিলেন। (৪) সূর্যকুমার চক্রবর্তী নামক কুমিল্লাবাসী একজন ব্রাহ্মণ: ইনি অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর ছাত্র কিন্তু সাতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও তেজস্বী।"

৬। আলবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল। প্রধানতঃ ডাক্তার আর. জি. কর এবং শহরের অপর কয়েকজন ডাক্তারের চেষ্টায় ১৫/১৬ বৎসর পূর্বে যে মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হয়, সেই স্কুল হইতে এই হাসপাতালের উদ্ভব। আলবার্ট-ভিক্টরের স্থায়ী-স্মৃতিচিহ্ন ভাণ্ডারের উদ্বৃত্ত অর্থ এই হাসপাতালের অর্থভাণ্ডারের সহিত মিলিত হইয়াছে।

৭। পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা-নিবারণী-সভা। (The Calcutta Society for the Prevention of Cruelty to Animals): দীর্ঘকাল হইতে কলিকাতায় এইরূপ একটা অনুষ্ঠানের অভাব অনুভূত হইয়া আসিতেছিল। লর্ড এলগিন ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির আদর্শে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে ১৮৬৯ অব্দে বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের যত্নে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণোদ্দেশে একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই সভার ব্যয় কতকটা সাধারণের চাঁদায় এবং কতকটা গবর্ণমেণ্টের অর্থ-সাহায্যদ্বারা নির্বাহিত হইয়া থাকে।

৮। কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়। প্রধানতঃ সিটি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথসিংহ ও শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মজুমদারের যত্নে এই পরম হিতকর বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহার অবস্থা এক্ষণে বেশ স্বচ্ছল; সার্কুলার রোডের উপর ইহার একটি সুন্দর অট্টালিকা হইয়াছে, এবং সরকারী বে-সরকারী সকল শ্রেণীর ভদ্রলোকেই এই শুভানুষ্ঠানে আন্তরিক সহানুভূতি ও যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন।

৯। রমণীদ্বারা ভারতীয় রমণীগণের চিকিৎসাবিধানার্থ জাতীয় সমাজ (National Association for supplying Female Medical Aid to the Women of India)—ভারতের ভূতপূর্ব প্রধান শাসনকর্তা লর্ড ডাফরিনের মহিষী এই মহদনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাত্রী। ভারতের সর্বত্রই ইহার বহু-শাখা আছে। ইহার কার্যপরিচালনভার একটি সেনট্রাল কমিটির হস্তে অর্পিত।

১০। জাতীয় সভা, বঙ্গশাখা (The National Association—Bengal Branch): ইউরোপীয় ও দেশীয়দিগের মধ্যে সামাজিক সংযোগ ও সদ্ভাবের বৃদ্ধি এবং সম্ভ্রান্ত বংশসমূহের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারই এই সভার উদ্দেশ্য। কুমারী মেরী কর্পেণ্টার উহার প্রতিষ্ঠাত্রী।

১১। ভারতীয় বিজ্ঞান-সভা (The Indian Association for the Cultivation of Science): এই সভা ১৮৭৬ সালে স্থাপিত. বৌবাজার স্ট্রীটে ইহার একটি অতি সুন্দর ও প্রশস্তায়তন বাড়ী আছে। ইহার উদ্ভব ও বর্তমান সমৃদ্ধি সমস্তই একমাত্র পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ঐকান্তিক যত্নের ফল। ইহার স্থাপনকালাবধি প্রত্যেক রাজপ্রতিনিধি ইহার পেট্রন (পৃষ্ঠপোষক) হইয়া আসিতেছেন, এবং বঙ্গের শাসনকর্তারা ও

অন্যান্য প্রধান প্রধান রাজপুরুষ সকলেই ইহার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন।

১২। শোভাবাজার হিতৈষী সমাজ (The Sovabazar Benevolent Society): ১৮৮৩-৮৪ অব্দে স্থাপিত। মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ইহার প্রথম পেট্রন ও পোষণকর্তা। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ইহার প্রতিষ্ঠাতা। জাতিধর্মনির্বিশেষে দরিদ্র ছাত্র, অসহায় বিধবা ও অনাথ আতুরদিগের অভাবমোচনই ইহার উদ্দেশ্য।

১৩। হিন্দু বিধবা সাহায্য সভা। মহারাজ বাহাদুর সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর হিন্দু বিধবাদিগের সাহায্যকল্পে তাঁহার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর নামে অর্থ-ভাণ্ডার উৎসর্গ করিয়া তাহা গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। এই পরম কল্যাণকর শুভানুষ্ঠানের কার্যভার গবর্ণমেণ্ট ও সদাশয় দাতার নিয়োজিত একটি কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে।

১৪। কলিকাতা অনাথাশ্রম: শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত কর্তৃক স্থাপিত। পরলোকগত রাজা দিগম্বর মিত্র বাহাদুরের পৌত্র উদারহৃদয় কুমার মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুরের সদয় যত্নে ইহার ভাণ্ডারে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে ও হইতেছে। উক্ত কুমার বাহাদুরের শ্লাঘ্য চেষ্টায় অচিরেই ইহার নিজের একটি বাড়ী হইবে।

এতদ্ভিন্ন অনাথবন্ধু-সমিতি, ভবানীপুর সাহায্য-সমিতি ও শহরের উত্তরাংশে ১নং ওয়ার্ডে পল্লী-সমিতি আছে ; এগুলিও দরিদ্র পোষণ ও আর্তত্রাণরূপ লোক-হিতকর কার্যদ্বারা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

এক্ষণে বিভিন্নশ্রেণীর বিদ্যাশিক্ষার অনুষ্ঠানসমূহ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ইংরেজ বণিক্-সম্প্রদায়, খ্রীষ্টান মিশনারীরা এবং অন্যান্য শিক্ষিত মহোদয়গণ এদেশে ইউরোপীয় আদর্শে বিদ্যাশিক্ষার প্রবর্তনা করিয়া ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যৎকালে কেবল সামান্য ব্যবসাদার মুসলমান বিধিব্যবস্থাদির শাসনাধীন ছিলেন, সে সময়ে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাঁহাদের যে তাদৃশ যত্ন চেষ্টা ছিল না, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। সে সময় খাস ইংলণ্ডেও বিদ্যাবিতরণের ভার জনসাধারণের এবং খ্রীষ্টীয় যাজক-সম্প্রদায়ের হস্তে ছিল। তৎকালে তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট জাতীয় শিক্ষাবিধান তাঁহাদের একটি অবশ্য কর্তব্য কর্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন না ; সুতরাং তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেও বড় ইচ্ছুক ছিলেন না।

মুসলমানদিগের রাজত্বকালে বিদ্যাশিক্ষার অনাদর ছিল না। সকল শ্রেণীর লোককেই আরবী, পারসী ও উর্দু ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত ; এই সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুরা বিদ্যানুরাগের জন্য প্রসিদ্ধ। হিন্দুস্থানে যে সাহিত্যের বিকাশ হইয়াছিল, কি সৌন্দর্যে, কি জ্ঞানের গভীরতায় কোনও জাতির সাহিত্যই তাহার সমকক্ষ

হইতে পারে নাই। বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যকালে বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা বহু প্রসিদ্ধ বিহারে অকাতরে ছাত্রগণকে বিদ্যা বিতরণ করিতেন। কথিত আছে যে, কোন কোন বিহারে পাঁচ হইতে দশ সহস্র ছাত্র থাকিয়া বিনাব্যয়ে আহার্য ও বাসস্থান পাইয়া বিদ্যালাভ করিত। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের টোল চতুষ্পাঠী পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। এই সকল স্থানে বাঙ্গলা ও সংস্কৃত উভয় ভাষার সাহায্যে অধ্যাপনা হয় এবং ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য, স্মৃতি, ন্যায়, জ্যোতিষ, বেদান্ত প্রভৃতি সকল বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই সকল বিদ্যালয়ের মধ্যে কোন কোনটির ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত স্থায়ী সম্পত্তি দেওয়া আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পূজা প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে দানের সাহায্যে ব্যয় নির্বাহ হয়। কোন কোন অধ্যাপক পণ্ডিত ধনাঢ্য হিন্দু ভদ্রসন্তানদিগের নিকট বার্ষিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন; এইরূপ বৃত্তিকে সাধারণতঃ কেবল 'বার্ষিক' বলা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ নিঃস্বার্থভাবে ছাত্রগণকে বিনামূল্যে কেবল বিদ্যা নহে, অধিকন্তু বাসস্থান, আহার্য ও কোন কোন স্থলে পরিচ্ছদ বিতরণ করিয়া যেরূপ ত্যাগস্বীকার করেন এবং তাঁহাদের শিষ্যগণও কেবল বিদ্যাশিক্ষার অনুরোধেই যেরূপ বিবিধ শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করেন, তাহা উভয় পক্ষেরই সবিশেষ শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই, এবং তাতে হিন্দুজাতির জ্ঞান-পিপাসার ও জ্ঞান-বিস্তারাকাঙ্ক্ষার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

কথিত আছে যে, বার্ষিক ২,৪০০ টাকা ব্যয়ে ২০টি দরিদ্র বালক-বালিকার ভরণপোষণের ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়য়াছিল; ইহাদিগকে ওল্ড কোর্ট হাউস বা টাউন হল নামক বাটীতে রাখিয়া খাইতে দেওয়া হইত। এই অর্থভাণ্ডার ১৭৩৪ সালে বা তৎসমকালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কেহ কেহ বলেন, বিখ্যাত কুঠিয়াল উমিচাঁদ এই ভাণ্ডারের সাহায্যকল্পে ৩০,০০০ টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু এবিষয়ে মতবিরোধ দৃষ্ট হয়। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্রুশিয়ার সাহেব কর্তৃপক্ষকে এই নিয়মে ওল্ড কোর্ট হাউস অর্পণ করেন যে, তাঁহারা একটি দাতব্য বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহার্থ বার্ষিক ৪,০০০ টাকা প্রদান করিবেন। ১৭৫৬ অব্দে মুরগণ ইংরেজদিগের গির্জা বিধ্বস্ত করিলে কোম্পানি তাহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যে অর্থ পাইয়াছিলেন, তাহাও এই ভাণ্ডারে প্রদান করিয়া ইহার পরিমাণ বর্ধিত করিয়া দেন।

যে যে উপায়ের অর্থে পুরাতন কলিকাতা দাতব্য ভাণ্ডার (Old Calcutta Charity Fund) সম্ভূত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইল:

১। ১৭৩২ সালের পূর্বে বা তৎসমকালে প্রথম যে চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল;

২। গির্জার সংগৃহীত অর্থ;

৩। পুরাতন গির্জা ধ্বংসের ক্ষতিপূরণস্বরূপ নবাব মিরজাফর আলি খাঁ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ। ইহার পরিমাণ অজ্ঞাত।

৪। স্বয়ং উমিচাঁদের প্রদত্ত, অথবা তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দত্ত-ধন-বিধাতার প্রদত্ত অর্থ। উমিচাঁদ কলিকাতায় ১৭৬০ সালে কালগ্রাসে পতিত হন। এই দানের পরিমাণ ও অন্যান্য বিশেষ বিশেষ বিবরণ অজ্ঞাত।

৫। লরেন্স কন্স্টান্টীয়স নামক জনৈক মৃত ধনবান পর্তুগীজের সম্পত্তির এক্সিকিউটার চার্লস ওয়েস্টন কর্তৃক ১৭৭৩-৮৪ অব্দে প্রদত্ত ৭,০০০ টাকা (বা তদপেক্ষা কিছু কম)

এতদ্ভিন্ন কোম্পানি মেয়র্স কোর্ট বা টাউন হল (পরে ওল্ড কোর্ট নামে অভিহিত) নামক বাড়ার ভাটক স্বরূপ মাসিক ৮০০.০০ টাকা এই অর্থ ভাণ্ডারে প্রদান করিতেন। উত্তরকালে ওল্ড কোর্ট হাউস যখন ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়, সেই সময়ে গবর্ণমেণ্ট চার্চ ওয়ার্ডেনদিগের (গির্জার কর্মচারীবিশেষ) নিকট স্বীকৃত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা ঐ ৮০০.০০ টাকা চিরকাল দিবেন। সম্ভবতঃ ওয়ার্ডেন ও চাপলেনগণ (খ্রীষ্টীয় রাজকোষবিশেষ) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই ফণ্ডের কার্য পরিচালনা করিতেন, কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ কর্তৃত্বভার কোম্পানির হস্তে ছিল। তৎকালে এই বিদ্যালয়ে লেকচার (উপদেশ) প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। ১৭৮৮ সালে ডাক্তার বেল দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে ধারাবাহিকরূপে কতকগুলি লেকচার প্রদান করেন। ১৭৯০ সালে এই ফণ্ডের অর্থপরিমাণ ২,৪৫,৮৯৭ প্রচলিত টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। এই সময় ফ্রী-স্কুল সোসাইটি ইহার সহিত মিলিত হয়। ফ্রী-স্কুলের ফণ্ডে ৫৮,০৬২ টাকা ছিল। উভয় ফণ্ড মিলিত হইয়া ১৭৯১ সালে ফ্রী-স্কুলের ফণ্ডে ৫৮,০৬২ টাকা ছিল। উভয় ফণ্ড মিলিত হইয়া ফ্রী-স্কুল নাম ধারণ করিল, এবং উহাদের মোট সম্পত্তি ৩০,৩,৯৫৯ টাকায় দাঁড়াইল। এস্থলে ফ্রী-স্কুল সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৭৮৯ সালের ২১ শে ডিসেম্বর ইহা স্থাপিত হয়। এই মহারাজধানীতে কিঞ্চিৎ বৃহদাকারে সাধারণের হিতকর কার্যের অনুষ্ঠান ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল. চুচুঁড়ার গবর্ণর মার্কুইস অব্ কর্ণওয়ালিস ইহার উদ্দেশ্যের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন।

১৭৮০ অব্দে বা তৎসমকালে মিস্টার হজেস নামক এক সাহেব আর্মানী গির্জার নিকট একটি গবর্ণমেণ্ট স্কুলের বিজ্ঞাপন দিয়া প্রচার করেন যে, তথায় পড়া, লেখা ও সূচিকর্ম শিক্ষা দেওয়া হইবে। আর এক ব্যক্তি চিৎপুর পোলের অপর দিকে একটি বোর্ডিং-স্কুলের বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তথায় পড়া, লেখা ও অঙ্ক শিক্ষা দেওয়া হয়; বেতন শিক্ষকের টেবিলে মাসিক ৫০.০০ টাকা, এবং স্বতন্ত্র টেবিলে মাসিক ৩০.০০ টাকা; একজন সহকারী না পাওয়া পর্যন্ত ১৪টির অধিক বালক লওয়া হইবে না। ১৭৮১ অব্দে গ্রিফিথ সাহেব বৈঠকখানার নিকট তাঁহার বাগানবাড়ীতে একটি বোর্ডিং স্কুল করেন; তথায় "তরুণবয়স্ক ভদ্রসন্তানদিগকে ভদ্রলোকের মত খাইতে দেওয়া হয়, তাহাদের

প্রতি কোমল ব্যবহার করা হয়, এবং তাহাদিগকে অতি শীঘ্র শীঘ্র শিক্ষা দেওয়া হয়।"

১৮৮০ সালে আর্চার সাহেব কেবল বালকদিগের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেন। তাহার উন্নতি দেখিয়া আরও অনেকে আসরে অবতীর্ণ হইল। সে কালের যে-সে লোকে স্কুল খুলিয়া বসিত। যাহারা খানসামা বা পাচুকার হইবার উপযুক্ত, তাহারাও স্কুল খুলিয়া অধ্যাপকের আসনে বসিয়া যাইত। এ সম্বন্ধে জনৈক লেখক লিখিয়াছেনঃ অকর্মণ্য সৈনিক, দেউলিয়া মহাজন, সর্বস্বান্ত মিতবায়ী সকলেই এই বৃত্তি অবলম্বন করিত। ইহাকে তাহারা উপার্জনের একটি সুন্দর পথ মনে করিত। কথিত আছে যে, অরিন্দম দাস নামক এক ব্যক্তি তাহার নিজ বাড়ীতে একটি স্কুল খুলিয়া বসিয়াছিল; তথায় কতকগুলি হিন্দু বালক প্রত্যহ যাতায়াত করিত এবং তাহার পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিবার আশায় তাহার সুযোগ-সুবিধার প্রতীক্ষায় কয়েক ঘণ্টা করিয়া বসিয়া থাকিত। এই ধর্মনিষ্ঠ দেশহিতৈষী ছাত্রদের পাঠের নিমিত্ত প্রতিদিন পাঁচ ছয়টি কথা বলিয়া দিত।"

কথিত আছে যে, ১৭৭৩-৭৪ সালে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইলে ইংরাজী শিক্ষার ক্রমেই প্রচার হইতে লাগিল। রামরাম মিশ্র নামক এক ব্যক্তি এবং তাঁহার ছাত্র রামনারায়ণ মিশ্র—এই দুইজন ইংরেজী বিদ্যায় সুপণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত হইতেন। রামরাম মিশ্র একটি স্কুল খুলিয়াছিলেন; তাহাতে কতকগুলি হিন্দু ছাত্র শিক্ষালাভ করিত; বেতন ৪'০০ টাকা হইতে ১৬'০০ টাকা পর্যন্ত ছিল। ইহার পূর্বে মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর এবং স্বনামখ্যাত সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের জনৈক পূর্বপুরুষ বাবু নীলমণি দত্ত—এই দুইজন বাঙালী ইংরেজী জানিতেন; পরন্তু তাঁহারা কি উপায়ে এ ভাষা শিখিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। বোধ হয় মহারাজ ওয়ারেন্ হেস্টিংসের নিকট ইংরেজী শিখিয়া থাকিবেন, কারণ তিনি আবার সাহেবকে পারসী ও বাঙ্গলা পড়াইতেন।

সে সময়ে আর্চার সাহেবের স্কুলই একমাত্র ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল না; ক্যারেল্‌স্ সেমিনারী এবং ধর্মতলা একাডেমি উহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। প্রায় এই সময়ে হ্যালিফাক্স, লিন্‌স্টেড ও ড্রাপার—এই তিনজন সাহেবও তিনটি স্কুল স্থাপন করেন। এই সমস্ত স্কুলে মোটামুটি রকমের ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হইত; কোন কোন স্কুলে নাবিক-বিদ্যা ও সাহেবী দোকানের খাতাপত্র রাখার কৌশলও শিখান হইত। এই সকল বিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র ড্রামণ্ড সাহেব স্বয়ং লিখিয়াছেন: "তিনিই প্রথমে ধর্মতলা স্কুলে গ্রামার (ইংরেজী ব্যাকরণ) ও গ্লোবের ব্যবহার প্রবর্তিত করেন।......বস্তুতঃ সে সময়ে লোকে পড়া, লেখা ও অঙ্ক ভিন্ন অন্য উচ্চ শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা রাখিত না।" ড্রামণ্ড সাহেব শিক্ষার পরিমাণ বর্ধিত করিতে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেকালে তিনিই নিজের

স্কুলে ইংরাজী সাহিত্য ও লাটিন শিক্ষার প্রথা প্রবর্তিত করেন। যে ডিরোজিও উত্তরকালে হিন্দু কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হইয়াছিলেন, সেই ডিরোজিও বাল্যকালে এই স্কুলে প্রথম শিক্ষা লাভ করেন। ড্রামণ্ড সাহেবের যত্নেই বার্ষিক পরীক্ষার প্রথা প্রবর্তিত হয়। এ কালের ন্যায় সেকালেও পরীক্ষাটা বালকদের একটা বৃহৎ ব্যাপারে ছিল। সে দিবস তাহাদের একটা বিষম বিভীষিকা ও মহা আনন্দের দিন হইত; একদিকে পরাজয়ের অনুত্তীর্ণ হইবার আশঙ্কা যেমন ভয়ের কারণ হইত, অপর দিকে তেমনি প্রাইজ পাইবার অনিশ্চিত আশা ও আনন্দময় ছুটি পাইবার নিশ্চিত আশা তাহাদিগকে আহ্লাদে অধীর করিয়া তুলিত।

কীর্ন্যাণ্ডার সাহেবের মিশন স্কুলের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ক্যানিঙ সাহেবের এক স্কুল ছিল; তথায় পরলোকগত রাজা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। শেরবর্ণ সাহেবের স্কুলেই দ্বারকানাথ ঠাকুর শিক্ষিত হইয়াছিলেন। ভবানীপুরে ইউনিয়ন স্কুলেই হিন্দুপেট্রিয়টের সুপ্রসিদ্ধ ও সুযোগ্য সম্পাদক স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র পাথুরিয়াঘাটার ক্ষেম বসুর স্কুলের ছাত্র ছিলেন। মোহন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু, ভুবন দত্ত, শিবু দত্ত, আরাটুন পিটার্স ও অন্যান্য লোকের অধীনে কতকগুলি স্কুল ছিল। রামমোহন রায়ও মাণিকতলা স্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান একাডেমি নামে একটি স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন; উহাকে সাধারণ লোকে রামমোহন রায়ের হিন্দুস্কুল বলিত। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক বেসরকারী স্কুল ছিল; তন্মধ্যে কতকগুলির নাম নিম্নে লিখিত হইল:

ইণ্ডিয়ান ফ্রি-স্কুল	··· প্রাতকালে	১২৫	জন ছাত্র
শীলস্ ফ্রি কলেজ	··· দিবাভাগে	৩০০	"
পেট্রিয়টিক কলেজ	·· "	১১০	"
ওরিএণ্টাল সেমিনারি	···(১৮২৩ খ্রী:)	৫৮৫	"
আংলো ইণ্ডিয়ান স্কুল	··· প্রাতকালে	১০০	"
ইউনিয়ন স্কুল (১৭৩ খ্রী:)	··· দিবাভাগে	১৮০	"
হিন্দু বেনেভলেণ্ট ইন্স্টিটিউশন	··· দিবাভাগে	১০০	"
লিটারারি সেমিনারি	··· "	৫০	"
চ্যারিটেবল মর্ণিং স্কুল	··· প্রাতঃকালে	৮০	"

এই সকল বিদ্যালয়ের মধ্যে ওরিএণ্টাল সেমিনারি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত, সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গলা-লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত, খ্যাতনামা ব্যারিস্টার ডবলিউ. সি. ব্যানার্জী প্রভৃতি বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভদ্রলোক প্রথমে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বাবু গৌরমোহন আঢ্য এই স্কুল স্থাপন করেন; এইজন্য ইহাকে সাধারণতঃ,

গৌরমোহন আড্ডির স্কুল বলিত। তাঁহার সম্বন্ধে একজন লেখক কলিকাতা রিভিউ পত্রে এইরূপ লিখিয়াছেন :

"সপ্তবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি উপার্জনের অন্য কোন সুবিধাজনক পথ না দেখিয়া স্বদেশীয়দিগের নিমিত্ত একটি স্কুল স্থাপন করিলেন এবং কয়েক বৎসর অবিচলিত অধ্যবসায়ের সহিত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহার ছাত্রসংখ্যা যখন প্রায় ২০০ হইয়া উঠিল, সেই সময়ে তিনি টর্ণবুল নামক এক সাহেবকে অংশী করিয়া লইলেন। ইহার পর ক্রমশঃই তাঁহার স্কুলের উন্নতি হইতে লাগিল; তাঁহার অংশীর মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার নিজ মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি অতি দক্ষতার সহিত নিজ তত্ত্বাবধানে স্কুলের কার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি হামান জিওফ্রি নামক একজন দুঃস্থ ব্যারিস্টার প্রাপ্ত হন; সেই ব্যারিস্টারের উৎকৃষ্ট শিক্ষায় গৌরমোহনের স্কুল বিলক্ষন প্রাধান্য লাভ করিল। গৌরমোহনকে দেখিলেই ধর্মভীরু বলিয়া বোধ হইত; তিনি এরূপ সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন যে, তিনি প্রথম শ্রেণীর বালকদিগকে অকপটে বলিয়া ফেলিতেন যে, আমি তোমাদিগকে পড়াইতে পারি না। বৃথা অভিমানের লেশমাত্র তাঁহাতে ছিল না। যাহা তিনি জানিতেন, তাহা অন্য সমস্ত দেশীয় শিক্ষক অপেক্ষা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। তিনি অতি মৃদু-স্বভাব সম্পন্ন ছিলেন; আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নানাপ্রকার স্বভাব ও মেজাজের লোকের সহিত তাঁহাকে কাজকারবার করিতে হইলেও তিনি অতি সুকৌশলে আপনার কার্য সম্পন্ন করিতেন, তিনি কখনও কাহারও বিরাগভাজন হন নাই। তিনি ছাত্রমণ্ডলীর অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন; আর যদিও তিনি নিয়মানুগামিতা ও বশবর্তিতা সম্বন্ধে কঠোর শাসনপ্রণালী করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না এবং যদিও তাঁহাকে এমন অনেক স্বেচ্ছাচারী অবলম্বী বালককে লইয়া চলিতে হইত, যাহাদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি তাহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কিন্তু তথাপি তিনি সকলেরই সম্মানভাজন ও অনেকের প্রণয়াস্পদ হইয়াছিলেন।"

এস্থলে শীল্‌স্ ফ্রী কলেজ সম্বন্ধেও দুই চারি কথা না বলিয়া থাকা যায় না। সদাশয় মতিলাল শীলের বদান্যতা হইতে এই বিদ্যালয়ের উদ্ভব। কলিকাতার মধ্যে একটিমাত্র বিদ্যালয়ে দেশীয় দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কোন কোন বালক বিনাব্যয়ে আহার্যও প্রাপ্ত হয়। মতিলাল শীল অতি হীনাবস্থা হইতে প্রচুর বিভবশালী হইয়াছিলেন। তিনি ধর্মপরায়ণতা ও অকুণ্ঠিত দানশীলতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় উদারহৃদয় বিশ্বপ্রেমিক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনিই কলুটোলার বিখ্যাত শীলবংশের আদি পুরুষ।

কলিকাতায় বিদ্যালয় সংস্থাপনে ব্যক্তিবিশেষ কিরূপ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, আমরা এতক্ষণ তাহারই কথা বলিলাম। অতঃপর এতৎপক্ষে মিশনারি ও

অন্যান্য সম্প্রদায় এবং রাজপুরুষেরা কিরূপ উদ্যমশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারি কথা বলিতে চেষ্টা করিব। এ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে সর্বপ্রথমে "মহাপাঠশালা" বা কলিকাতার "হিন্দু কলেজ" নামক বিদ্যালয়ের নামোল্লেখ করা আবশ্যক। হিন্দুসন্তানগণের উচ্চশিক্ষার নিমিত্ত একটি বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা ও তাহার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে ১৮১৬ সালের ৪ঠা মে * তারিখে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার ঈ. হাইড্ ঈষ্ট মহোদয়ের ভবনে সম্ভ্রান্ত হিন্দুদিগের একটি আনুষ্ঠানিক সভার অধিবেশন হয়। প্রধান বিচারপতি সভার কার্য আরম্ভ করিবার সময়ে মুখবন্ধে এইরূপ বিদ্যালয়ের উপকারিতা সবিস্তারে বর্ণন করিয়া শ্রোতৃবর্গকে ঐ বিষয়ে উৎসাহশীল হইতে অনুরোধ করেন। তাঁহার প্রস্তাব উপস্থিত হিন্দু-ভদ্রলোকগণ এবং বিখ্যাত পণ্ডিতগণ অন্তরের সহিত সমর্থন করিলে, সেই সভাতে ৬,০০০ পাউণ্ডের উপর চাঁদা স্বাক্ষরিত হয়।

ঐ সভায় ডব্‌লিউ. সি. ব্ল্যাকিয়ার এবং জে. ডব্‌লিউ. ক্রফট্ নামক দুইজন সাহেব চাঁদার টাকা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত অস্থায়ী ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। অতঃপর ২১শে তারিখে একটি প্রকাশ্য সভার অধিবেশন হয়; তাহাতে গভর্ণর জেনারেল ও তাঁহার সদস্যগণ পেট্রন, প্রধান বিচারপতি সার ঈ. হাইড ঈষ্ট সভাপতি, সদর দেওয়ানি ও নিজামত আদালতের প্রধান বিচারক জে. এইচ্. হ্যারিংটন সহ-সভাপতি, এবং আটজন ইউরোপীয় সাহেব, পাঁচজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও অপর পনর জন দেশীয় ভদ্রোলোক কমিটির মেম্বর নিযুক্ত হন। ২৭শে তারিখে ঐ কমিটির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে জোসেফ ব্যারেটো স্থায়ী ধনাধ্যক্ষ ও লেফটেনাণ্ট ফ্রান্সিস আর্ভাইন ইংরেজী সেক্রেটারী এবং দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় * ইংরেজী সেক্রেটারীকে সাহায্য করিবার জন্য দেশীয় সেক্রেটারী নিযুক্ত হন এবং কলেজবাড়ীর উপযুক্ত স্থানসংগ্রহ ও আপাততঃ বিদ্যালয় বসাইবার জন্য একটি অস্থায়ী বাটী সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত ডবলিউ সি. ব্ল্যাকিয়ার, রামগোপাল মল্লিক, গোপীমোহন দেব ও হরিমোহন ঠাকুর— এই কয়েকজনকে লইয়া একটি সাব কমিটি গঠিত হয়। এই সভায় বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য এইরূপ প্রচারিত হইয়াছিল: "সম্ভ্রান্ত হিন্দুসন্তানগণকে ইংরেজী ও

* কেহ কেহ বলেন ১৪ই মে। কিন্তু রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর বলেন, তিনি পরলোকগত রাজা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের আলমারিতে উক্ত সভার কার্যবিবরণের যে অনুলিপি দেখিয়াছেন, তাহাতে ৪ঠা মে তারিখ আছে; রাজা রাধাকান্ত হিন্দু-কলেজের গভর্ণর এবং তাঁহার পিতা উহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

* ইহারই পৌত্র সুপ্রসিদ্ধ উকিল অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিছুদিন হাইকোর্টের জর্জ হইয়াছিলেন।

দেশীয় ভাষা এবং ইউরোপের সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়াই এই বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য।" পরবর্তী ১১ই জুন তারিখে কমিটির ইংরেজ মেম্বরগণ তাঁহাদের 'ভোট' দিবার অধিকার পরিত্যাগ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন, এবং সভাপতি ও সহকারী সভাপতিও ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, অতঃপর, তাঁহারা যেন বিদ্যালয়ের বেসরকারী মিত্র বলিয়া বিবেচিত হন। এ পর্যন্ত কমিটির সমস্ত অধিবেশনই প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হইয়াছিল। বোধ হয় পাঠকগণের কৌতূহলনিবৃত্তির নিমিত্ত শিক্ষকগণের নাম এবং তাঁহাদের বেতনের পরিমাণ এস্থলে উল্লেখ করিলে অসঙ্গত হইবে না ঃ

নাম	বেতন
জেম্‌স্ আইজ্যাক ডি আন্‌সেল্‌ম্, ইংরেজী বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার	টাকা ২০০'০০ মাসিক এবং কার্যে যোগ দিলে সাজ-সজ্জা বলিয়া ১০০'০০ টাকা।
নিকোলাস উইলাড, শিক্ষক	„ ৩৬'০০
পিটার এম্‌বিয়ার, শিক্ষক	„ ৩৬'০০
হেনরি ওয়ার্ড, শিক্ষক	„ ১৬'০০
মৌলবী মহম্মদ এ. বক্‌সি, পারসী শিক্ষক	

এতদ্ভিন্ন সেক্রেটারী স্বরূপে লেফটেনান্ট ফ্রান্সিস্ আর্ভাইনের মাসিক বেতন ০০'০০ টাকা এবং নেটিভ সেক্রেটারী, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও এ্যাকাউন্‌ট্যণ্টে স্বরূপ দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের বেতন মাসিক ১০০্ টাকা ছিল।

১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারি সোমবার বাবু গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ীতে হিন্দুকলেজ প্রথম খোলা হয়; বাড়ীর জন্য মাসিক ৮০'০০ টাকা ভাড়া দিতে হইত। বাবু হরনাথ কুমার তাঁহার চিৎপুরের বাড়ী কমিটির হস্তে অর্পণ করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় বাড়ীভাড়া করিতে হইয়াছিল। ডেভিড হেয়ার ও হোরেস হেম্যান উইলসন প্রভৃতি বহু ভদ্রলোকই এই বিদ্যালয়ের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও যত্ন প্রদর্শন করিতেন। ডেভিড হেয়ার ভারতবাসী-দিগের অবস্থার উৎকর্ষবিধানের নিমিত্ত যে সকল মহৎ কার্য করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাম যথাযোগ্যরূপেই সমাদৃত ও সম্মানিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি গবর্ণমেণ্টের হস্তে নিজের যে ভূমি দান করিয়াছিলেন, তাহারই উপর হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজের বাড়ী ১,২৪,০০০ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়। কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ যখন স্থাপিত হয়, তখন লোকের অনুরাগ আকর্ষণ করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিবার নিমিত্ত উহাকে অনেক সংগ্রাম করিতে ও বিস্তর বেগ

পাইতে হইয়াছিল ; সেই বিপদের দিনে ডেভিড হেয়ার উহাকে প্রকৃত কার্যকর ও জনপ্রিয় করিবার নিমিত্ত যেরূপ অসামান্য শ্রমস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতঃ সবিশেষ শ্লাঘার বিষয়। শিক্ষিত লোক বলিলে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, ডেভিড হেয়ার সে অর্থে শিক্ষিত লোক নাও হইতে পারেন, কিন্তু শিক্ষাবিষয়ে তাঁহার যে ঐকান্তিক আগ্রহ দৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রাচ্য ভূখণ্ডে প্রতীচ্য শিক্ষা-বিস্তারের যেরূপ উদার ভাব তিনি পোষণ করিতেন, তাঁহাতে তাঁহাকে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষাব্যবসায়ী বলা যাইতে পারে। ডেভিড হেয়ার হিন্দু-কলেজের জন্য যাহা করিয়াছেন, কি ইউরোপীয় কি দেশীয়, আর কোনও ব্যক্তি তাহা করিয়াছেন কি না সন্দেহ। তিনি আবার একজন মহান্ বিশ্বপ্রেমিক ও দরিদ্রসুহৃদ্ ছিলেন। তিনি ঘড়ির ব্যবসায় অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্যে ১৮০০ সালে কলিকাতায় আগমন করেন, এবং কতিপয় বৎসর ঐ কর্মে নিযুক্ত থাকার পর তাহা পরিত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি আপনার সমস্ত সময় ও অর্থ দেশীয়দিগের শিক্ষাবিধানে উৎসর্গ করেন। তৎকালে দেশের মঙ্গলার্থ যে কোনওরূপ কার্য বা আন্দোলনের অনুষ্ঠান হইত, তাহাতেই তিনি কায়মনোবাক্যে যোগ দিতেন। কেবল শিক্ষা কেন, দেশহিতকর সর্ববিধ কার্যেই তাঁহাকে ব্যাপৃত দেখিতে পাওয়া যাইত। এদেশে দেওয়ানি আদালতে জুরিপ্রথার প্রবর্তন ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার নিমিত্ত তাঁহার ঐকান্তিক ঔৎসুক্য ও আগ্রহ এবং কুলি ব্যবসারের বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন ও তাঁহার প্রতিবন্ধকতা, এগুলি তাঁহার বহুমুখী-ক্রিয়াশীলতার যৎসামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া নামক ইংরেজী সংবাদপত্র তাঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রচার করিবার সময়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহার একবর্ণও অসত্য বা অতিরঞ্জিত নহে। তাহাতে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল : "পরলোকগত ডেভিড হেয়ার যেরূপ অশ্রুতপূর্বভাবে জীবন যাপন করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া গিয়াছেন, ভারতে অন্য কোনও ব্যক্তিই এ পর্যন্ত তাহা পারেন নাই। * * * * * * * * * শিক্ষা সংস্কারবিহীন, বিদ্যাবুদ্ধিহীন, উচ্চপদ, ক্ষমতা ও ধনবিরহিত ডেভিড হেয়ার ভারতীয় বালক ও যুবকদিগের উন্নতিসাধনার্থ অবিরাম চেষ্টা দ্বারা দেশীয় সমাজে একাদিক্রমে বহু বৎসর যাবৎ প্রভাব ও মর্যাদা অর্জন ও রক্ষা করিয়া যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভারতে অদ্বিতীয় এবং অন্য দেশেও বিরল।" হেয়ার ১৮৪২ সালের ১লা জুন কলেবর পরিত্যাগ করিলে এক টাকা করিয়া চাঁদা তুলিয়া একটি সমাধি-স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছিল, তাহাতে যে ক্ষোদিত লিপি মণ্ডিত আছে, তাহার মর্ম এইরূপ—

"স্কটল্যাণ্ড ইঁহার জন্মভূমি ; ইনি ১৮০০ সালে এই নগরে আগমন করেন, এবং ঘড়ি নির্মাতার ব্যবসায়ে সচ্ছলভাবে চলিবার মত অর্থ উপার্জন করার পর ১৮৪২ সালে ১লা জুন ৬৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। ইনি এই বিদেশকেই নিজের দেশ করিয়া লইয়াছিলেন, এবং ইঁহার একমাত্র অতিপ্রিয়

উদ্দেশ্য সাধনে, অর্থাৎ বঙ্গবাসীদিগের শিক্ষা ও নৈতিক উন্নতিবিধানে, অক্লান্ত আগ্রহ ও হিতৈষণার সহিত আপনার জীবনের অবশিষ্টকাল সানন্দে নিয়োজিত করিয়াছিলেন ; এজন্য সহস্র সহস্র বঙ্গবাসী ইঁহার জীবিতকালে ইঁহাকে পিতার ন্যায় ভালবাসিত ও ভক্তি করিত এবং ইঁহার মরণেও আপনাদের সর্বোৎকৃষ্ট ও নিঃস্বার্থ বন্ধু বলিয়া শোক প্রকাশ করিতেছে।"

ডেভিড হেয়ারের সম্মানার্থ তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিবার উপায় নির্ধারণ করিবার জন্য ১৮৪১ সালে ১৭ই জুন তারিখে কাশিমবাজারের বর্তমান মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পূর্বপুরুষ (মাতুল) পরলোকগত রাজা কৃষ্ণনাথ রায়ের যত্নে মেডিকাল কলেজের বাড়ীতে হিন্দুসমাজের এক সাধারণ সভা আহূত হয়। তাহাতে স্থির হয় যে, হেয়ারের একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি স্থাপিত হয়, তাহা এক্ষণে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও হেয়ার স্কুল এতদুভয়ের মধ্যস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পাদদেশে যে লিপি খোদিত আছে, তাহার মর্মার্থ এইরূপ :

"ডেভিড হেয়ারের সম্মানার্থ : তিনি অবচলিত শ্রমশীলতা দ্বারা সচ্ছলভাবে চলিবার যথেষ্ট ধন উপার্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু যে বিদেশকে তিনি স্বদেশ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার শুভ-সংবর্ধনোদ্দেশ্যে সে ধন উপভোগ করিবার নিমিত্ত জন্মভূমিতে প্রত্যাগত হইবার আশা সানন্দে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।"

পরলোকগত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে হেয়ার-বার্ষিক-উৎসব-কমিটি গঠিত হইয়াছে ; প্রথম অবস্থায় তিনি নিজে উহার সেক্রেটারী এবং পরলোকগত পাদরি ডাক্তার কে. এম. বন্দ্যোপাধ্যায় উহার সম্পাদক হন। হেয়ারের মৃত্যুর দিবসে ভারতবাসীদিগের মানসিক বা নৈতিক উন্নতি সম্পর্কীয় কোনও বিশেষ বিষয়ে প্রতিবৎসর বক্তৃতা প্রদত্ত বা প্রবন্ধ পঠিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন বাঙ্গলা ভাষায় উৎসাহবর্ধনার্থ "হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড" নামে একটি অর্থ-ভাণ্ডারও সংস্থাপিত হইয়াছে।

হিন্দু-কলেজের পরবর্তী ইতিহাস সম্বন্ধে অধিক কথা না বলিলেও চলে। ১৮২৫ সালে হিন্দু-কলেজের বাটী নির্মাণ সমাপ্ত হয় ; কিন্তু যাঁহারা এই ফণ্ডের ধনাধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন, সেই জোসেফ ব্যারেটো এণ্ড সন্স নামক কোম্পানি 'ফেল' হওয়ায় অর্থাৎ দেউলিয়া পড়ায় তাঁহাদের হস্তে কলেজের যে কিছু অর্থ-সঙ্গতি ছিল, সমস্তই লয়প্রাপ্ত হয়। তখন 'ম্যানেজিং কমিটি' গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলে গবর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ মুক্তহস্তে অগ্রসর হইলেন এবং এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, অতঃপর গবর্ণমেণ্টের সাধারণ-শিক্ষা-কমিটি হিন্দু কলেজের পরিচালনার তত্ত্বাবধান করিবেন। গবর্ণমেণ্টের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে মেম্বরদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। অবশেষে বিবদমান পক্ষদ্বয় ডাক্তার এইচ. এইচ. উইলসন * ও ডেভিড হেয়ারকে স্ব স্ব প্রতিনিধি

* অধ্যাপক উইলসনের বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শিতা ও নানা গুণের পক্ষপাতী

নিযুক্ত করিলে এই বিষয়ের সুমীমাংসা হইয়া যায়। ইহারই সমকালে রাজা বৈদ্যনাথ, কান্তবাবুর পুত্র হরিনাথ রায়, এবং কালীশঙ্কর ঘোষাল যথাক্রমে ৫০,০০০, ২০,০০০ ও ২০,০০০ হাজার টাকা দান করেন। ছাত্রেরা যাহাতে অকালে বিদ্যালয় পরিত্যাগ না করিয়া দীর্ঘকাল বিদ্যালোচনা করিতে প্রবর্তিত হয়, এই উদ্দেশ্যে বৃত্তি স্থাপনার্থ ঐ অর্থ বিনিয়োজিত হইয়াছে। পুরাতন হিন্দু-কলেজ বর্তমান সময়ে হিন্দু স্কুল নামে পরিচিত হইয়া এক্ষণে খাস গবর্ণমেণ্টের স্কুল হইয়াছে।

হেয়ার স্কুল: ডেভিড হেয়ারের পবিত্র নাম স্মরণার্থ এই বিদ্যালয়ের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহাও গবর্ণমেণ্টের স্কুল।

লা মার্টিনিয়ার কলেজ: জেনারেল মার্টিন কর্তৃক স্থাপিত; তিনি খ্রীষ্টান-দিগের নিমিত্ত একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য দুই লক্ষ টাকা দিয়া যান এবং তাহার স্থায়িত্বের জন্য আরও দেড় লক্ষ টাকা দান করেন। কলেজটিতে দুইটি বিভাগ আছে; একটি বালকদিগের জন্য এবং অপরটি বালিকাদের জন্য। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংসৃষ্ট এবং ইহাতে বি. এ. পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা আছে।

ক্লড মার্টিনের জন্মস্থান ফ্রান্সের অন্তর্গত লিয়ঁ নগর। তিনি ভারতে কাউণ্ট লালির অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেনা-

সংক্ষিপ্ত পরিচয়টি সত্য সত্যই অতিরঞ্জিত নহে। যিনি ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তিনি উক্ত অধ্যাপক হইতে অনেক গুরুতর বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন-প্রকৃতি ছিলেন, এবং উভয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বও ছিল না যাহার জন্য তিনি অত্যুক্তি করিবেন। তিনি বলেন: "বোধ হয়, সুপ্রসিদ্ধ ক্রাইটনের সময়ের পর এ পর্যন্ত কোনও ব্যক্তিই একাধারে এরূপ বিবিধ, সঠিক ও আপাতদৃষ্টির বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান বহু গুণ ও বিদ্যার অধিকারী হইতে পারেন নাই। তিনি একদিকে যেমন প্রগাঢ় সংস্কৃত পণ্ডিত, বৈয়াকরণ, দার্শনিক ও কবি ছিলেন, অপরদিকে তেমনই সমাজের জীবন স্বরূপ ও মার্জিতবুদ্ধি প্রকৃত কাজের লোক ছিলেন। স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত অভিনেতারূপে রঙ্গমঞ্চেই হউক, আর আমাদের সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচ্যভাষা বিশারদরূপে অধ্যাপকের আসনেই হউক, সর্বত্রই তিনি আপনার কায যথাযথরূপে সম্পন্ন করিতেন। তিনি হিন্দুস্থানের পুরাতত্ত্ব, মুদ্রাতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য, ঐতিহাসিক কালনিরূপণ, মানবতত্ত্ব, সকল বিষয়েই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; আর এই সকল বিষয়ে স্বয়ং কোলব্রুকও এত অধিক ও এরূপ উৎকৃষ্ট রচনা করিতে পারেন নাই। তাঁহার গ্রন্থসমূহে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়; তাহাতে অনুচিত গুরুগাম্ভীর্য, গর্ব বা অহমিকার লেশমাত্র নাই। আর তাঁহার ভাষাও সকলের ভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুশিক্ষিত ইংরেজ ভদ্রলোকের ভাষা।"

বেলভেডিয়ার
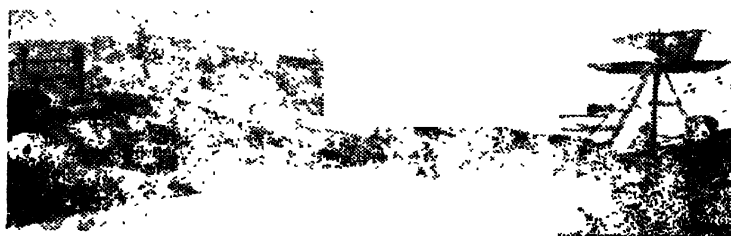
গঙ্গার ঘাট

নববিধান ব্রাহ্মসমাজ মন্দির

পুরোন আদালত
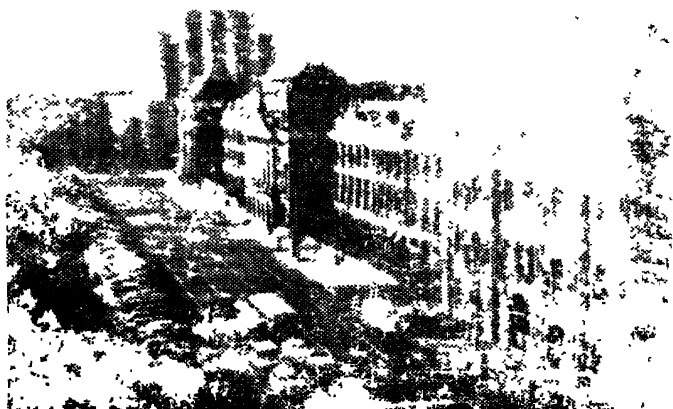
রাইটার্স বিল্ডিংস
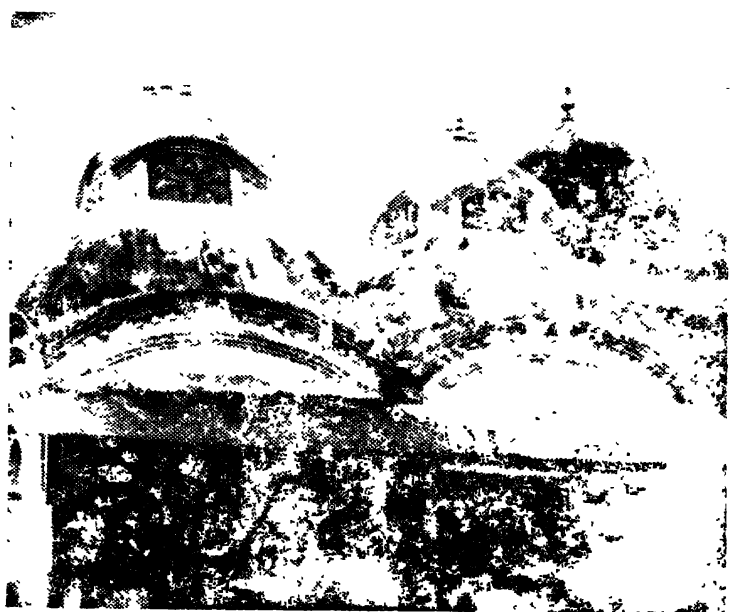
কালীঘাট মন্দিরের ভিতর শিব মন্দির

ওলডকোর্ট স্ট্রীট—১৭৮৬
ড্যানিয়েলের আঁকা

চৌরঙ্গী রোডের একাংশ—১৮৪৮

কোর্ট হাউস স্ট্রীটের দৃশ্য—১৮৪৮

চীৎপুর রোডে বাজার—১৮৪৮

কলকাতার রাস্তা

ওয়াটসের সঙ্গে চুক্তিস্বাক্ষরের পর মীরজাফর এবং মীরণ

দলে প্রবিষ্ট হন, এবং ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া মেজর জেনারেলের পদ লাভ করেন। এই বিদ্যালয়টি ১৮৩৬ সালের ১লা মার্চ খোলা হয়, এবং জেনারেল মার্টিনের উইলের অভিপ্রায়ানুসারে ইহার নাম 'লা মার্টিনিয়ার' রাখা হয়।

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ: ইহার অবস্থিতিস্থান ১০ ও ১১ নং পার্ক স্ট্রীট; যিশুসমাজের (The Society of Jesus) লোকেরা ইহা স্থাপন করেন। ১৮৩৪ সালে পোপ ইহাদিগকে কলিকাতায় খ্রীষ্টধর্মের পক্ষসমর্থন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ দুইজন নগরবাসীর বদান্যতা হইতে এই বিদ্যালয়ের উদ্ভব; ইঁহাদের মধ্যে একজন কলেজের জন্য আপনার বাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এবং অপর ব্যক্তি ইহার ব্যয়নির্বাহার্থ বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। বর্তমান বাড়িটি প্রথমে একটি থিয়েটারের জন্য নির্মিত হইয়াছিল। ১৮৪৪ সালে পাদরি ক্যারু সাহেব ইহা ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। তৎকালে ইহার নাম সেণ্ট জন্‌স্ কলেজ ছিল; পরে বেলজিয়ানের জেস্যুটদিগের আগমনাবধি ইহার বর্তমান নাম এবং ইহার কার্যপরিচালনের অধিকতর সুব্যবস্থা হইয়াছে।

লণ্ডন মিশনারি সোসাইটিজ ইন্‌স্টিটিউসন: লণ্ডন মিশনারি সোসাইটি ১৭১৮ অব্দে এদেশে মিশনবিস্তারে মনোনিবেশ করেন; তাঁহাদেরই যত্নে ও অর্থে এই বিদ্যালয়ের উৎপত্তি। ১৮৫৪ সালে ইহা ভবানীপুরে একটি বৃহত্তর ও বিস্তৃতায়তন বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে; সেই বাটীতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ঘর, একটি প্রকাণ্ড হল ও একটি সুন্দর লাইব্রেরী আছে।

জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউসন: চার্চ অব স্কটল্যাণ্ডভুক্ত জেনারেল এসেম্ব্লি নামক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সবিশেষ যত্নে ও আনুকূল্যে এই বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম প্রথম খ্রীষ্টান মিশনারীরা দেশীয় ভাষায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতেন; কিন্তু পাদরি ডাক্তার আলেকজাণ্ডার ডফ ১৮৩০ অব্দে এই বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া ইংরেজী ভাষায় খ্রীষ্টধর্মের গাঢ় তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। প্রথম কতিপয় বৎসর এই স্কুল কয়েকটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বসিয়াছিল। অবশেষে কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে বর্তমান সুন্দর ভবন নির্দিষ্ট হইলে ১৮৩৮ অব্দে তথায় স্থানান্তরিত হয়। এই বিদ্যালয়ের স্থানটি যে অতি উৎকৃষ্ট, তাহা বলাই বাহুল্য। ১৮৪৪ সালে এতৎসংসৃষ্ট মিশনারীরা ফ্রি-চার্চ নামক সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হওয়ায় কিছুদিনের জন্য এই বিদ্যালয়ের কার্য স্থগিত ছিল। পরে ১৮৪৬ অব্দে চার্চ অব স্কটল্যাণ্ড পাদরি ডাক্তার অগিলভির অধ্যক্ষতাধীনে ইহার কার্য পুনরারম্ভ করেন। ইহাতে দুইটি বিভাগ আছে—স্কুল বিভাগ ও কলেজ বিভাগ।

ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন ও ডফ কলেজ: স্কটল্যাণ্ডের জেনারেল এসেম্ব্লি সম্প্রদায়ভুক্ত পাদরি ডাক্তার আলেকজাণ্ডার ডফের যত্নে ১৮৩৪ সালের বিচ্ছেদের পূর্বে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিচ্ছেদ ঘটার পর জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশন নামক বিদ্যালয় কিছুদিন বন্ধ হয়, এবং ডাক্তার ডফকে ঐ বাড়ী

এবং তাঁহার নিজের বহুমূল্য লাইব্রেরী পরিত্যাগ করিতে হয়। শিক্ষক, ছাত্র, দেশীয় খ্রীষ্টান, সকলেই ডাক্তার ডফ ও অন্যান্য মিশনারীগণের অনুগমন করিল; কাজেই নিমতলায় একটা ভাড়াটিয়া বাটিতে বিদ্যালয় খোলা হইল। পরে ডফ সাহেব স্কটল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষে চাঁদা তুলিয়া বর্তমান ভবন নির্মাণ করেন। ১৮৫৭ সালে উহার নির্মাণকার্য শেষ হইলে বিদ্যালয় তথায় স্থানান্তরিত হয়। ইহাতেও স্কুল ও কলেজ দুইটি বিভাগ আছে। এতদ্ভিন্ন ডফ সাহেব একটি অনাথাশ্রম, একটি হিন্দু-বালিকা বিদ্যালয় ও একটি নর্ম্যাল স্কুল স্থাপিত করেন।

ডাক্তার ডফ প্রথমতঃ ২৮ নং মির্জাপুর স্ট্রীটে থাকিতেন, পরে ২নং কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে বাস করেন। প্রথম বাসভবনে তিনি খ্রীষ্টধর্মের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্বন্ধে লেক্‌চার (উপদেশ) দিতেন; তাহারই ফলে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার কে. এম. ব্যানার্জী) খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন।

বিশপস্ কলেজঃ খ্রীষ্টীয় সুসমাচার-প্রচার-সমাজের (The Society for the Propagation of the Gospel) সোৎসাহ সহযোগিতায় বিশপ মিডল্‌টন ১৮২০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর এই বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন করেন। খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও সাধারণ শিক্ষার প্রসার, বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ, এবং খ্রীষ্টান মিশনারীরা ভারতে প্রথম আগত হইলে তাঁহাদিকে বাসস্থান প্রদান,—এই কয়েকটি উদ্দেশ্যেই ইহার প্রতিষ্ঠা। এই কলেজের সহিত সংস্পৃষ্ট একটি ছাত্রাবাস ছিল, এবং কয়েকটি বৃত্তিও নির্ধারিত হইয়াছিল—ঐ সকল বৃত্তিধারী ছাত্রেরা বিনা ব্যয়ে আহার্য ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইত। এই কলেজ পূর্বে বর্তমান শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বাড়ীতে অবস্থিত ছিল। তথা হইতে ১১৩ নং সার্কুলার রোডে স্থানান্তরিত হয়, এবং পরে আবার তথা হইতে ২২৪নং লোয়ার সার্কুলার রোডে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে কলিকাতাবাসীদিগের স্কন্ধে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি ঔদাসীন্য ও উপেক্ষাপ্রদর্শন দোষের আরোপ করিতে পারা যায় না। বরং ইহাই বোধ হয় যে, সেকালে তাহারা ভবিষ্যৎ বংশের মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার উন্নতিসাধনে প্রগাঢ় যত্ন ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং গবর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য রাজপুরুষেরাও আপনাদের দায়িত্ব স্বীকার করিয়া তদনুরূপ কার্য করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। উদারচেতা ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮০ সালে ইউরোপীয় আদর্শে কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া দেশের একটি মহা অভাব দূর করেন। আরবী ও পারসী ভাষায় শিক্ষাপ্রদানের উদ্দেশ্যে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কারণ তৎকালে ঐ দুই ভাষাই আদালতের প্রচলিত ভাষা ছিল। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়ে মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর এককালীন তিন লক্ষ টাকা দান করিয়া আপনার বদান্যতার পরিচয় প্রদান করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস হিন্দু পণ্ডিতগণের প্রতিও অনুগ্রহ

বিস্তারে কুণ্ঠিত হন নাই। প্রায় এই সময়ে তাঁহারই উৎসাহে ও আনুকূল্যে হিন্দু ও মুসলমান গ্রন্থসমূহের অনুবাদ আরম্ভ হয়। তাঁহারই আগ্রহে ও যত্নে এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয় এবং সার উইলিয়ম জোনস্ তাহার প্রথম সভাপতি মনোনীত হন। লর্ড টেইনমাউথের মতে, হেস্টিংস সাহেবের চেষ্টার ফলেই ইউরোপীয়েরা প্রাচ্য ভাষাসমূহ শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ইংরেজ রাজ-পুরুষদিগের দেশীয় ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ সংস্থাপিত হয়। মার্কুইস অব হেস্টিংস মহোদয়ও সাধারণ শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন; কারণ তিনি কলিকাতার আদালতের বিচারকার্য সম্বন্ধে ১৮১৫ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, তাহাতে এইরূপ মর্মে লিখিয়াছেন: এই সকল অনিষ্টের প্রতিবিধানের পথ দেখিতে হইলে, দেশীয়দিগের মানসিক ও নৈতিক উন্নতিসাধনই অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় হইয়া দাঁড়ায়; সেই জন্যই আমি সাধারণ-শিক্ষারূপ গুরুতর বিষয়ের প্রতি ঔৎসুক্য সহকারে মনোনিবেশ করিতে ক্রটি করি নাই।"

লর্ড হেস্টিংস একটি উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃত বিদ্যালয় সংস্থাপনেও অভিলাষী হইয়াছিলেন, কিন্তু সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারী লর্ড আমহার্স্টের শাসনকালে ১৮২৪ অব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়; তৎকালে ইহার আয় বার্ষিক ৩০,০০০ টাকা ছিল। ইহার পূর্বে ১৭৯১ সালে কাশীর সংস্কৃত কলেজ এবং ১৮২৩ সালে আগ্রা কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জও শিক্ষাবিস্তারে, বিশেষতঃ দেশীয় ভাষায় শিক্ষাবিস্তারে, সাতিশয় যত্নশীল ছিলেন। শিক্ষাসম্বন্ধীয় আলোচনা করিবার সময়ে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, হুগলি নগরেই ইংরেজী শিক্ষার প্রথম বীজ উপ্ত হইয়াছিল। রবার্ট মে নামক চুঁচুড়াবাসী একজন পাদরি, নিজ বাসভবনে ১৮১৪ সালের জুলাই মাসে ১৬টি বালক লইয়া একটি স্কুল খুলিয়া বসেন। পরে গবর্ণমেন্ট উহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়া মাসিক ৬০০ টাকা পর্যন্ত দিতেন। বদান্যবর বর্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ তেজচাঁদ বাহাদুরও এদেশে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারে সাতিশয় যত্নপ্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

দেশীয় ভাষায় শিক্ষাবিস্তারে খ্রীষ্টান মিশনারীদিগের চেষ্টা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসার যোগ্য। কর্তৃপক্ষের নিকট কোনরূপ উৎসাহ না পাইয়াও এবং কোম্পানি কর্তৃক নির্বাসিত হইবার ভয় সত্ত্বেও তাঁহারা কেবল যে দেশীয়দিগকে খ্রীষ্টান করিবার কার্যে সোৎসাহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে, প্রত্যুত ইউরোপীয়দিগের মধ্যে তাঁহারাই সর্বপ্রথমে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। সার উইলিয়ম হান্টার লিখিয়াছেন: ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের সমকালে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা বাঙ্গালাকে গদ্য সাধুভাষার শ্রেণীতে উন্নীত করেন। শিক্ষা বিষয়ে মিশনারীদিগের যত্ন অধুনা গবর্ণমেন্টের ক্রিয়াশীলতায় অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, প্রকৃতপক্ষে আজিও সম্পূর্ণ নিরস্ত

হয় নাই। সেসালে শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের দুইটি স্বতন্ত্রভাব ছিল;—জন-সাধারণের নিকট ধর্মপ্রচার ও বাইবেলের অনুবাদ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা নিজে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতেন এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান প্রচারিত করিবার প্রণালী-স্বরূপ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিতেন।

কথিত আছে যে, ১৮১৭ সালের পূর্বে ডেভিড হেয়ার রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সহিত মিলিত হইয়া বাঙ্গলা বিদ্যালয়সমূহের উন্নতিবিধানার্থ অনেক সময় নিয়োজিত করিতেন। হেয়ার সাহেবের বঙ্গবিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র তাঁহার যত্ন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন:

"হেয়ার সাহেব শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগী হইয়া প্রথমে বাঙ্গলাশিক্ষার উৎসাহদানে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তৎকালে দেশে যে বহুসংখ্যক গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ছিল, তাহাতে তিনি নানাপ্রকারের অনেক ত্রুটি দেখিতে পান, এবং পরিদর্শক পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া ও মুদ্রিত পুস্তক বিতরণ করিয়া সেই সকল ত্রুটির সংশোধন করিতে চেষ্টা করিতেন। রাজা সার রাধাকান্ত বাহাদুরের বাগানবাটীতে সময়ে সময়ে ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করা হইত এবং তাহা-দিগকে 'প্রাইজ' দেওয়া হইত। তৎপর তিনি স্কুল সোসাইটীর প্রত্যক্ষ অধীনে একপ্রকার আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়টি বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছিল এবং ইহার ছাত্রসংখ্যাও প্রায় ২০০ শত হইয়াছিল। ইহার ন্যায় ভাল বাঙ্গালা স্কুল তৎকালে আর ছিল না। ছাত্রদিগের নিয়মিত উপস্থিতি বিষয়ে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে নগদ অর্থ পুরস্কার দেওয়া হইত। মাসের মধ্যে যাহারা একদিনও অনুপস্থিত না থাকিত, তাহারা প্রতি মাসে আট আনা করিয়া পাইত, যাহারা কেবল একদিন অনুপস্থিত থাকিত, তাহারা ছয় আনা করিয়া পাইত, যাহারা দুইদিন অনুপস্থিত থাকিত, তাহারা চার আনা পাইত; আর যাহারা দুইদিনের অধিক অনুপস্থিত থাকিত, তাহারা কিছু পাইত না। বঙ্গবিদ্যালয়সমূহের উৎকৃষ্ট ছাত্রেরা হিন্দুকলেজে প্রেরিত হইত, তথায় সোসাইটি ৩০-টি ছাত্রের ব্যয়ভার বহন করিতেন। কিছুদিন পরে উক্ত আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয়ের সান্নিধানে একটি ইংরাজি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয়ের বাছা বাছা ছাত্রেরা ইংরেজী শ্রেণীতেও পড়িতে পাইত। পড়াইবার ব্যবস্থা এইরূপ হইয়াছিল,- সূর্যোদয় হইতে পূর্বাহ্ণ নয়টা পর্যন্ত বাঙ্গলা, পূর্বাহ্ণ সাড়ে দশটা হইতে সাড়ে বারটা পর্যন্ত ইংরেজি; আর অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটা হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পুনর্বার বাঙ্গলা।

১৮৩৮ অব্দে আডাম সাহেব গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে বঙ্গ ও বিহারের দেশীয় ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত রিপোর্ট মুদ্রিত করেন। এই রিপোর্ট আলোচনা করিলে শিক্ষাবিষয়ে মিশনারী সম্প্রদায় ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গ কিরূপ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টই বা স্বীয় কর্তব্য কিরূপ পালন করিয়াছেন, তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। লর্ড

ডালহাউসি এবং হ্যালিডে সাহেব দেশীয় ভাষায় শিক্ষার বিস্তারকল্পে প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরন্তু লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের শাসনকালে বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ দান ও তাহার প্রসারের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার শাসনকালে ১৮৩৩ অব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যে নূতন সনদ প্রাপ্ত হন, তাহাতে গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলে একজন ল-মেম্বার (ব্যবস্থা-সভা) নিয়োগের নিয়ম হয়, এবং ব্যবস্থা হয় যে, কোম্পানির কর্মচারী না হইলেও যে কোনও ব্যক্তি ঐ পদ পাইতে পারিবেন। তদনুসারে টমাস ব্যাবিং টন মেকলে (পরে লর্ড মেকলে) প্রথম ল-মেম্বার নিযুক্ত হন। সেই সময়ে এতদ্দেশে ইংরেজী শিক্ষায় বা দেশীয় শিক্ষায় গবর্ণমেণ্ট সাহায্য ও উৎসাহ দান করিবেন, এই বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। মেকলের আগমনে ইংরেজী শিক্ষাপ্রবর্তনের পক্ষপাতীরা একজন অমূল্য সহায় পাইলেন। তাঁহার ১৮৩৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের 'মিনিট' প্রাচ্য-শিক্ষার পক্ষপাতীদিগের বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তিপূর্ণ প্রতিপক্ষরূপে উপস্থিত হইল। মেকলে সাহেব আপনার মন্তব্যের উপসংহারে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্মার্থ এইরূপ :

"আমার বোধ হয় ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ১৮১৩ অব্দের পার্লামেণ্টের আইন আমাদের হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখে নাই; স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হউক বা ভাবদ্বারা অনুমেয়ই হউক, কোনও প্রকার প্রতিজ্ঞা দ্বারাও আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ নহি। আমাদের ফণ্ডের টাকা আমরা ইচ্ছানুরূপ নিয়োজিত করিতে পারি; সর্বাপেক্ষা যাহা জানিবার অধিক উপযুক্ত, তাহার শিক্ষাদানেই সেই অর্থ নিয়োজিত করা আমাদের উচিত। সংস্কৃত বা আরবী অপেক্ষা ইংরেজীই জানিবার অধিক উপযুক্ত; এতদ্দেশীয় লোকেও ইংরেজি শিখিতে চায়, সংস্কৃত বা আরবী শিখিতে চায় না। আইনের ভাষা বলিয়াই বা কি, আর ধর্মের ভাষা বলিয়াই বা কি, সংস্কৃত বা আরবী আমাদের উৎসাহ লাভের কোনও বিশেষ স্বত্বের অধিকারী নয়; এতদ্দেশীয়দিগকে ইংরেজী বিদ্যায় যৎপরোনাস্তি সুপণ্ডিত করা সম্ভবপর, অতএব সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের যত্ন করা কর্তব্য।"*

লর্ড হালিফাক্সের প্রেরিত ডেস্প্যাচ (আদেশপত্র) অবলম্বন করিয়া বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে। লর্ড ডালহাউসির শাসনকালে পুরাতন হিন্দুকলেজ বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিবর্তিত হইয়াছে। তদবধি নীতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ১৮৫৭ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় একটি পরীক্ষক সমাজ ব্যতীত আর কিছুই নহে; তবে সাধারণ

* পরলোকগত রাজা রামমোহন রায়ও এই সময়ে ইংরেজী শিক্ষার পক্ষ সমর্থন করিয়া গভর্ণর জেনরেলের নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করেন।

সাহিত্য, আইন, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে উপাধি-প্রদানের অধিকার ইহার আছে। একজন চ্যান্সেলর (সভাপতি), একজন ভাইস-চ্যান্সেলর (সহ-সভাপতি) ও একটি সেনেট (সদস্য-সমাজ) লইয়া ইহা গঠিত। ইহার কর্মপরিচালনার ভার সিণ্ডিকেট নামক সভার উপর অর্পিত; তাহাতে ভাইস চ্যান্সেলর ও বিভিন্ন ফ্যাকালটি কর্তৃক নির্বাচিত কয়েকজন সেনেটের সভ্য আছেন। ১৮৫৪ অব্দের প্রবর্তিত প্রণালীর পূর্ণতাসাধনের উপায়নির্ধারণার্থ লর্ড রিপণ ১৮৮২-৮৩ অব্দে একটি "শিক্ষা কমিশন" নিযুক্ত করেন। উক্ত কমিশনের সভাপতি স্বনামখ্যাত সার উইলিয়ম হাণ্টার আপনার রিপোর্টের এ স্থলে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :

"স্ত্রী শিক্ষা এবং সমাজের মুসলমান প্রভৃতি কতিপয় অনুন্নত শ্রেণীর বিদ্যাশিক্ষায় বিশিষ্টরূপ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। কমিশনের অনুরোধ-সমূহের স্থূল কথা এই যে, গবর্ণমেণ্টের সাধারণ শিক্ষাবিভাগটিকে উন্নত করিয়া ভারতের প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা এরূপ প্রণালীতে পরিণত করা আবশ্যক, যেন প্রজারা নিজেই অধিকতর পরিমাণে তাহার পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করিতে পারে।"

ভূতপূর্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জনের শাসনকাল অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে একটি "শিক্ষা কমিশন" নিযুক্ত হইয়াছিল। কমিশনরেরা বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়া অভিজ্ঞ শিক্ষাব্যবসায়ী ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহার ত্রুটি ও অভাব সমূহের নির্ধারণ এবং তৎপ্রতিকারের পন্থা নির্দেশ করাই এই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতির বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা ভারত গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্ট হইতে ১৯০৪ সালের মার্চ মাসে প্রচারিত রিজোলিউশন পাঠ করুন।

বর্তমান সময়ে কলিকাতায় খাস গবর্ণমেণ্টের, মিশনারী সম্প্রদায়সমূহের এবং বেসরকারী ভদ্রলোকদিগের অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি কলেজের কথা ইতঃপূর্বেই বলা হইয়াছে। দেশীয়দিগের প্রথম শ্রেণীর কলেজগুলির মধ্যে পরলোকগত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন ১৮৭৯ সালে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠিত সিটি কলেজ ১৮৮১ সালে, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত রিপন কলেজ ১৮৮৪ সালে ও বাবু ক্ষুদিরাম বসুর প্রতিষ্ঠিত সেন্‌ট্রাল কলেজ ১৮৯৬ সালে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বঙ্গবাসী কলেজ প্রথমে ১৮৮৭ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজরূপে এবং ১৮৯৬ সালে প্রথম শ্রেণীর কলেজ-রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

এস্থলে প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া

আবশ্যক। তাঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্তমান মেদিনীপুর (তদানীন্তন হুগলী) জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮২৯ সালের ১লা জুন তারিখে তিনি সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৪১ অব্দ পর্যন্ত তথায় অধ্যয়ন করিয়া 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। তৎপরে তিনি ১৮৪১-৪২ অব্দ হইতে ১৮৫৮ অব্দ পর্যন্ত মাসিক ৫০ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া, মাসিক ৫০০ টাকা পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন বেতনে ভিন্ন ভিন্ন পদে,—যথা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড্ পণ্ডিত ও হেড্ রাইটার রূপে, সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষরূপে, এবং অবশেষে বর্ধমান, নদীয়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার বিদ্যালয়সমূহের ইনস্পেক্টররূপে—গবর্ণমেণ্টের চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৯১ সালের জুলাই মাসে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে জনৈক লেখক যথার্থই লিখিয়াছেন: "সংস্কৃত কলেজের বর্তমান সুযোগ্য অধ্যক্ষ বেকন ও বপের ভাবে অনুপ্রাণিত ঈশ্বরচন্দ্রের যত্নে ইহা আর কেবল সংস্কৃত ভাষায় মানসিক শিক্ষার স্থান নহে, অধিকন্তু ভাষাবিজ্ঞান অনুশীলনের প্রধান স্থান, বাঙ্গলা ভাষার রাজবিদ্যালয়, বিশুদ্ধ ভাষার উৎপত্তিস্থল, এবং সুদক্ষ ভাষাতত্ত্ব শিক্ষকের শিক্ষার বিদ্যালয়রূপে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার যত্নে সংস্কৃত আর পূর্বের ন্যায় কেবল ব্রাহ্মণগণের কুসংস্কারের অস্ত্রস্বরূপ নাই, জনসাধারণের ভাষাহিসাবে সুমার্জিত হইয়া উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। তর্কশাস্ত্রকে জনপ্রিয় করিবার নিমিত্ত হোয়েটলি যাহা করিয়াছেন, দর্শন-শাস্ত্রকে জনপ্রিয় করিবার নিমিত্ত সক্রেটিস যাহা করিয়াছেন, সংস্কৃত ব্যাকরণের অধ্যয়নকে সহজসাধ্য করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরচন্দ্র তাহাই করিয়াছেন; যে শাস্ত্রের অধ্যয়ন এতকাল নিতান্ত কঠিন ও নীরস ছিল, তাহাকে তিনি গ্রীকের ন্যায় সহজ করিয়াছেন। তাঁহার কৃত ব্যাকরণ ও সরল সংস্কৃত গ্রন্থ বহু ইংরেজী বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত হইয়াছে; ঐ সকল স্কুলের ছাত্রেরা তাঁহার উদ্ভাবিত প্রণালীতে বাঙ্গলা সাধুভাষা শিক্ষা করে; এতদ্দ্বারা অধ্যাপক উইলসনের সেই উক্তি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে, দেশীয়দিগকে তিন চারি বৎসরের মধ্যে সংস্কৃত শিখান যাইতে পারে।' পূর্বে বালকগণ চারি পাঁচ বৎসর সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিয়াও ঐ শাস্ত্রে কয়েকটি সরল সূত্রের অধিক অগ্রসর হইতে পারিত না, কিন্তু এক্ষণে সেই স্থলে তিন মাস শব্দরূপ ও ধাতুরূপ পড়িয়া তাহারা সহজ সংস্কৃত বাক্য পড়িতে আরম্ভ করে, এবং তৎপরে সাধারণ সাহিত্য ও কাব্য অধ্যয়ন করিয়া আপনাদের মনকে উন্নত করে। ঈশ্বরচন্দ্রের উন্নতপ্রণালী বিষয় সবিশেষ অবগত হইতে হইলে সাধারণ-শিক্ষা-কমিটির (১৮৫২ সালের) পাঠ করা আবশ্যক। তাঁর কৃত প্রথম শিক্ষার সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যপাঠ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ছাত্রগণকে বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ বাগ্-বিন্যাস-প্রণালী ও শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ করিবার ও পারিভাষিক শব্দসমূহে তাহাদের বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মাইবার প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া সেগুলি কলিকাতার প্রধান প্রধান

মিশনারি বিদ্যালয়ে ও মফঃস্বলের অনেক স্কুলে পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রচলিত হইয়াছে। দেশীয়রা স্বয়ংই এক্ষণে মুগ্ধবোধকে ক্রমশঃ সরাইয়া দিতেছে। যে ডাক্তার ব্যালান্টাইন বেকনকে কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীর সুবোধ্য করিয়াছেন, তাঁহার নামের সহিত এবং সেহোরের উইলকিনসনের নামের সহিত ঈশ্বরের নামও ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।"

এই পূজনীয় পণ্ডিতের পাদমূলে বসিয়া তাঁহার জীবনচরিত পর্যালোচনা করিলে সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় যে, "সাধু মানবই ঈশ্বরের উচ্চতম সৃষ্টি'—এই মহাকাব্যের সত্যতা ঈশ্বরের জীবনে যেরূপ প্রমাণিত হইয়াছে, তেমন বুঝি আর কাহারও জীবনে হয় নাই। ইনি দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দেশের উচ্চতম জাতির ঘরে জন্মিয়াছিলেন ; এবং ইনি যে শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, সে শ্রেণীর লোকে "সামান্য জীবনযাপন ও উচ্চচিন্তার" মহান্ আদর্শ প্রকৃত জীবনে প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, ঈশ্বরচন্দ্র আপনার বিদ্যা, বুদ্ধি, উৎসাহ উদ্যম, অর্থ ক্ষমতা, এমন কি জীবন পর্যন্ত—সমস্তই মানবজাতির হিতার্থে উৎসর্গ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু বালবিধবাদের পুনর্বিবাহের যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার পরদুঃখকাতরতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার আর একটি বিশেষ গুণ ছিল এই যে, যাহা তিনি করিতেন, তাহা সর্বান্তঃকরণের সহিতই করিতেন। তাঁহার পরোপকারের কথা আর কি বলিব? সুপ্রসিদ্ধ লেখক এন. এন. ঘোষ যথার্থই বলিয়াছেন যে, "যখন বিদ্যাসাগর মরিলেন, তখন বদান্যতাদেবী আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।" সর্বপ্রকার কপটতা ও কৃত্রিমতা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত তিনি বিবেকবুদ্ধিকে কখনও জলাঞ্জলি দেন নাই, বিদ্যালয়সমূহের সংস্থাপনে, বিশেষতঃ মেট্রপলিটান কলেজের প্রতিষ্ঠায়, তিনি যেরূপ আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা অতীব প্রশংসার বিষয় ; কারণ তখন সকলেই মনে করিয়াছিল, বাঙ্গালীর এ চেষ্টা নিশ্চয়ই বিফল হইবে। এরূপ অবস্থায় তিনি একাকী, বাহিরের বিন্দুমাত্র সাহায্য না হইয়া, কেবল দেশীয় শিক্ষক দ্বারা যেরূপ উৎকৃষ্টভাবে বিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা যৎপরোনাস্তি বিস্ময়জনক।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, লর্ড আমহার্স্ট ১৮২৪ অব্দে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। সে সময় উহার কার্যপরিচালনার্থ একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল। ছাত্রদিগের জন্য কতকগুলি মাসিক বৃত্তিও নির্ধারিত হইয়াছিল। পূর্বে কেবল ব্রাহ্মণ ছাত্রেরাই ঐ সকল বৃত্তি পাইত, এবং কেবল ব্রাহ্মণ বালকেরাই কলেজে পড়িতে পাইত। সে নিয়ম আর নাই, এক্ষণে সকল জাতীয় হিন্দু বালকই সংস্কৃত কলেজে পড়িতে পারে। সেকালে সংস্কৃত কলেজেই একটি ডাক্তারী শিক্ষার বিভাগ ও তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট একটি শবব্যবচ্ছেদের শ্রেণী ছিল, কিন্তু

শিক্ষকগণের অযোগ্যতায় তাহা উঠিয়া যায়। এই কলেজে একটি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত পুস্তকালয় আছে।

১৮১৭ সালে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে নিম্নলিখিত মর্মের এক একখানি পত্র অনেক ভদ্রলোকের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত গোপীমোহন দেব
মহাশয় সমীপেষু
কলিকাতা, ৭ই মে ১৮১৭

প্রিয় মহাশয়,

যথোপযুক্ত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দিয়া স্কুলের বিদ্যাশিক্ষার উৎকর্ষসাধনার্থ বেলি সাহেবের যত্নে ও অনুগ্রহে একটি সভার অধিবেশন হইবে, ঐ সভায় আপনার পুত্র যাহাতে উপস্থিত হন, এজন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত আমি আগামীকল্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। আশা করি, আমাদের সকলের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার উন্নতিসাধনই যখন ইহার উদ্দেশ্য, তখন হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ ভদ্রলোক মাত্রেরই ইহা তুল্যরূপে বাঞ্ছনীয় হইবে এবং সকলেই ইহার সফলতার জন্য যত্নশীল হইবেন। আগামী মঙ্গলবারের সভাটি সাধারণ রিজোলিউশনগুলি স্থির করিবার নিমিত্ত কেবল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া মাত্র হইবে, দেশীয় ভদ্রলোকেরা যাহাতে রিজোলিউশন-গুলি উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন, এজন্য সেগুলি কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইলে পর সাধারণ্যে প্রচার করা হইবে, এবং সবশ্রেণীর হিতৈষী মহোদয়গণর নিকট অর্থ-সাহায্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত চাঁদার বহি খোলা হইবে। চাঁদার হার অধিক উচ্চ হইবে না; সুতরাং সে বিষয়ে আমাদের বন্ধুবান্ধবগণের ভয় পাইবার কোনও কারণ নাই। আমি আশা করি, আপনি নিজে এবং আমাদের যে সকল বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট এই প্রসঙ্গ উপস্থিত করিব, সকলেই এই উদ্দেশ্যটিকে আপনাদের অনুমোদন ও সমর্থনের যোগ্য বিবেচনা করিবেন, কারণ ইহা সুপ্রসিদ্ধ হইলে আমাদিগকে ভাল ভাল পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দিবার বিষয়ে আমাদের নিজ কলেজের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর হইবে।

আপনার বিশ্বস্ত
(স্বাক্ষর) ঈ. এইচ্. ঈস্ট

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে এই সোসাইটির গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্যস্বরূপ এককালীন ৭,০০০ টাকা এবং মাসিক ৫০০ টাকা চাঁদার অঙ্গীকার প্রাপ্ত হয়; এবং গবর্ণমেণ্ট ইহাও স্বীকার করেন যে, যতকাল ইহার কাজকর্ম সুবিবেচনায় পরিচালিত হইবে, ততকাল এই চাঁদা প্রদত্ত হইবে। এই সোসাইটি বাঙ্গলা ভাষার ভূ-বৃত্তান্ত, প্রাণি-বৃত্তান্ত প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা শিক্ষার বিলক্ষণ সহায়তা করিয়াছে।

১৮৮১ সালে মাকুইস্ অব হেস্টিংস মহোদয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতা স্কুল সোসাইটি (বিদ্যালয়-সমিতি) প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে বর্ত্তমান বঙ্গ-বিদ্যালয়-গুলির সাহায্য করিবার নূতন নূতন বঙ্গ-বিদ্যালয় স্থাপন করিবার, এবং মেধাবী ছাত্রগণকে শিক্ষক ও অনুবাদক হইবার উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যেই উহার প্রতিষ্ঠা। ১৮২১ সালে ইহার তত্ত্বাবধানাধীনে ১১৫টি বঙ্গ-বিদ্যালয় এবং ৩,৮২৮ জন ছাত্র ছিল। ১৮২৩ সালে ইহা গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ৫০০ টাকা সাহায্য পাইত। ডেভিড হেয়ার ইহার ইউরোপীয় সম্পাদক এবং রাজা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ইহার দেশীয় সম্পাদক ছিলেন। সার আণ্টনি বটবার, জে. হ্যারিংটন প্রভৃতি মহাপুরুষেরা ইহার প্রতি বিলক্ষণ সহানুভূতি ও যত্ন প্রকাশ করিতেন।

বিদ্যালয় ও শিক্ষাসমাজ সম্বন্ধীয় এই প্রসঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষাবিষয়ে যে সকল মহাত্মা আয়াস স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক; নচেৎ এই সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ বিবরণ আরও অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। কথিত আছে যে, মিসেস (বিবি) পিট নাম্নী একটি ইউরোপীয় মহিলাই এই কার্যে সর্ব-প্রথম অগ্রসর হয়।* মিসেস্ ডুয়েলের বালিকাবিদ্যালয় সে সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পাদরী লসন সাহেবের স্ত্রী-বিদ্যালয়ও বেশ ভাল অবস্থাপন্ন ছিল; তিনি ইংরেজী-রচনার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতেন। তিনি নিজেও সুমিষ্ট কবিতা রচনায় পটু, উত্তম ভাস্কর, চিত্রকর ও সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। মিলিটারী অরফ্যান সোসাইটিও বালিকাদিগকে কার্যকরী শিক্ষা প্রদান করিতে ব্যাপৃত হইয়াছিল। টমসন নামক এক সাহেব গোরা সৈনিকদিগের সন্তান-সন্ততির দুরবস্থাদর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া সার্কুলার রোডে স্ত্রী-অনাথাশ্রম স্থাপন করেন। গবর্ণমেণ্ট এই আশ্রমে মাসিক ২০০ টাকা সাহায্য করিতেন। পাদরি হুভেগুন সাহেব বালিকাদের শিক্ষার নিমিত্ত একটি অর্থ-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮১৯ সালে কলিকাতা স্ত্রী-যুব-সমিতি (The Calcutta Female Juvenile Society) প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গলা স্ত্রী-বিদ্যালয়ের সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ইহার প্রতিষ্ঠা। এই সমিতি প্রথমে ২২টি ছাত্রী লইয়া একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন; এক বৎসরের মধ্যে উহাতে আরও ৮টি বালিকা প্রবিষ্ট হয়। পড়া

---

* বেষ্টনি সাহেব কিন্তু বলেন:

১৭৬০ অব্দের সমকালে মিসেস হেজেস একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ উহাই কলিকাতার প্রথম বালিকাবিদ্যালয়। ঐ বিদ্যালয়ে নৃত্য ও ফারসী ভাষা শিখান হইত বলিয়া প্রকাশ।......তৎকালে খিদিরপুর স্কুলের অস্তিত্ব ছিল না, সুতরাং মিসেস হেজেস ১৭৮০ সালে বেশ সঙ্গতি করিয়া লইয়া অবসর গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। কথিত আছে যে, হেজেস বিবির বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা শিশুবৎ গর্বিতা, উদ্ধতা, ধূর্ত্তা, নীচস্বভাবা ও স্বেচ্ছাচারিণী ছিল।

লেখা ও সূচিকর্ম এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। ১৮২২ সালে এই সমিতি বঙ্গীয় খ্রীষ্টান স্কুল সোসাইটির সহিত মিলিত হইয়া যায়। উক্ত অব্দে দেশীয় বালিকাদের শিক্ষার নিমিত্ত একটি মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কুমারী কুক (পরে মিসেস উইলসন) এই সমিতির উন্নতির নিমিত্ত বিস্তর শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন।

পরলোকগত মাননীয় জে. ঈ. ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (বীটন) বঙ্গদেশে প্রকৃত-প্রস্তাবে স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন করেন। ১৮৫০ সালের নভেম্বর মাসে বেথুন স্কুল নামে একটি বালিকাবিদ্যালয় কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়ের সহিত মহিলা অধ্যক্ষ ও ছাত্রীদিগের থাকিবার জন্য একটি বাসভবন সংলগ্ন আছে। বিদ্যালয়টি অধুনা প্রথমশ্রেণীর কলেজরূপে পরিণত হইয়াছে। এখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষার পাঠ্য পর্যন্ত পড়ান হইয়া থাকে। রাজা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরও স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। বেথুন সাহেব তৎসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন: "বালিকাদিগকে একেবারে সম্পূর্ণ মূর্খ করিয়া রাখা যে নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা ও দোষের কার্য এবং উহা যে হিন্দুশাস্ত্রের আদিষ্ট বা অনুমোদিত নহে, একথা আধুনিক কালে ভারতবাসী-দিগের মধ্যে আপনিই সর্বপ্রথমে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এজন্য আপনি যথার্থ প্রশংসার্হ; আমি এক্ষণে আপনাকে সেই ধন্যবাদ প্রদান করিতে সমুৎসুক হইয়াছি।" রাজা রাধাকান্ত দেবের বংশে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার-চেষ্টা তাঁহার নূতন নহে; তাঁহার প্রখ্যাত পূর্বপুরুষেরাও এ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুরাগী ছিলেন। পাদরি ওয়ার্ড সাহেব বলিয়াছেন যে, রাজা নবকৃষ্ণের পত্নীরা বিদুষী বলিয়া প্রসিদ্ধা ছিলেন।

আরও অনেক বিখ্যাত ভারতবাসী এ বিষয়ে প্রভূত শ্রম স্বীকার করিয়া বিলক্ষণ আনুকূল্য করিয়া গিয়াছেন। পরলোকগত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, বাবু প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতি খ্যাতনামা মহাত্মারা স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারের পক্ষপাতী হইয়া বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন। মিশনারী সম্প্রদায়-গণও এ বিষয়ে যে সকল মহৎ কার্য করিয়াছেন, তাহাও অতীব প্রশংসনীয়। তাঁহারা কলিকাতার সর্বত্র ও তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহে হিন্দু অধিবাসীদিগের বাসভবনে যে সকল শিশু ও বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, সেগুলি স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারের প্রধান সাধন। এই সমস্ত স্কুলের শিক্ষাপ্রদান বিষয়ে বিশেষত্ব এই যে, গ্রাম্য চলিত বাঙ্গালায় বাইবেলের উপদেশ প্রদত্ত হইত। কয়েক বৎসর হইল, হিন্দু-বালিকাদিগের জাতীয়ভাবে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে "মহাকালী পাঠশালা" এবং কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহে উহার কতকগুলি শাখা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। নৈতিক ও ধর্মবিষয়ক শিক্ষাদানই এইসমস্ত বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট গুণ। মাতাজী মহারাণী তপস্বিনীর অনুগ্রহে এই বিদ্যা-লয়ের প্রতিষ্ঠা; এজন্য তিনি অশেষ ধন্যবাদের পাত্রী। হিন্দু জনসাধারণও এই

সদাশয়া পরহিতৈষী মহিলার উদ্যোগে সর্বান্তঃকরণে যোগদান করিয়াছে, এবং এই বিদ্যালয়ও সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকের অতি আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি স্ত্রী-শিক্ষালয় আছে, সে সকলের কথা বলা হয় নাই। এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মদিগের আগ্রহ ও যত্ন সবিশেষ প্রশংসনীয়। তদ্ব্যতিরিক্ত ইউরোপীয় বালিকাদের জন্যও কয়েকটি স্কুল ও কলেজ সুন্দররূপে পরিচালিত হইতেছে। মুসলমান-সমাজেও স্ত্রী-শিক্ষা প্রবেশলাভ করিয়াছে; অনেকগুলি মুসলমান-বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর একটি মুসলমান-বালিকা-বিদ্যালয়ে প্রচুর অর্থ-সাহায্য করিয়া আপনার উদারতা প্রকাশ করিয়াছেন।

পাদরি লঙ্ সাহেব বলেন, সেকেলে ১৭৭০ সালেও পুরাতন কেল্লার ভিতর একটি সাধারণ পুস্তকালয় ছিল। ওরিএন্টিল কমার্স (প্রাচ্য বাণিজ্য) নামক পুস্তকে তৎকালে ইউরোপ হইতে আনীত গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা দৃষ্ট হয়। মিস্টার মাণ্ডুরু নামক এক সাহেবের একটি লাইব্রেরী ছিল, অনেকে চাঁদা দিয়া তাহা হইতে পুস্তক বাড়ীতে লইয়া যাইয়া পাঠ করিতেন। সেকালে বৎসরে একমাত্র ইংলণ্ড হইতে পুস্তক আসিত, মুদ্রণব্যয় বর্তমান সময় অপেক্ষা পাঁচগুণ অধিক ছিল। এশিয়াটিক্স নামক একখানি ১২ পেজী ১৪২ পৃষ্ঠার পুস্তক ১৮০৩ সালে কলিকাতায় মুদ্রিত হয়; যাহারা উহার মূল্য অগ্রিম দেয় নাই, তাহাদের নিকট উহার একখণ্ড পুস্তক ২৪ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। ওল্ড হরকরা লাইব্রেরি নামক পুস্তকালয় বহু বৎসর চলিয়াছিল।

কলিকতা পাবলিক লাইব্রেরী ১৮৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। লোক তথায় বসিয়া পড়িতে পাইত, অথবা ইচ্ছা করিলে পুস্তক বাড়ীতে লইয়াও পড়িতে পাইত। ইহা প্রথমতঃ এস্প্ল্যানেডের উপর ডাক্তার ই. পি. স্ট্রঙ সাহেবের বাস-ভবনে বিনা ভাড়ায় স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৪১ সালে ইহা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। পরে ১৮৪৪ সালে বর্তমান সদাশয় লর্ড মেট-কাফের নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। প্রথম প্রথম ইউরোপীয় ও দেশীয় উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ইহার চাঁদা-দাতা ও আজীবন সদস্য ছিলেন। ১৮৯০-৯১ সালে কলিকাতা মিউনিসিপালিটি ইহাতে অর্থসাহায্য করিতে এবং আজীবন সদস্য সহিত একযোগে ইহার কার্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০৩ সালে ভারত গবর্ণমেণ্ট ইহার সহিত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি মিলিত করিয়া দিয়াছেন। পরন্তু গবর্ণমেণ্ট ইহার কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিবার পূর্বে আজীবন সদস্যগণের সম্মতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন শহরের উত্তরাংশে অর্থাৎ দেশীয় অংশেও কতকগুলি পুস্তকালয় ও পাঠাগার দেশীয় ভদ্রলোকদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বাগবাজার সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগার, কম্বুলিয়াটোলা বালকদিগের পাঠাগার, চৈতন্য লাইব্রেরি, কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার পুস্তকালয় ও পাঠাগার প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের প্রথম দুইটি

মিলিত হইয়া এক হইয়া গিয়াছে। ইহারা সর্বশ্রেণীর নর-নারীকে মানসিক খাদ্য প্রদান করিতেছে। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটির নিজের বাড়ী আছে ; কোন কোনটি ভাড়াটিয়া বাটীতে এবং অপর কয়েকটি ভদ্রলোকের বাসভবনে বিনা ভাড়ার অবস্থিত। এই সকল লাইব্রেরী দ্বারা সমাজের অনেক হিতসাধন হয়। এই সকল লাইব্রেরীর যত্নে বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়, পুস্তক-পুস্তিকা মুদ্রিত হয়, আবার কখন কখন সাময়িক পত্রও প্রচারিত হয়। সাধারণতঃ এই সকল লাইব্রেরী রাজনীতির ধার ধারে না। বহু পদস্থ ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোক এই সকল পুস্তকালয়ের প্রতি বিলক্ষণ সহানুভূতি ও অনুরাগ প্রদান করিয়া থাকেন।

এসিয়াটিক লাইব্রেরী : সাহিত্য ও বিজ্ঞান-বিষয়ক অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে, এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল কলিকাতার মধ্যে যেমন অতি প্রাচীন, তেমনই ভারতের অত্যন্ত উপকারও করিয়াছে। ১৭৮৪ অব্দের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এশিয়ার সর্বত্র মানুষে যাহা কিছু করে বা প্রকৃতি হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তের অনুসন্ধান করাই ইহার উদ্দেশ্য। ওয়ারেন হেষ্টিংস ইহার প্রথম প্রেট্রন ও উইলিয়াম জোনস্ ইহার প্রথম প্রেসিডেন্ট। ইহা দ্বারা যে সমস্ত নানাপ্রকার ও বহুসংখ্যক উপকার শাসিত হইয়াছে, অল্প কথায় তাহা বুঝান দুঃসাধ্য। গবেষণা বিষয়ে ইহার উপকারিতার তুলনা নাই। সংস্কৃত বিদ্যার পুনরভ্যুদয় ও সাহিত্যরাজ্যে উহার প্রকৃতাবস্থা নির্ধারণ প্রধানতঃ ইহারই দ্বারা হইয়াছে। এই সভা যদি সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ মুদ্রিত করিয়া সভ্যজগতে বিতরণ না করিত, তাহা হইতে ঐ সকল অমূল্য পুস্তক ইউরোপীয় বিদ্বজ্জনসমাজে অপরিচিত থাকিত। পরলোকগত ডাক্তার হোরেস হেমান উইলসন, টমাস কোলব্রুক, জেমস্ প্রিন্সেপ ও ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি স্বনামখ্যাত মহোদয়গণ ইহার সদস্য ছিলেন। এই সমাজের সহিত সম্প্‌ক্ত একটি চিত্রশালিকা (যাদুঘর) আছে ; তাহাতে নানাপ্রকার বহুসংখ্যক খনিজ পদার্থ ও মানবজাতির আদর্শ সংগৃহীত হইয়াছে ; তদ্ভিন্ন উহাতে অনেক অতি পুরাকালীন নিদর্শন, প্রতিমূর্তি, মুদ্রা, দুষ্প্রাপ্য চিত্র তাম্রানুশাসনলিপি, মনুষ্যের উত্তমাঙ্গের প্রতিমূর্তি চিত্রপট প্রভৃতি আছে। ইহাতে একটি পুস্তকালয়ও আছে, তাহাতে অন্যান্য অনেক পদার্থের মধ্যে বহুসংখ্যক সংস্কৃত, আরবী, পারসী, হিন্দুস্থানী, বর্মী ও নেপালী ভাষায় হস্তলিখিত পুঁথি আছে। চৌরঙ্গী রোডের চিত্রশালিকার ভবনটি যেমন বৃহৎ ও দৃঢ় তেমনি সুদৃশ্য ও মনোহর। এসিয়াটিক সোসাইটি এখন ৫৭নং পার্ক স্ট্রীটে অবস্থিত।

ভারতীয় কৃষিসমিতি (The Agri-Hori-Horticultural Society of India) : ব্যাপটিস্ট মিশনারী জেম্‌স্ ক্যারি সাহেবের আনুকূল্যে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত। অধুনা মেটকাফ হল নামে পরিচিত। কলিকাতা সাধারণ পুস্তকালয়ের সর্ব নিম্নতলে ইহার সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। প্রথম প্রথম রাজা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি খ্যাতনামা দেশীয়

ভদ্রলোকগণ ইহার উন্নতিকল্পে সবিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতেন। আলিপুরে এই সমিতির একটি উদ্যান আছে; তথায় সকল প্রকার গাছপালা ও ফুল উৎপাদন করিয়া সাধারণকে বিক্রয় বা সদস্যগণকে বিতরণ করা হয়। প্রতি বৎসর তথায় একটি ফুলের মেলা বসিয়া থাকে।

আর্ট স্কুল: ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে হজসন প্র্যাট সাহেবের ভবনে একটি সমিতির অধিবেশন হইয়া কয়েকজন ভদ্রলোককে লইয়া যে কমিটি গঠিত হয়, তাহাদেরই চেষ্টায় ঐ বৎসরই এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। চিত্রপট অঙ্কন, ধাতু পাত্রের উপর চিত্রাঙ্কন, এবং খোদাই ও ঢালাই কাজ শিক্ষা দেওয়ারই ইহার উদ্দেশ্য। মোসিয়া রিগো নামক জনৈক ফরাসী ইহার প্রথম শিক্ষক ছিলেন। ১৮৬৪ অব্দে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট এই বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে একটি সুন্দর চিত্রশালা আছে। ইহা এক্ষণে একজন সাহেব অধ্যক্ষের অধীন। সকলেই এখানে শিক্ষালাভ করিতে পারে। পূর্বে ইহা বৌবাজার স্ট্রীটে ছিল, কিন্তু সম্প্রতি চৌরঙ্গী রোডে যাদুঘরের নিকট ইহার নিজের সুন্দর বাটীতে উঠিয়া গিয়াছে।

বেথুন সোসাইটি: সাহিত্য ও বিজ্ঞান আলোচনায় অনুরাগ জন্মাইবার এবং ইউরোপীয় ও দেশীয়দিগের মধ্যে জ্ঞানানুশীলন বিষয়ক সংযোগ সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা। মাননীয় জাস্টিস্ ফিয়ার, কর্ণেল ম্যালিসন, পাদরি কে. এম. বন্দ্য, প্রখ্যাত ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ, বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী প্রমুখ মহাত্মারা ইহার কার্যে অন্তরের সহিত যোগ দিয়া প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা করিতেন।

বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান-সম্মিলনী (The Bengali Social Science Association): কুমারী মেরি কার্পেণ্টারের যত্নে এবং মাননীয় জাষ্টিস্ ফিয়ার ও বেভারলি, পাদরি লঙ, নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর প্রমুখ মহোদয়গণের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৬৭ সালে এই সম্মিলন প্রতিষ্ঠা হয়। জনসাধারণের সামাজিক, মানসিক ও নৈতিক অবস্থার তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে ইউরোপীয় ও দেশীয়দিগকে সম্মিলিত করিয়া বঙ্গদেশে সামাজিক উন্নতির সহায়তা করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। এতৎ সম্পর্কে আইন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাণিজ্য বিষয়ে বহু হিতকর বক্তৃতা এই সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ বেথুন সোসাইটি ও এই সম্মিলনী উভয়েরই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে।

মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি (The Mahammedan Literary Society): ১৮৬৩ অব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বশ্রেণীর জনগণের মধ্যে, বিশেষতঃ মুসলমান সমাজে, সামাজিক ভাব ও সাহিত্য-বিষয়ে অনুরাগ উদ্দীপিত করিবার উদ্দেশ্যে ইহার প্রতিষ্ঠা। পরলোকগত নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর ইহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। বস্তুতঃ নবাব বাহাদুর ভারতবাসী সকল সম্প্রদায়েরই একজন প্রধান নেতা বলিয়া বিবেচিত হইতেন। সকল সমাজে এই সভার প্রতিষ্ঠালাভ কেবল

আবদুল লতিফ বাহাদুরেরই যত্নের ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারই যত্নে টাউন হলে, ইহার বার্ষিক অধিবেশনের সময় ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও প্রধান সেনাধ্যক্ষ এবং বঙ্গীয় লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণরগণ উপস্থিত হইতেন।

যুবকগণের উচ্চতর শিক্ষাসমিতি বা কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট The Society for the Higher Training of young Men or The Calcutta University Institute. : বঙ্গের ভূতপূর্ব লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর সার চার্লস ইলিয়েটের ঐকান্তিক ইচ্ছায় ইহায় উদ্ভব। বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দের মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক অবস্থার উন্নতি সাধন হইবার উদ্দেশ্যে সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও বক্তা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মহা-মহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, পরলোকগত রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ সার ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ প্রথম অবস্থায় ইহার সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইহার সম্পাদক ও রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ধনাধ্যক্ষ হন। বক্তৃতা, সামাজিক সম্মিলনী এবং নির্দোষ ও স্বাস্থ্যকর ক্রীড়া ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হইত, এবং ঐ সকল ব্যাপারে বঙ্গের শাসনকর্তারা অবাধে ছাত্রবৃন্দের সহিত মিশিতেন। কিছুদিন পরে পরলোকগত অধ্যাপক সি. আর. উইলসন সম্পাদক হইলেন, এবং সেই সময়ে ইহার পূর্বনামের পরিবর্তে বর্তমান ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট নাম হইল। ইহা সংস্কৃত কলেজের পূর্বপার্শ্বে অবস্থিত। ইহার সংগ্রহে একটি উৎকৃষ্ট লাইব্রেরী আছে। ইহারই প্রযত্নে মার্কাস স্কোয়ার ক্রীড়াভূমির উদ্ভব হইয়াছে; তথায় কলিকাতায় সমস্ত কলেজের ছাত্রগণের নিমিত্ত স্বাস্থ্যকর ক্রীড়ার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর এতদর্থে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের হস্তে যে অর্থ প্রদান করেন, তাহা হইতেই সার চার্লস ইলিয়ট এই মহাসমিতির সূত্রপাত করেন। ইহার কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একটি কমিটি আছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ: রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের যত্নে তাঁহারই ভবনে ইহা প্রথমে স্থাপিত হয়। এল, লিয়টার্ড সাহেব, পরলোকগত বাবু ক্ষেত্রগোপাল চক্রবর্তী এবং রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব—এই তিন জনই ইহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। তৎকালে প্রতীচ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বাঙ্গালা ভাষাকে পরিচিত করিয়া দেওয়া এবং তৎপ্রতি তাঁহাদের অনুরাগ উদ্রিক্ত করা, ইহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। মাননীয় অধ্যাপক মাক্স্ মুলার ও জন বিম্‌স্ ইহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে অধিকাংশ খ্যাতনামা বাঙ্গলা লেখকগণের মতানুসারে ইহার কার্যবিবরণীতে ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহারই স্থিরীকৃত হইল। রাজা বাহাদুরের অনুরোধে পরলোকগত পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বটব্যাল ইহার নাম "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্" রাখেন। এই সভার বেশ আয় দাঁড়াইয়াছে, নিজের আয়েই ইহার ব্যয়

নির্বাহ হইয়া থাকে। এক্ষণে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে একটি বাটিতে ইহার কার্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু শীঘ্রই সভার নিজের বাটী নির্মিত হইবে।

সাহিত্য-সভাঃ ইহাও রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের ঐকান্তিক যত্নে ও অর্থানুকূল্যে এবং তাঁহারই বাটিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার অনুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম. এ. বাহাদুর, মহারাজ কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, মাননীয় জাস্টিস সারদাচরণ মিত্র, পরলোকগত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, রায় বাহাদুর ডাক্তার চুনিলাল বসু, রায় বাহাদুর ডাক্তার সূর্যকুমার সর্বাধিকারী, বাবু শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বাবু অমৃতলাল বসু, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রমুখ শিক্ষিত মহোদয়গণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইতিহাস, ভূগোল বিবরণ, সমাজতত্ত্ব, গণিত, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন, ও অন্যান্য বিদ্যার আলোচনাই ইহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রেণীর প্রতি ইহা বিলক্ষণ শ্রদ্ধা-ভক্তি ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকে, কারণ তাঁহাদের সহায়তা ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুদ্ধার অসম্ভব। সাহিত্য-সংহিতা নামে এই সভার একখানি মুখপত্র আছেঃ পার্লামেণ্ট মহাসভার ব্লু-বুকেও তাহার যথেষ্ট সুখ্যাতি বাহির হইয়াছে। বঙ্গের ভূতপূর্ব লেফটেনাণ্ট গভর্ণর পরলোকগত সার জন উডবার্ণ ইহার কাযকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহার পেট্রন হইয়াছিলেন। বর্তমান লেফটেনাণ্ট গভর্ণর মহোদয় ইহার পেট্রন পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং বহু প্রধান প্রধান রাজপুরুষ ইহার সাহত যোগদান করিয়া আপনাদের সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায়

বাণিজ্য

বাণিজ্য আধুনিক ইতিহাসের একটি প্রধান অঙ্গ। ইহা রাজনীতির অর্ধাঙ্গ। কারণ জাতিবিশেষের প্রাধান্য তাহার ধনের উপর নির্ভর করে, এবং ধন আবার প্রধানতঃ বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে। নূতন নূতন দেশ আবিস্কার করিবার নিমিত্ত দুঃসাহসিক কাযে প্রবৃত্ত হইবার প্রকৃত কারণ অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেবল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাই উহার মূল কারণ নহে, বাণিজ্য বিস্তারের প্রবল বাসনাই উহার মূলে নিহিত। সামরিক অভিযানসমূহের মূলেও ঐ প্রবৃত্তি নিহিত। পূর্বে রাজারা প্রভুত্ব-সংস্থাপনোদ্দেশ্যে দিগিজয় ও রাজ্যা-

অধিকার করিতেন; এখন কিন্তু ধনস্পৃহাই উহার মূলীভূত কারণ। নীরস অনুর্বর দেশে আধিপত্য সংস্থাপন করিতে কোনও শক্তিশালী জাতিই ব্যগ্র হয় না। কথিত আছে যে, সংসর্গ দ্বারা লোকের চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সেইরূপ ইহাও সত্য যে, ধনের পরিমাণ দ্বারা জাতিবিশেষের অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীস, রোম বা ভারতে হয়ত এ ভাব প্রবল ছিল না; কিন্তু এখনকার অবস্থা ঐরূপই। অধুনা জাতিবিশেষের ক্ষমতা ইউরোপীয় মানদণ্ডানুসারে তাহার সামরিক শক্তিদ্বারা পরিমিত হইয়া থাকে, পরন্তু সেটা অর্থের ব্যাপার, কারণ তাঁহারাই বলেন, অর্থই সমরের পেশী।

কলিকাতার ক্রমোন্নতিতে বাণিজ্যই প্রধান সহায়—বোধ হয়, সর্বপ্রধান সহায়; সুতরাং বাণিজ্যদ্বারা এই নগরের কিরূপ অবস্থান্তর হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। অপরাপর জাতি ও দেশের সহিত বঙ্গবাসীদিগের কোন্ সময়ে বাণিজ্য সংস্রব ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার ভার পুরাতত্ত্বজ্ঞদিগের হস্তে অর্পণ করা যাইতে পারে। হীরেন, ম্যাক্‌ফার্সন ও অন্যান্য খ্যাতনামা লেখক-গণ এ বিষয়ে অনেকটা আভাস দিয়াছেন। সার উইলিয়ম হাণ্টার তাঁহার উড়িষ্যা-বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, পূর্বে বাঙ্গালীরা সমুদ্রে যাতায়াত করিত, কিন্তু বাণিজ্যের তদানীন্তন কেন্দ্র তমলুক নগর ধ্বংস হওয়াতে তাহাদের সমুদ্র গমন তিরোহিত হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের প্রাধান্যকালে বাঙ্গালীরা পূর্বে ও পশ্চিমে উভয় দিকেই বাণিজ্য-পোত প্রেরণ করিত, এবং আর্কিপেলেগো অর্থাৎ ঈজিয়ান্ সাগরের দ্বীপগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই প্রবাদবাক্য অদ্যাপি হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে।

ওয়াল্‌টার হ্যামিল্‌টন সাহেব অনুমান করেন যে, "দেশীয় বণিক্‌দিগের দশ লক্ষ পাউণ্ডের কম মূল্যের কাপড় কলিকাতায় প্রায় মজুত হইত না, এবং অন্যান্য সর্বপ্রকার পণ্যদ্রব্যও ঐ অনুপাতে মজুত হইত।"

"অনুমতি হইয়াছে যে, সে সময়ে দেশীয় মহাজন ও বণিক্‌গণের ১৬ লক্ষ পাউণ্ডেরও অধিক মূলধন খাটিয়া থাকে; ঐ অর্থ তাহারা কোম্পানির কাগজে নিয়োজিত করে, অপরাপর ব্যক্তিকে সুদে ও বাটায় দাদন করে, অন্তর্বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যে এবং বিবিধ প্রকারে খাটায়।...১৮০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৫০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়; ঐ ৫০ লক্ষের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের ১০ লক্ষ টাকা ছিল, এবং অবশিষ্ট টাকা অন্যান্য ব্যক্তির। ঐ ব্যাঙ্ক হইতে যে সমস্ত নোট বাহির হইত, তাহাদের মূল্য ১০ টাকার ন্যূন ও দশ হাজার টাকার অধিক নহে।"*

---

* ওরিএণ্ট্যাল কমার্স (প্রাচ্য বাণিজ্য) নামক পুস্তকে ব্যাঙ্ক-সংস্থাপন সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ লিখিত আছে:

"বঙ্গদেশে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়া ১৮০৯ সালের ২রা জানুয়ারি তারিখে

ওয়াণ্টার হ্যামিণ্টন সাহেবের ইষ্ট ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ার হইতে নিম্নোদ্ধৃত তালিকা দৃষ্টি করিলে প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে এ দেশের বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কতক আভাস পাওয়া যায়। ইহাতে ১৮১১ সালের ১লা জুন হইতে ১৮১২ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত ১১ মাসের হিসাব ধরা হইয়াছে:—

আমদানি

পণ্যদ্রব্য	...	... ...	১,১৩,৩৮,৬৯২
অর্থ	.	... ...	৬৭,৮৫,৬৯৮
	সিক্কা টাকা	...	১,৮১,২৪,৩৯০
			বা
	পাউণ্ড	...	২২,৬৫,৫৭৯

রপ্তানি

পণ্যদ্রব্য	...	... ...	৩,৪০,০৩,০০৯
অর্থ	.	... ...	৬,১৪,৬৭৩
	সিক্কা টাকা	...	৩,৪৬,১৭,৬০২
			বা
	পাউণ্ড ...	.	৪৩,২৭,২১
মোট	... ...	টাকা	৫,২৭,৪২,০৭২
			বা
	পাউণ্ড ...		৬৫,৯২,৭৫৯

সনন্দদ্বারা বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত সমাজরূপে পরিণত হয়। ইহার মোট মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকা এবং উহা দশহাজার টাকা করিয়া পাঁচশত অংশে বিভক্ত; তন্মধ্যে ১০০টি অংশ গবর্ণেমেণ্টের এবং অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য লোকের। কোম্পানির কর্মচারিগণ, ভিন্ন ভিন্ন বিচারালয়ের জজগণ, এবং অপরাপর ব্যক্তি ব্যাঙ্কের অংশীদার হইতে পারেন। ইহার কাজকর্ম নয় জন ডিরেক্টর দ্বারা পরিচালিত হয়; তিনজন গবর্ণমেণ্টের এবং অবশিষ্ট ছয় জন অপরাপর অংশীদারদিগের দ্বারা নির্বাচিত। ব্যাঙ্কের পক্ষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাণিজ্যে ও অপরের প্রতিনিধি স্বরূপ ক্রয়-বিক্রয়াদি কার্যে ব্যাপৃত হওয়া নিষিদ্ধ; যথাসম্ভব বাটা কাটিয়া লওয়া লোকের সম্পত্তির দলিল বা নিদর্শনপত্র বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ দেওয়া নগদ টাকার হিসাব রাখা, টাকা জমা রাখা এবং স্বদের আদান-প্রদান করা—কেবল এই সকল কার্যই ইহার করণীয়; তদ্ভিন্ন ইহা পণ্য স্বর্ণরৌপ্যের পিণ্ড, নগদ অর্থ, রত্নালঙ্কার, সোনা-রূপার বাসন-কোসন ও অন্যান্য যে সকল মূল্যবান বস্তু সহজে নষ্ট হয় না বা ক্ষয় পায় না, সেই সকল দ্রব্য যুক্তিসঙ্গত শর্তে জমা রাখিতে বা নিরাপদে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গ্রহণ করিতে পারে।”

১৮১১-১২ অব্দে কলিকাতায় আগত জাহাজাদি :

	সংখ্যা	টন
ইংরেজের পতাকাধারী	১৯৩	৭৮,৫০৪
পর্তুগীজ পতাকাধারী	১	৪,২৮০
আমেরিকান পতাকাধারী	৮	২,৩১৩
ভারতীয় পতাকাধারী * (দোনী সহিত)	৩৮৯	৬৬,২২৭
	৬০১	১,৫১,২২৪

১৮১১-১২ অব্দে কলিকাতা হইতে গত জাহাজাদি :

	সংখ্যা	টন
ইংরেজের পতাকাধারী	৯৪	৭৮,০৭২
পর্তুগীজ	১০	৪,০২০
স্পেনীয়	১	৬৫০
আমেরিকার	৮	২,০৬৯
ভারতীয় পতাকাধারী (দোনী সহিত)	৩৮৬	৬৫,৬৫০
	৫৯৯	১,৪৯,৭৬১

মিলবর্ণ সাহেবের ওরিএন্ট্যাল কমার্স নামক পুস্তকে অনেক প্রয়োজনীয় কথা জানা যাইতে পারে ; উহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

লণ্ডনের সহিত বাণিজ্য

১৮০২ হইতে ১৮০৬ অব্দ পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে লণ্ডন হইতে বঙ্গদেশে ও বঙ্গদেশ হইতে লণ্ডনে কত টাকার পণ্যদ্রব্যের ও ধনের আমদানি-রপ্তানি হইয়াছে, তাহার একটি বিবরণী প্রদত্ত হইল, এবং ১৮০৫ সালে কি কি মাল আমদানি-রপ্তানি হইয়াছে, তাহারও একটি বিবরণী দেওয়া গেল ; পরন্তু ইহাতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিজের বাণিজ্য ধরা হয় নাই।

---

* সিংহলদ্বীপে ও মালাবার উপদ্বীপে একপ্রকার একমাস্তুলে ছোট জাহাজের প্রচলন আছে, তাহাকে দোনী বলে। অনুবাদক।

লণ্ডন হইতে বঙ্গদেশে আমদানি

অব্দ	পণ্য দ্রব্য	অর্থ	মোট
	সিক্কা টাকা	সিক্কা টাকা	সিক্কা টাকা
১৮০২	৩৫, ৯০, ৬৮৩	১২, ৬৩, ৩৮৭	৪৮, ৫৪, ০৭০
১৮০৩	৩০, ৫৫, ৪০০	৯, ৮৫, ৬০১	৪০, ৪১, ০০১
১৮০৪	২৯, ৩৪, ৪৮৫	৭, ৯৭, ৬৮০	৩০, ৩২, ১৬৫
১৮০৫	৩৬, ২৮, ৩০১	৮, ৬৯, ৫৭৬	৪৪, ৯৭, ৮৭৭
১৮০৬	৫৯, ১২, ৫০০	৫, ৬৮, ৯২১	৬৪, ৮১, ৪২১
মোট	১, ৯১, ২১, ৩৬৯	৪৪, ৮৫, ১৬৫	২, ৩৬, ০৬, ৫৩৪

বঙ্গদেশ হইতে লণ্ডনে রপ্তানি

অব্দ	পণ্য দ্রব্য	অর্থ	মোট
	সিক্কা টাকা	সিক্কা টাকা	সিক্কা টাকা
১৮০২	১,১১,৪৫,২৬১	... .	১,১১,৪৫,১৬১
১৮০৩	১,০৮,১৫,৫৪৫	... .	১,০৮,১৫,৪৪৫
১৮০৪	৮৯,১৬,১৬৮	.. ..	৮৯,১৬.১৬৮
১৮০৫	৬০,৯৯,০৬৫	... ...	৬০,৯৯,০৬৫
১৮০৬	৯০,৩৪,৮৬৯	... ...	৯০,৩৪,৮৬৯
মোট।	৪,৬০,১০,৯০৮	.. ..	৪,৬০,১০,৯০৮

১৮০৫ সালের আমদানি মাল

			সিক্কা টাকা
পুস্তক	..	...	৯০, ৬৫৬
বুট ও জুতা	...	...	৫৪, ৭৩৫
ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি অস্ত্র ও অন্যান্য লৌহদ্রব্য		...	১, ৩৯, ১৪৪
তামা	...	...	১৩৫
গাড়ী	...	...	১, ১৬, ২১৮
	...	...	১৪, ১৭৮
কাচ ও দর্পণ	...	...	২, ৭৯, ৫৭৫

			সিক্কা টাকা
মোজা ও অন্যান্য পদাবরণ		...	১, ০৬, ৭৯৪
সূচ, ফিতা ইত্যাদি	...	...	৯৫, ৪৪৮
সাহেবী টুপী	...	...	৮০, ৬২৯
রত্নালঙ্কারাদি	...	...	২৮, ৬৩০
লোহার জিনিস	...	...	৬৫, ৯০৭
মেম সাহেবদের টুপী ও অন্যান্য মস্তকাবরণ		...	৯৭, ৭৪৬
যবাদি হইতে প্রস্তুত মদ্য		...	১, ৩৫, ২১২
নানাপ্রকার তৈল ও তৈলাক্ত দ্রব্য এবং লবণ জলে ওসির্কায় জারা দ্রব্য		..	১, ৬৫, ৭৬৩
সুগন্ধি দ্রব্য	...	...	৬৩, ৬২৪
খাদ্যদ্রব্য	...	..	৯৬, ৪৪৪
প্লেট ইত্যাদি (সাহেবদের বাসন-কোসন)		...	৫৬, ৫৯১
ঘোড়ার সাজ-সরঞ্জাম	...	...	১, ৩২, ৮২৭
মিষ্ট ও তীব্র মদ্য	...	...	৭, ৮৭, ২৬৫
ধাতু	...	...	১, ০৩, ৭৭৫
জাহাজের আবশ্যক দ্রব্য		...	৫৫, ৬৯৩
স্টেশনারি	...	...	৬১, ৪৮৭
পশমী দ্রব্য	...	...	১, ১৫, ৫৮০
বিবিধ	...	...	৬, ৯৪, ৪৫৩
অর্থ	..	...	৮, ৬৯, ৫৭৬
		মোট	৪৪, ৯৭, ৮৭৭

১৮০৫ সালের রপ্তানি মাল

পীস্ গুডস্	...	...	৩, ৩১, ৫৮২
নীল	...	...	৪৫, ২৩, ১২৪
শর্করা	...	...	৫৪, ৭৮
আদত রেশম	...	...	৭, ৮৭, ১০৬
তূলা	...	...	১, ১৮, ৯১২
হস্তিদন্ত	...	...	৯, ২৭৮
নানাপ্রকার বৃক্ষনির্যাস	...	...	২৪, ১৬০
আদা ও শুঁঠ	...	...	২, ৭৫০
Cossumba	...	...	৪, ৮১৫
Sal Ammoniac	...	...	২, ৬৮০
খদির	...	...	১, ০২৫

			সিক্কা টাকা
লাক্ষা	...	...	১২, ১৩৯
বিবিধ	...	...	৯, ৪৬৬

যে সকল আমদানি মাল পুনর্বার রপ্তানি হইয়াছিল :

মিষ্ট ও তীব্র মদ্য	...	...	৫৫, ১৭৬
কর্পূর	...	.	৭২, ০০৯
মসলা	...	...	২০, ৩৬৬
বন্য দারুচিনি	...	. .	২৪, ৯৮৩
পুস্তক	...	...	১৪, ৩৫৪
Caculus Indicus	..	...	৫, ৫৭১
কাফি	...	...	৪, ৬৭৬
Galls	...	...	২, ৫২০
বিবিধ	..	...	১৭, ৮৯৫
		মোট	৬০, ৯৯, ০৯৫

১৮০২ হইতে ১৮০৬ অব্দ পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে :

আমদানি পণ্যদ্রব্য	সিক্কা টাকা	১, ৯১, ২১, ৩৬৯
লণ্ডনে রপ্তানি পণ্যদ্রব্য		৪, ৬০, ১৩, ৯০৮
আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি অধিক		২, ৬৮, ৯২, ৫৩৯
ঐ কালমধ্যে আমদানি ধন		৪৪, ১৫, ১৬৫
পাঁচ বৎসরে বঙ্গে অর্থাগম		৩, ১৩, ৭৭, ৭০৪

বিনিময়ের হার টাকায় ২ শিলিঙ ৬ পেন্স ধরিলে, ৩৯,২২,২১,৩ পাউণ্ড হয়, অর্থাৎ প্রতি বৎসরের গড় ৭, ৮৪, ৪৪২ পাউণ্ড ১২ শিলিঙ।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী সাত বৎসরের (অর্থাৎ ১৭৯৫ হইতে ১৮০১ পর্যন্ত) বঙ্গ ও লণ্ডনের বাণিজ্যের আমদানি-রপ্তানি পণ্যদ্রব্যের হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ সময়ের আমদানি পণ্যদ্রব্যের মোট মূল্য ১, ৬৪,০৩,১৭৫ সিক্কা টাকা এবং রপ্তানি পণ্যদ্রব্যের মোট মূল্য ৫,৩৭,৪৫, ৫৭৯ সিক্কা টাকা; সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি ৩,৬৬,৪০৪ সিক্কা টাকা অধিক হইয়াছিল। আবার যদি ঐ সাত বৎসরে লণ্ডন হইতে বঙ্গে যে ৮২,২৩,৯২৪ সিক্কা টাকার অর্থ আমদানি হইয়াছিল, তাহা যদি পূর্বোক্ত টাকার সহিত একত্র করা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হয় যে, ঐ কালমধ্যে বঙ্গের ৪, ৪৮,৬৪,৩২৮ সিক্কা টাকা অর্থাগম হইয়াছিল, এবং বিনিময়ের হার প্রতি টাকায় ২ শিলিঙ ৬ পেন্স ধরিলে উহাতে ৫৬,০৮,০৪১

পাউণ্ড হয়, অর্থাৎ প্রতি বৎসরের গড় ৮,০১,১৪৮ পাউণ্ড ১৪ শিলিঙ ৩ পেন্স হয়। তবেই দেখা যাইতেছে, ১৮০২ সালের পূর্ববর্তী সাত বৎসরের প্রতি বৎসরের গড় অর্থাগম তৎপরবর্তী পাঁচ বৎসরের প্রতি বর্ষের গড় অর্থাগম অপেক্ষা ১৬,৭০০ পাউণ্ড ২ শিলিঙ ৩ পেন্স অধিক হইয়াছিল।

মিলবর্ণ সাহেব বলেন, ইংরেজদিগের পোতপরিচালনে অধিকতর নৈপুণ্য দেখিয়া বঙ্গদেশের সর্বশ্রেণীর বণিক্‌গণ তাহাদের বিদেশে রপ্তানিযোগ্য মাল ১৭১৫ সাল হইতে ইংরেজদিগের জাহাজে বোঝাই দিতে লাগিল ; ঐ সকল মাল দৌত্যের পরবর্তী দশ বৎসরে মোট ১০,০০০ টন হইয়াছিল ; তাহাতে অনেক লোকই কোম্পানির বাণিজ্যের ক্ষতি না করিয়া অথবা তাহাদের সম্পত্তি লইয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত বিবাদ না করিয়াও প্রচুর লাভবান হইয়াছিল, এবং কলিকাতার সর্বশ্রেণীর প্রজা এরূপ স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতে লাগিল যে, বঙ্গের অন্যান্য যে সকল প্রজা নবাবের অত্যাচারপূর্ণ শাসনাধীন ছিল, তাহারা তাহা অনুভব করিতে পারে নাই। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের সমকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির বহির্বাণিজ্যের বিবরণ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত একজন রিপোর্টার নিযুক্ত করেন এবং কিরূপ প্রণালীতে হিসাব রাখিতে হইবে, তাহার সবিশেষ উপদেশ প্রদান করেন। তদবধি বঙ্গের আমদানি ও রপ্তানি পণ্যদ্রব্য ও ধনের পরিমাণের সুস্পষ্ট ও বিস্তৃত বিবরণী এবং আমদানি-রপ্তানি মালের নামের তালিকা প্রতি বৎসর প্রস্তুত হইয়া ইউরোপে প্রেরিত হইয়া আসিতেছে।

বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির বাণিজ্য পশ্চাল্লিখিত কতিপয় বিভাগে বিভক্ত ; যথা :

১। লণ্ডনের সহিত বাণিজ্য (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য ব্যতিরিক্ত) ; ইহার সহিত কোম্পানির জাহাজের অধ্যক্ষ ও কর্মচারিগণের নিয়োজিত মূলধন, রাজা তৃতীয় জর্জের সময়ের ৩৩ আইনের ৫২ম অধ্যায়ানুসারে প্রদত্ত টনেজ হিসাবে অপরাপর ব্যক্তিদ্বারা চালানি মাল, এবং বঙ্গ হইতে পণ্যদ্রব্য ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার এবং তথা হইতে ইউরোপীয় পণ্যদ্রব্য লইয়া প্রত্যাগত হইবার অনুমতিপ্রাপ্ত দেশীয় জাহাজের মাল ধরা হইয়া থাকে।

২। ফরেন্ ইউরোপ নামে অভিহিত ইউরোপের অপরাপর অংশের সহিত অর্থাৎ ডেনমার্ক, হ্যামবুর্গ, লিসবন্, ম্যাড্রিয়া, কাডিজ প্রভৃতি স্থানের সহিত বাণিজ্য।

৩। আমেরিকার অন্তর্গত ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ নামক রাজ্যের সহিত বাণিজ্য।

৪। বৃটিশ (অর্থাৎ বৃটনাধিকৃত) এসিয়ার সহিত বাণিজ্য ; ১৮০১ সালে নিম্নলিখিত স্থানগুলি উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল, ঐ সময়ের পরে নূতন কতকগুলি স্থান অধিকৃত হইলেও পূর্বের সেই ব্যবস্থাই চলিতেছে :—

(১) মালাবার উপকূল; দক্ষিণ ভারত-উপদ্বীপের সমগ্র পশ্চিমাংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(২) করমণ্ডল উপকূল; সমগ্র পূর্ব উপকূলভাগ ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৩) সিংহলদ্বীপ।

(৪) সুমাত্রার উপকূল।

৫। ১৮০১ সালে ফরেন্ (অর্থাৎ বৃটিশ অধিকারের বহির্ভূত) এশিয়া নামে পরিচিত নিম্নলিখিত স্থানগুলির সহিত বাণিজ্য; ইহাদের মধ্যে কয়েকটি স্থান পরে বৃটিশ অধিকারভুক্ত হইলেও পূর্ব ব্যবস্থাই চলিতেছে:

(১) আরব্য ও পারস্য উপসাগর

(২) পেগু

(৩) পেনাঙ ও তাহার পূর্ববর্তী স্থানসমূহ

(৪) মালাক্কা

(৫) বাটাভিয়া

(৬) ম্যানিলা

(৭) চীন

(৮) অন্যান্য স্থান। অন্যান্য স্থান বলিতে প্রধানতঃ এইগুলি বুঝিতে হইবে, যথা—মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ, মোজাম্বিক ও আফ্রিকার পূর্বোপকূলস্থ অন্যান্য বন্দর, নিউসাউথ ওয়েলস্, উত্তমাশা অন্তরীপ, সেণ্ট হেলেনা ইত্যাদি।

ভারতবর্ষের অন্তর্গত এক বন্দরের সহিত অপর বন্দরের বাণিজ্যকে সাধারণতঃ দেশীয় বাণিজ্য বলে; ইহা সাধারণ লোকের হস্তগত ছিল, কোম্পানি ইহাতে কখনও হস্তক্ষেপ করিতেন না। আর ইহাও দেখা যায় যে, তৎকালে উত্তমাশা অন্তরীপের পূর্বভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া (এক জাপান ব্যতীত) এমন কোনও বাণিজ্যপ্রধান স্থান ছিল না যেখানে কোম্পানির অধিকারের অধিবাসী ইংরেজ বা দেশীয় বণিকৃগণ বাণিজ্য না করিত; ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শৈশবে জাপানের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। বহুকাল পর্যন্ত এক ওলন্দাজ ব্যতীত অন্য সমস্ত ইউরোপীয় জাতির পক্ষেই জাপানে গমন নিষিদ্ধ ছিল; এই নিষেধ সত্ত্বেও কিছু দিন পূর্বে একখানি জাহাজ কলিকাতা হইতে প্রেরণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা বাণিজ্য করিবার অনুমতি লাভ করিতে পারে নাই। ১৭৯৩ সালের আইন বিধিবদ্ধ হওয়া পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষ ও চীনের সহিত বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকাব ছিল। সুতরাং কোনও সাধারণ ব্যক্তিকেই তাহার নিজ হিসাবে বাণিজ্য করিতে দেওয়া হইত না। যদি কেহ কোম্পানির সুস্পষ্ট অনুমতি না লইয়া বাণিজ্য করিত, তাহা হইলে সে নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডনীয় হইত, এবং তাহাকে 'ইণ্টার্সোপার' (অর্থাৎ অনধিকারে বাণিজ্যকারী) বলিত। ওয়াল্টার হ্যামিলটন সাহেব লিখিয়াছেন:

"কলিকাতা হইতে দেশের অভ্যন্তর ভাগে নানা স্থানে নৌচালনের বিলক্ষণ সুবিধা আছে, বিদেশের আমদানি মাল গঙ্গা ও তাহার তোয়দাসমূহ দিয়া হিন্দুস্থানের উত্তরাংশে নানা স্থানে অনায়াসে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে, এবং মফঃস্বলের মূল্যবান উৎপন্ন দ্রব্যসমূহও ঐ পথ দিয়া কলিকাতায় আনান যাইতে পারে। পরন্তু হুগলী-সেতু ও ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য এতাদৃশ অধিকপরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, কস্মিনকালেও সেরূপ হয় নাই। উত্তরকালে নির্মিত অন্য অনেক রেলওয়ের সহিত ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের সংযোগ হইয়াছে। হুগলী-সেতু 'ক্যান্টিলিভার' (লম্বমান) প্রণালীতে নির্মিত, উহা চিরকালই ঐ প্রণালীর একটি চমৎকার নিদর্শন হইয়া থাকিবে। ইহাতে তিনটি খিলান আছে; তন্মধ্যে মধ্যবর্তী খিলানটি নদীর মধ্যস্থলে দুইটি সুদৃঢ় পিল্লার উপর অবস্থিত; আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খিলান নদীর দুই তীর হইতে বহির্গত হইয়া মধ্যস্থিত খিলানের দুই প্রান্তের উপর অবস্থিতি করিতেছে, তাহাদের নিজের স্বতন্ত্র পিল্লা নাই। এইরূপে নদীর উভয়তীরস্থ দৃঢ় পাকাগাঁথুনি সেতুর দুই প্রান্তের এবং মধ্যস্থলের সুদৃঢ় পিল্লা দুইটি সেতুর অবশিষ্টাংশের অবলম্বন-স্বরূপ হইয়াছে। মধ্যস্থলের পিল্লা দুইটির মূল সাগর তলের ১০০ ফুট নিম্নে অর্থাৎ নদীগর্ভের ৭০ ফুট নিম্নে প্রোথিত হইয়াছে। পিল্লা দুইটি ৬৪ ফুট বালুকা ও পলি, ১ ফুট তরঙ্গ চালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ড, এবং ৮ ফুট পীতবর্ণ কঠিন এটেল মাটির মধ্য দিয়া নিম্নাভিমুখে চালিত হইয়াছে। জল যতদূর উচ্চে উঠিতে পারে, সেই সর্বোচ্চ সীমারও ৩৬৷৹ ফুট উর্ধ্বে সেতুটি অবস্থিত; সুতরাং স্টীমার ও দেশীয় বড় বড় বাণিজ্য-নৌকা সেতুর নিম্ন দিয়া অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে। সেতুটি সর্বসুদ্ধ ১২০০ ফুট দীর্ঘ; তন্মধ্যে নদীর উভয় তীর হইতে বিস্তৃত খিলান দুইটির প্রত্যেকে ৪২০ ফুট এবং মধ্যস্থলের খিলানটি ৩৬০ ফুট দীর্ঘ। সেতুটির নির্মাণে সম্ভবতঃ প্রায় ৯০০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।"

মিস্টার এ. কে. রায় বলেন, বঙ্গদেশে ইংরেজদের বাণিজ্য প্রথমে বালেশ্বর হইতে আরম্ভ হয় এবং তাঁহাদের প্রথম জাহাজ 'ফকন' ৪০,০০০ পাউণ্ডের অধিক মূল্যের পণ্য স্বর্ণ-রৌপ্যের পিণ্ড ও অন্যান্য দ্রব্য লইয়া সাহসে ভর করিয়া নদী দিয়া হুগলী নগরে উপস্থিত হয়। কথিত আছে যে, ১৭০৪ সালে বন্দর-শুল্ক ৫০০ টাকা হইয়াছিল। টন হিসাবে 'পাসের' শুল্ক ৩৮৪ টাকা হইয়াছিল, এবং উহা মান্দ্রাজ ও ইউরোপ হইতে আগত জাহাজ হইতে আদায় হইয়াছিল। প্রতি টনে এক টাকা শুল্ক নির্ধারিত ছিল। কোম্পানি আপনাদের 'পাইলট'গণকে অপরের জাহাজে কাজ করিতে দিতেন না। কিন্তু পাইলটদিগের সাহায্য গোপনে গ্রহণ করা হইত বলিয়া কোম্পানি কঠোরতা অবলম্বন করিলেন। পরন্তু ডিরেক্টর-সভা নদীতীরে জাহাজ হইতে মাল নামান ও জাহাজের মাল বোঝাই কার্যের সুবিধা করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে যুবকগণকে পাইলটের কার্যে

গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৭৭০ সালে বা তৎসমকালে প্রথম 'জেটি' নির্মিত হয়।

এক সময়ে এ দেশ হইতে সোরার চালান অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। মিস্টার এ. কে. রায় লিখিয়াছেন: 'মহারাণী য়্যানের সময় ইউরোপে যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে সোরার অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল; সেইজন্য কোম্পানির সৈন্যেরা পাটনা হইতে সোরা নদীর নিম্নাভিমুখে আসিবার সময়ে অতি সতর্কতার সহিত দৃষ্টি রাখিত। ১৭১০ সালের সমকালে সোরার চালান হ্রাস পড়িয়া আসে।'

জাহাজ নির্মাণ সম্বন্ধে এক ব্যক্তি 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন:

১৭৭০ সালের পর জাহাজনির্মাণের কাজ বেশ একটু জোর চলিতে লাগিল; সে সময়ে শালকাঠই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইত। কাপ্তেন ওয়াট্‌সন তাঁহার খিদিরপুরের ডক্-ইয়ার্ডে যে জাহাজ নির্মাণ করেন, তাহার বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ঐ জাহাজ জলে ভাসাইবার সময়ে ওয়ারেন হেস্টিংস এবং তাঁহার পত্নী উপস্থিত ছিলেন এবং ঐ উপলক্ষে পরে যে ভোজের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতেও তাঁহারা উভয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই ঘটনার পর লণ্ডন নগরে লেভেনহাক স্ট্রীটের সংসৃষ্ট ডক্-ইয়ার্ডের লোকেরা এবং জাহাজ-নির্মাতারা ভারতের জাহাজ-নির্মাণ কার্য সাতিশয় ঈর্ষার চক্ষে দেখিতে লাগিল। এমন কি অনেকদিন পরে ১৮১৩ সালেও ইংলণ্ডের জনৈক লেখক জিজ্ঞাসা করিতেছেন: —"কোম্পানি যে জাতি নিকট সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই কাতির প্রকৃত ক্ষতি ও প্রভূত হানি করিয়া ভারতবাসীদিগকে যে জাহাজ নির্মাণকার্যে নিযুক্ত করে, ইহা কি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় নহে?" এই ব্যাপারে কোম্পানি যেরূপ মহাভ্রমে পতিত হইয়াছে, তাহাতে যদি অব্যাহত বাণিজ্য চলিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কিরূপ ব্যাপার ঘটিবে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে; অধিক লাভার্থী ইংরেজ বণিকেরা যদি ইংলণ্ডের মূলধন ভারতবর্ষে লইয়া যায়, তাহা হইলে বোধ করি সে দেশে ডক্-ইয়ার্ড বহু পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং সেই অনুপাতে অনুপাতে ইংলণ্ডের কারিকরদিগেরও ক্ষতি বর্ধিত হইবে। বারাকপুরের নিকটস্থ টিটাগড় নামক স্থানে নদীতীরে একটি বৃহৎ জাহাজ নির্মাণশালা ছিল; তথায় ৫,০০০ টন বোঝাই লইতে পারে এরূপ একটা প্রকাণ্ড জাহাজ নির্মিত হইয়াছিল। ঐ জাহাজ ভাসাইবার সময়েও লিভারপুলের জাহাজনির্মাতারা ঈর্ষ্যাপ্রকাশ করিতে ত্রুটি করে নাই। যে স্থানে পুরাতন টাঁকশাল ছিল, ঐ স্থানে তৎপূর্বে গিলবার্ট সাহেবের জাহাজ-নির্মাণের আড্ডা ছিল।

১৭৬২ সালে কলিকাতায় প্রথম মুদ্রা প্রস্তুত হয়; কিন্তু ১৭৭০ সাল পর্যন্ত তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হয় নাই। পয়সার তখন চলন ছিল না বলিলেই হয়। কড়ির

প্রচলনই তৎকালে অধিক ছিল। ইহার বহুপূর্বে ১৬৮০ অব্দে স্মিথ নামক কোন সাহেব ইংলণ্ড হইতে বার্ষিক ৬০ পাউণ্ড বেতনে 'য়্যাসেমাস্টার' (মুদ্রা-পরীক্ষক) নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। পুরাতন টাঁকশাল সেণ্ট জন্স্ চার্চ নামক গির্জার পশ্চিমে অবস্থিত ছিল; তথায় ১৭৯১ হইতে ১৮৩২ সাল অব্দ পর্যন্ত কোম্পানি আপনার টাকা প্রস্তুত করিতেন। স্ট্রাণ্ড রোডের উপরিস্থ নূতন টাঁকশাল ১৮৩২ সালে খোলা হয়। ১৭৯১ সালের পূর্বে ফুরানে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া লওয়া হইত। তাম্রমুদ্রা প্রধানতঃ প্রিন্সেপ সাহেব (পরলোকগত জেম্স্ প্রিন্সেপের পিতা) প্রস্তুত করিতেন; ফল্তায় তাঁহার একটি কারখানা ছিল। মুদ্রায় আপনাদের নাম মুদ্রিত করা (মোগলের মস্তক ও পারসী-লিপি সংবলিত হইলেও) ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি প্রথম প্রথম গৌরবের বিষয় মনে করিতেন।

ইংরেজের বাণিজ্য যে কলিকাতাকে বর্তমান অবস্থায় পরিণত করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণ সত্য যে, সেই বাণিজ্য দ্বারা ইংরেজ ধনীরা প্রচুর লাভবান হইয়াছেন। কিন্তু তথাপি ইংলণ্ডে এমন কতকগুলি লোক ছিল, যাহারা এই বাণিজ্যকে ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখিত। কলিকাতা রিভিউ পত্রে একজন লিখিয়াছিলেন: "ইংলণ্ডে একদল ক্ষমতাশালী লোক ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা উচ্চরবে তুমুল আন্দোলন ও গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছিল।" খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভিন্ন ভিন্ন বহু দেশের সহিত, বিশেষতঃ আমেরিকা, চীন প্রভৃতির সহিত, বাণিজ্য আরম্ভ হইয়াছিল। ১৭৮৯ সালে ইউরোপীয় পণ্যদ্রব্যসমূহ আসল খরচা দামেরও অর্ধমূল্যে ভারতবর্ষে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছিল। কথিত আছে যে, বাজারে ঐ সকল দ্রব্যের অত্যন্ত আধিক্য হওয়ায়, ঐরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কোম্পানির জাহাজের অধ্যক্ষগণ ও অন্যান্য কর্মচারীরা সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল। অতঃপর কর্তৃপক্ষ যখন বুঝিলেন যে, সত্য সত্যই তাহাদের বিশেষ কষ্ট হইয়াছে, তখন তাঁহারা কোম্পানির রপ্তানি মালের উপর দেয় শুল্ক রহিত করিয়া দিলেন।

১৭৮৪ সালের জেণ্টল্‌ম্যান্স্ ম্যাগাজিন্ (Gentleman's Magazine) নামক পত্রে পশ্চাল্লিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হয়:

"ইউরোপীয় বাণিজ্যের যাবতীয় বিভাগের মধ্যে পূর্ব ভারতের সহিত বাণিজ্য বিভাগটি যেরূপ দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে, আর কোনও বিভাগই সেরূপ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। ইউরোপের সামুদ্রিক শক্তিশালী জাতিগুলি বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে এশিয়াতে যে সকল জাহাজ প্রেরণ করেন, তাহাদের সংখ্যা পূর্ণ পঞ্চাশৎ নহে; তন্মধ্যে ইংলণ্ড ১৪ খানি, ফ্রান্স ৫ খানি, হল্যাণ্ড ১১ খানি, ভিনীস্ ও জেনোয়া একত্রে ৯ খানি, স্পেন্ ৩ খানি এবং ইউরোপের অবশিষ্ট অংশমাত্র ৬ খানি জাহাজ প্রেরণ করেন। তৎকালে রুশিয়েরা বা ইম্পিরিয়ালিস্টরা (সাম্রাজ্যানুরাগীরা) একখানিও জাহাজ প্রেরণ

করেন নাই। ১৭৪৪ সালে ইংরেজেরা তাঁহাদের প্রেরিত জাহাজের সংখ্যা বাড়াইয়া ২৭ খানি করেন, এবং ভিনীস্ ও জেনোয়াবাসীরা মাত্র ৪ খানি ও ইউরোপের অবশিষ্টাংশ ন্যূনাধিক ৯ খানি প্রেরণ করেন। বর্তমান সময়ে (১৭৮৪) ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির ৩০০ জাহাজ পূর্ব ভারতীয় বাণিজ্যে নিযুক্ত আছে; তন্মধ্যে এক ইংলণ্ডেরই ৬৮ খানি; ইহাই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মোট জাহাজ-সংখ্যা। গত বৎসর ফরাসীদিগের ৯ খানি, পর্তুগীজদিগের ৪৮ খানি এবং অবশিষ্টগুলি রুশিয়া ও স্পেনীয়দিগের। কিন্তু এক্ষণে ভিনীস বা জেনোয়াবাসীরা ভারতবর্ষে একখানিও জাহাজ প্রেরণ করে না।"

সেকালে কোম্পানির কর্মচারীরাও আপন নামে স্বতন্ত্রভাবে বাণিজ্য করিতেন, অনেক সময়ে প্রভু ও ভৃত্যের স্বার্থে পরস্পর সংঘর্ষ উপস্থিত হইত, এবং তাহার ফল যাহা হইত তাহা বর্ণন করা অপেক্ষা অনুমান করা সহজ। বোণ্টন্ সাহেব বলেন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা নিজে নিজে কলিকাতায় এক পৃথক কোম্পানি গঠন করিয়া লবণ; সুপারি ও তামাকের ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। এই কোম্পানির অস্তিত্ব দুই বৎসরমাত্র ছিল; আর কথিত আছে যে, এই সময় মধ্যে অংশীদারেরা মোট ১০,৭৪,০০২ টাকা লাভ পাইয়া ছিলেন। এই কোম্পানির মূলধন ৬০ অংশে বিভক্ত ছিল। এইরূপ স্বতন্ত্র বাণিজ্যের দ্বারা কোম্পানির বাণিজ্য ব্যাঘাত পাইত বলিয়া ইংলণ্ডের ডিরেক্টর-সভা ইহা রহিত করিয়া দেন।

'ওরিএন্টাল কমার্স' নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, 'কোম্পানির জাহাজের অধ্যক্ষগণ ও কর্মচারীরা নিজ নিজ নামে স্বতন্ত্রভাবে ১৭৮৪ হইতে ১৭৯১ সাল পর্যন্ত যে বাণিজ্য করিয়াছিলেন, তাহা লণ্ডনে কোম্পানির বিক্রয় নিম্নলিখিত পরিমাণে দাঁড়াইয়াছিল; ইহার ভিতর চীন হইতে আমদানি মালও ধরা হইয়াছে; তাহার আনুমানিক মূল্য বার্ষিক ২,৫০,০০০ পাউণ্ড হইবে:

অব্দ			পাউণ্ড
১৭৮৫—৮৬	...	..	৬, ১১, ২০৫
১৭৮৬—৮৭	...	..	৫, ৪৭, ৩৩৭
১৭৮৭—৮৮	...	...	৯, ১৮, ৩৮৯
১৭৮৮—৮৯	.	..	৮, ১০, ৫১৬
১৭৮৯—৯০	...	...	৮, ৩৮, ৪৮৪
১৭৯০—৯১	..	...	৯, ৩০, ৯৩০
১৭৯১—৯২	..	...	৭, ০৯, ৪৫০
১৭৯২—৯৩	...	...	৭, ০৩, ৫৭৮
		মোট	৬০, ৬৯, ৮৮৯

আট বৎসরে এই যে ৬০,৬৯,৮৮৯ পাউণ্ড হইল, ইহা হইতে চা, চীনা-বাসন, ন্যাপকিনের কাপড়, ঔষধ প্রভৃতি চীনা মালের আনুমানিক মূল্য বৎসরে

২,৫০,০০০ পাউণ্ড হিসাবে বৎসরে ২০,০০,০০০ পাউণ্ড বাদ দিলে ভারতীয় দ্রব্যের মূল্য ৪০,৬৯,৮৮৯ পাউণ্ড দাঁড়ায়। বাণিজ্য-শুল্ক ইহার অন্তর্নিবিষ্ট আছে, কারণ এই সময়ে কি রপ্তানি মালের উপর, কি স্বদেশে ব্যবহৃত দ্রব্যের উপর সমস্ত শুল্কই কোম্পানিকে দিতে হইত, এবং পরে রপ্তানি মালে কাটিয়া লইতে হইত।

মিলবর্ণ সাহেব বলেন, "ইউরোপ হইতে বৈদেশিকগণ যে বাণিজ্যের পরিচালনা করেন, তাহা সাতিশয় হিতকর, কারণ তাঁহাদের আমদানি মালের অধিকাংশই অর্থ ··তাঁহাদের লাভ দেশে নির্মিত দ্রব্যে করা হয়···আর এই বাণিজ্যদ্বারা বাঙ্গলার যে অর্থাগম হইয়াছে, তাহা বার বৎসরের গড় করিলে শুল্ক ব্যতীত বৎসরে ৫,০০,০০০ পাউণ্ড হয়; তদ্ভিন্ন কলিকাতাবাসী ইংরেজদিগের লাভ আছে,—তাঁহারাই যাবতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান এজেণ্ট (কর্মকর্তা)।"

'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে জনৈক লেখক ইউরোপীয় বণিক্‌দিগের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে মর্সেল নামক একজন ওলন্দাজ লেখকের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। মর্সেল ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন: "বহু বৎসর যাবৎ তাহারা উৎকট মহাপাপসমূহের ও অতীব গর্হিত অসাধুতার অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে, কোম্পানি বিশ্বাস করিয়া তাহাদের হস্তে যে সকল দ্রব্য দিয়াছেন, সেগুলি তাহারা আপনাদের লুণ্ঠনসামগ্রী গণ্য করিয়াছে। তাহারা অতীব নির্লজ্জভাবে স্বেচ্ছাচারিতার সহিত চালানে লিখিত মূল্য কৃত্রিম করিয়াছে।" বণিক্‌দিগের নীতিজ্ঞানের অভাবই তাহাদের দোষের একমাত্র কারণ নহে; আলস্যও ইহার একটি প্রধান কারণ। গ্র্যাণ্ড প্রী মাদ্রাজ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, কলিকাতা সম্বন্ধেও তাহা বেশ খাটে। তিনি লিখিয়াছেন: "পণ্ডিচারি অপেক্ষা মাদ্রাজের বাণিজ্য আরও সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণকায়দিগের করায়ত্ত, কারণ তথাকার কুঠিগুলি অধিকতর বিস্তৃত ও লাভজনক এবং বিক্রয়ও খুব বেশী। ইউরোপীয় বণিক্ হিসাবের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বাবগুলি মোটেই দেখেন না, তাঁহার দোভাষী তাঁহাকে হিসাবের যে মোটামুটি সংক্ষিপ্ত খতিয়ান দেখায়, কেবল তাহারই প্রতি দৃষ্টিপাত করেন; তিনি কারবারের স্থানের বহুদূরে বাস করেন এবং যেভাবে জীবন যাপন করেন, তাহাতে এরূপ তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষার ভাব স্বাভাবিক; কারণ তিনি দিবসে একবার মাত্র কারবারের স্থানে গমন করেন, তাহাও নিয়মিতরূপে নয়, এবং দিনের মধ্যে বড় জোর দুই তিন ঘণ্টা কাজকর্ম দেখেন।"

সিভিলিয়ানদিগের নীতিজ্ঞান ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ছিল না। ক্লাইভ সমার ও ভেরেলিস্ট সিভিলিয়ানদিগের চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত কয়েকজন কমিশনার নিযুক্ত করেন; তাঁহারা ১৭৬৫ সালে ডিরেক্টর সভার নিকট এইরূপ রিপোর্ট করেন: "তাহাদের চরিত্রের কথা বলিতে হইলে,

তাহাদের কাজকর্ম দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেক চক্র উৎকোচগ্রহণ দোষে দূষিত, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের ভাব সর্বত্র প্রবল, এবং উৎকট অর্থলালসায় উদারতার প্রত্যেক কণা, প্রত্যেক ভাব নির্বাণপ্রাপ্ত ও বিলুপ্ত।" ইতিহাসে এরূপ প্রমাণও বিরল নহে যে, এমন অনেক লোক ছিলেন, যাঁহারা কোম্পানির চাকুরিতে নিযুক্ত হইয়া এ-দেশে আসিতেন, এবং তৎপরে নিজ নামে কারবার খুলিয়া কোম্পানির চাকুরি ছাড়িয়া দিতেন। উইলিয়াম বোল্টস্ নামক একজন সাহেব ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহার ধমনীতে জার্মান শোণিত প্রবাহিত ছিল। তিনি কোম্পানির কর্মচারী হইয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, কিন্তু চাকুরি ছাড়িয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন এবং আট বৎসরে নয় লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়া বসেন। পাদরি লঙ সাহেব বলেন, ইউরোপীয়দিগের মধ্যে উইলিয়াম বোল্টসই প্রথমে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করেন, এবং তিনি "Consideration of Indian Affairs" নামক একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। পরন্তু তিনি হাঙ্গামাপ্রিয়তা ও অসচ্চরিত্রতার জন্য নির্বাসিত হন।

অতি প্রাচীন কাল হইতে বড়বাজার বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর্মানী, মাড়ওয়ারি ও অন্যান্য জাতীয় লোকেরা জব্ চার্ণক সাহেবের কলিকাতায় আগমনের পূর্ব হইতেই এখানে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। শেঠ ও বসাকগণও প্রাচীনকাল হইতে এখানে বাণিজ্য করিতেছিল। পূর্বে কলিকাতায় প্রায় সর্বপ্রকার পণ্যদ্রব্যের উপরেই এক প্রকার শুল্ক আদায় করা হইত। এই পণ্যশুল্ক Town duty (টাউন ডিউটি অর্থাৎ নগরশুল্ক) নামে অভিহিত হইত। স্টার্নডোল সাহেব লিখিয়াছেন: "১৭৯৫ সালের মে মাসে কলিকাতার নগরশুল্কগুলি রহিত করা হইয়াছিল, কিন্তু ১৮০১ সালের মে মাসে কয়েকটি ব্যতীত আর সমস্তগুলিই পুনঃ স্থাপিত হয়।" ১৮১০ সালে শুল্কগুলি পুনর্বার রহিত হইয়া যায়, কিছুদিন পরে তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অবশেষে ১৮৮৬ সালে তাহা চিরদিনের জন্য রহিত হইয়া যায়। প্রথম প্রথম সকল মালেরই উপর শুল্ক আদায় হইত বটে, কিন্তু বোধ হয় কয়েক বৎসর পরে শস্যের উপর কয়ালী ব্যতিরেকে অন্য কোন শুল্ক গ্রহণ করা হইত না; কারণ ১৭৭৩ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে যে বিজ্ঞাপনপত্র প্রচারিত হয়, তদ্বারা এইরূপ ঘোষিত হয় যে, এই প্রেসিডেন্সিতে পূর্বাপর যেরূপ প্রথা চলিয়া আসিতেছে, তদনুসারে অন্যান্য বাণিজ্যদ্রব্যের ন্যায় সর্বপ্রকার সুরা ও খাদ্যদ্রব্য এবং শস্য ব্যতীত নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বস্তুর নিমিত্ত শুল্ক দিতে হইবে। পরন্তু ইহাও ঘোষিত হয় যে, কাস্টম মাস্টারের অনুমতি ব্যতিরেকে কলিকাতা শহরের সীমার মধ্যে শস্য নামাইতে পারা যাইবে না এবং কয়াল বা কাস্টম হাউসের কর্মচারিগণের সাক্ষাতে শস্য বিক্রয় করিতে হইবে ও তাহারা কলিকাতার পূর্বাপরপ্রচলিত প্রথাক্রমে বিক্রীত শস্যের কয়ালী আদায় করিবে। ১৭৬৫ সালে কলেক্টর গ্রে

সাহেব নগরের বারবিলাসিনীদিগের নিকট হইতেও শুল্ক আদায় করিতে ছাড়েন নাই; কিন্তু পরে লর্ড ক্লাইভ ঐরূপ শুল্কের অনুমোদন না করায় তাহা রহিত হইয়া যায়।

স্টার্নডোল সাহেব লিখিয়াছেন: "কলিকাতা লুণ্ঠনের পূর্বে কিন্তু ঠিক কোন্ বৎসরে তাহা আমি নির্ণয় করিতে পারি না,—ইউরোপীয়দিগের কুঠির সর্বপ্রকার দ্রব্যের বিক্রয়ের উপর নগর শুল্কস্বরূপ শতকরা ৫ টাকা কমিশন আদায় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু ইউরোপীয় অধিবাসীরা এই প্রস্তাবের এরূপ তীব্র প্রতিবাদ করেন যে, ডিরেক্টর সভা ১৭৫৭ সালে এই সঙ্কল্প পরিহার করিবার আদেশ প্রদান করিতে বাধ্য হন। তথাপি কিন্তু দেশীয়দিগের এবং আর্মানী ও পর্তুগীজদিগের নিকট হইতে এই কর আদায় করা হইত।"

বোল্টস্ সাহেব বলেন: "বিবাহ করিবার লাইসেন্স (অর্থাৎ অনুমতি-পত্র) লইবার নিমিত্ত প্রত্যেক পক্ষের নিকট হইতে ৩ সিকা টাকার হিসাবে যে কর গ্রহণ করা হইত, তাহাও নগর-শুল্কের মধ্যে পরিগণিত ছিল। পরন্তু এরূপ লাইসেন্স যে কখনও কাহাকেও দেওয়া হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন আফিসের দলিলপত্রে পাওয়া যায় না। তদ্ভিন্ন ক্রীতদাস (গোলাম) ও নৌকা বিক্রয়ের উপরও শতকরা হিসাবে কর গ্রহণ করা হইত।" বোল্টস সাহেব আরও বলেন, —"গঞ্জসমূহে যে সমস্ত শস্য এবং কলিকাতার বাজারসমূহে যে সকল নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু ও অন্যান্য দ্রব্য আনীত হইত, তৎসমস্তের নিমিত্ত একটা আমদানি শুল্ক দিতে হয়, এবং কালেক্টর সেই শুল্কসংগ্রহের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। কলেক্টর ঠিকাদারদিগকে বহুবিধ হস্তশিল্পের ব্যবসায় পরিচালনের অধিকার ঠিকা দিয়া থাকেন; ঐ সকল ঠিকাদারেরা আবার প্রকৃত ব্যবসায়চালক দিগের নিকট হইতে তাহাদের স্ব স্ব ব্যবসায় পরিচালনের লাইসেন্সের নিমিত্ত কিছু কিছু কর আদায় করে, এবং অপরাপর লোকের নিকট হইতে তাহাদের দৈনিক মজুরির অংশ গ্রহণ করিতেও ছাড়ে না।"

ঐ সময়ে কিরূপ ভাবের শুল্ক বা কর আদায় করা হইত, নিম্নে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে:

"রামেশ্বর সমরুত গোপের প্রতি। যে বা যাহারা শ্রাদ্ধের সময় ষাঁড় দাগিতে ইচ্ছা করিবে, তুমি তাহাদের নিকট প্রচলিত 'ফি' (কর) লইবে; কিন্তু তাহা যেন বলপূর্বক লওয়া না হয়, আর কোনরূপ অনুচিত বা অতিরিক্ত 'ফি' আদায় করিলে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই কার্য হইতে তৎক্ষণাৎ বরতরফ হইবে। ১লা এপ্রিল, ১৭৬৫।"

"নিমাইচরণ দাস ব্রজবাসী ফকিরের প্রতি। কলিকাতা শহর ও ডিহি সমূহের সীমার মধ্যস্থ প্রত্যেক দোকান হইতে ভিক্ষুকগণের পোষণার্থ দানস্বরূপ তুমি প্রতিদিন এক কড়া হিসাবে আদায় করিবে। কলিকাতা, ৩১শে জুলাই, ১৭৬৫।"

"এতদ্বারা কলিকাতা শহরবাসী সেক নন্কুকে পাট্টা প্রদান করিয়া এইরূপ একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইতেছে যে, কলিকাতা শহরের ও ১৫ ডিহির অধিবাসী ভদ্রলোক ও অপরাপর লোকের মদ্যাদি শীতল করিবার নিমিত্ত যে শোয়ার জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সে সমস্তই উক্ত ব্যক্তি ক্রয় করিতে ও তাহা ফুটাইয়া পুনর্বার শোরা প্রস্তুত করিতে পারিবে। এই অধিকার লাভের নিমিত্ত তাহাকে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারে বার্ষিক ১০১ সিক্কা টাকা দিতে হইবে। এই পাট্টার মেয়াদ ৩ বৎসর ; ঐ ৩ বৎসর কাল ইহা বলবৎ থাকিবে।

কলিকাতা রেভেনিউ কমিটি, ১লা মার্চ, ১৭৭৭। ফিলিপ এম্ ডেফার্স।"

নবাব মহাম্মদ রেজা খাঁ লিখিয়াছেন যে, "স্থানীয় বহুল ব্যবহারের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিত, এরূপ বহুবিধ স্বদেশোৎপন্ন ও প্রস্তুতীকৃত দ্রব্য পূর্বকালে সওদাগর ও বণিক্‌গণ ভূমণ্ডলের নানা অংশে চালান দিতেন। তাঁহার মতে তৎকালে এদেশে বহুসংখ্যক অর্থবান লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ক্ষমতা ও প্রভাব ঈর্ষ্যার চক্ষে লক্ষিত হইত না। মোগলরাজগণ দেশীয় বাণিজ্যের বিলক্ষণ উৎসাহদাতা ছিলেন ; কিন্তু মীরজাফরের সময়ে এই অবস্থায় সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটে, —দেশীয় বণিক্‌দিগকে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের শোণিত শোষণ করা হইত। বণিক্‌গণ তৎকালে মহাজনী কারবার করিতেন, এবং রাজা ও জমিদারেরা রাজসরকারের প্রাপ্য পরিশোধ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতেন। রেজা খাঁ বলেন, তদ্দ্বারা বণিক্‌দিগের ধন বৃদ্ধি হইত, এবং প্রজা ও কৃষকগণ কষ্টে পড়িলে বণিক্‌গণ তাহাদের শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যজাত উচিত মূল্যে কিনিয়া লইতেন। ইহাতে উভয় শ্রেণীর কাহারই স্বার্থহানি ঘটিতে পারিত না। রেজা খাঁ আরও বলেন যে, তৎকালে প্রবল দুর্বলের উপর উৎপীড়ন করিলে ও তজ্জন্য অভিযোগ উপস্থিত হইলে, হাকিমগণ তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেন এবং অপরাধীকে যথোচিত দণ্ড প্রদান করিতেন। মহম্মদ রেজা খাঁ দেশের ভূতপূর্ব ও বর্তমান অবস্থা, ইহার হীনতাপ্রাপ্তির কারণ, ইহার পূর্ববৎ উন্নত অবস্থা পুনরানয়নের উপায়, এই সমস্ত বিষয়ের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তৎপাঠে এই সকল কথা সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়। সার ফিলিপ ফ্রান্সিস্ ও অপর কয়েকজনের অনুরোধে তিনি এই বিবরণ লিখিয়া তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করেন। উহা এক্ষণে ভারত গবর্ণমেণ্টের হোম বিভাগের দলিলপত্রের মধ্যে আছে।

ফর্স্টার সাহেব তাঁহার ১৭৮২-৮৩ অব্দের ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, তিনি হীরাট নগরে ১০০ জন হিন্দু বণিক্‌কে বাণিজ্য করিতে দেখিয়াছিলেন ; এতদ্ভিন্ন তার্শীশ্ নগরে আর ১০০ জন হিন্দু বণিক্ ব্যবসায় করিত। অপর কতকগুলি বণিক্ বাকুমশীদ, ভেজ্‌দ্ এবং কাস্পীয়ান ও পারস্য উপসাগরের উপকূল প্রদেশে স্থানে স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ফর্স্টার সাহেব বাকুতে এমন একজন সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, কতিপয় হিন্দু বণিক্ তাঁহাকে তাঁহাদের

রুশিয়াদেশস্থ গোমস্তাগণের নিকট অনুরোধপত্র প্রদান করেন। ঐ সন্ন্যাসী ইংল্যাণ্ডে যাইতেও ইচ্ছুক ছিলেন। হিন্দুরা কলিকাতার ন্যায় আস্ত্রাকান নগরেও বসতি স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু তথায় তাঁহাদের পরিবার ছিল না।

এতদ্দেশে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির বাণিজ্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলা আবশ্যক। অতি প্রাচীনকাল হইতে ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষের সহিত পারস্য উপসাগর ও লোহিতসাগরের পথে বাণিজ্য করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীকরাজ আলেকজাণ্ডারের সময় হইতে ভাস্কোডা-গামার সময় পর্যন্ত ইউরোপীয় পর্যটকেরা ভারতভ্রমণে আসিতেন এবং এতদ্দেশের অপরিমেয় ধন, অতুল ঐশ্বর্যাড়ম্বর ও ভূমির উর্বরতার অত্যদ্ভুত বিবরণসমূহ স্ব স্ব দেশে লইয়া যাইতেন; পরন্তু তৎকালে স্থলপথ ও সাগরপথই যে একমাত্র নৈসর্গিক বিঘ্নরূপে দণ্ডায়মান হইত তাহা নহে, প্রত্যুত মধ্যবর্তী ভূভাগসমূহের সমরপ্রিয় জাতিরাও নিয়মিত বাণিজ্যপরিচালন বিষয় দুষ্কর করিয়া তুলিত। প্রকৃতপক্ষে তৎকালে স্থলপথে ও তৎপরে লোহিতসাগর দিয়া অতি কষ্টে প্রধানতঃ ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী ইটালীর নগরসমূহের সহিত এবং তথা হইতে লেবাঁচের বন্দরগুলির সহিত বাণিজ্য চলিত। পরে ভাস্কো-ডা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ পরিবেষ্টনপূর্বক ভারতে আসিবার সমুদ্রপথ আবিষ্কার করিবার পর হইতে ইউরোপীয় বাণিজ্য অতি খরবেগে প্রসার ও উন্নতিলাভ করিতে থাকে। এক শতাব্দীরও অধিক কাল পর্তুগীজ জাতিই প্রাচ্য বাণিজ্যে সম্পূর্ণ একাধিপত্য স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। পর্তুগীজদিগের অভ্যুদয় ও তাহাদের অধঃপাতের কারণ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ওলন্দাজেরাই প্রথমে পর্তুগীজদিগের একাধিপত্য বিনষ্ট করেন। উইলিয়াম ব্যারেণ্টস্ ও অপর কয়েক ব্যক্তি পোতারোহণে ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তর উপকূল ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আসিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ওলন্দাজদিগের মধ্যে কর্নেলিয়স হুইটম্যান নামক এক ব্যক্তিই সর্বপ্রথমে উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া ১৫৯৬ অব্দে সুমাত্রা ও বাণ্টমে উপস্থিত হন। ওলন্দাজেরা ১৬০০ হইতে ১৭০০ অব্দ পর্যন্ত কেবল প্রাচ্য সমুদ্রে কেন, ভূমণ্ডলের সকল অংশেই, সর্বপ্রধান সামুদ্রিক শক্তি হইয়া পড়িয়াছিলেন। ওলান্দাজ কর্তৃক ১৬২৩ অব্দে আম্বয়না নগরে ইংরেজদিগের হত্যাকাণ্ডের পর ইংরেজেরা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ত্যাগ করিয়া ভারত উপদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন, সুতরাং তদবধি ওলন্দাজরা তথায় একাধিপত্য স্থাপন করেন।

ইহারই সমকালে ওলন্দাজেরা পর্তুগীজদিগকেও এক স্থান হইতে স্থানান্তরে বিতাড়িত করিতে থাকেন এবং অবশেষে তাঁহাদের প্রায় সমস্ত অধিকৃত স্থানগুলি কাড়িয়া লন। তাঁহারা ১৬৩৫ অব্দ হইতে ১৬৫৯ অব্দ পর্যন্ত পর্তুগীজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন; পরন্তু ক্লাইভ সাহেব তাঁহাদের ভারতের প্রাধান্যের বিলোপ সাধন করেন। ১৭৯০ হইতে ১৮১১ অব্দ পর্যন্ত ইংরেজ ও ফরাসী জাতিতে যে তুমুল সংগ্রাম চলিতে থাকে, সেই সময়ের মধ্যে ইংরেজেরা

ওলন্দাজদিগের অধিকৃত স্থানগুলি সমস্তই কাড়িয়া লন। কিন্তু উত্তরকালে যবদ্বীপ ও মালক্কা তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পিত হয় ও সুমাত্রা গৃহীত হয়। ভারতীয় বাণিজ্যে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির অকৃতকার্যতা সম্বন্ধে সার ইউলিয়াম হাণ্টার যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিলক্ষণ কৌতুকাবহ ও শিক্ষাপ্রদ। তিনি বলেন, পর্তুগীজদিগের অকৃতকার্যতার কারণ এই যে, তাহারা এক হস্তে বাইবেল গ্রন্থ ও অপর হস্তে তরবারি গ্রহণরূপ অসম্ভব কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল, অর্থাৎ তাহারা যুগপৎ ভারত সাম্রাজ্য জয় করিতে ও ভারতবাসীদিকে বলপূর্বক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। ওলন্দাজদিগের অকৃতকার্যতার কারণ এই যে, তাহারা বাণিজ্যবিষয়ে একচেটিয়া অধিকার সংস্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়াছিল; কিন্তু তাদৃশ কার্যে কস্মিনকালেও সফলতা লাভ করিতে পারে না। ফরাসীরা তীক্ষ্ণবুদ্ধিজীবী হইলেও তাহাদের অব্যবস্থিতচিত্ততা এবং পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ও সহকারিতার অভাবে তাহারা ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই। জার্মানি-অষ্ট্রীয়া, এতদ্দেশে কখনও কোন স্থান অধিকার করে নাই, কিন্তু তাহাদের বাণিজ্য বরাবব চলিয়া আসিতেছে। কলিকাতর বাণিজ্যে অদ্যাপি তাহাদের বিলক্ষণ আধিপত্য বিদ্যমান। সে সকল স্থানে প্রচুর তণ্ডুল পাট ও কার্পাস জন্মে, সেই সকল স্থানে জার্মাণ বণিকৃগণের গোমস্তাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইংরেজরা বহুকাল হইতে এমন কি রাজা সপ্তম হেনরির সময় হইতে ভারতবর্ষে আসিতে অভিলাষী হন। ১৫৫০ অব্দে সার হিউ উইলোবী নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তরাংশ দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু কৃতকার্য হন নাই। ইহার কিছু পরে তাঁহারই সহকারী চ্যান্সেলের নামক একজন সুইডেনবাসী মস্কাউ নগরের গ্রাণ্ড ডিউকের কৃপায় একটি পথ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন, এবং তাহার ফলে ভারতবর্ষ পারস্য, বোখারা ও মস্কো—এই কয়েকটি স্থানের মধ্যে স্থলপথে বাণিজ্য করিবার অভিপ্রায়ে রুশীয় কোম্পানি স্থাপিত হয়। পূর্বে ভারতে আসিবার একটি উত্তর-পূর্ব পথ আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত ১৫৭৬ হইতে ১৬১৬ পর্যন্ত বহুবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সাফল্য লাভ ঘটে নাই। ফবিসার ডেভিস্, হডসন, বেফিন প্রমুখ ব্যক্তিগণ আধুনিক মানচিত্রে আপনাদের অবিনশ্বর চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। অবশেষে ভূমণ্ডলবেষ্টনকারী স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক মালক্কা দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্বর্তী টার্নেটর বন্দরে উপনীত হন এবং সেই দ্বীপের রাজা ইংরেজদিগকে লবঙ্গ প্রদান করিতে স্বীকার করেন। সার উইলিয়ম হাণ্টার ইংরেজজাতির কৃতকার্যতার এইরূপ কারণ নির্দেশ করিয়াছেন:

"বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি ভারতবর্ষের জন্য যে দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে ইংরেজেরাই বিজয়ী হইয়া বহির্গত হন। তাঁহাদের সাফল্য লাভের আংশিক কারণ সৌভাগ্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার প্রধান

কারণ জাতীয় চরিত্রের চারিটি বিশিষ্ট গুণ। প্রথমতঃ, অত্যদ্ভুত সহিষ্ণুতা এবং যত দিন না তাঁহার যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন, ততদিন দেশ বা রাজ্য জয়ে অপ্রবৃত্তিরূপ আত্মসংযম। দ্বিতীয়তঃ, দেশ বা রাজ্য জয়ে প্রবৃত্ত হইবার পর সে বিষয়ে অদম্য অধ্যবসায় এবং ইংরেজ কর্মচারিগণের পরাজয়ে উৎসাহহীনতার অভাব। তৃতীয়তঃ, বিপদের সময় কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের পরস্পরের প্রতি ঐকান্তিক ও অদম্য বিশ্বাস ও নির্ভর। চতুর্থতঃ ও প্রধানতঃ ইংলণ্ডস্থ ইংরেজজাতির সম্পূর্ণ সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা। তাঁহারা নিশ্চিত জানিতেন যে, ভারতীয় ইংরেজদিগের উপর যে-কোনরূপ আপদ্-বিপদ্ আপতিত হউক না কেন. ইংল্যাণ্ডকে তাহার উদ্ধার সাধন করিতেই হইবে। আর ইংল্যাণ্ড ইউরোপের কূটরাজনীতির কথায় পড়িয়া কখনই আপনার ভারতীয় কর্মচারিগণকে বিসর্জন দেন নাই। ইউরোপায় শক্তিপুঞ্জের মধ্যে একমাত্র ইংল্যাণ্ডই ধর্মজ্ঞানের সহিত এই দুইটি নীতির অনুসরণে কার্য কবিয়া আসিতেছেন ; এবং সার্ধ দ্বিশত বৎসর কাল এই নীতি অনুসারে কার্য করিবার ফল বর্তমান ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষ।

কিঞ্চিদধিক ২৫০ বৎসর হইল, কলিকাতায় ইংরেজদিগের বাণিজ্যের সূত্রপাত হইয়াছে। এই কাল মধ্যে ইহা যেরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহাতে উহার বর্তমান পরিমাণ সঠিকরূপে নির্ণয় করা একপ্রকার অসাধ্য বলিলেই হয়। একমাত্র বাণিজ্যেই যে কলিকাতাকে বহুবিধ কার্যের কেন্দ্রস্থল করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সভ্যজগতের সকল জাতিই ইহার বিষয় ব্যাপারে স্বার্থ সংস্রব-বিশিষ্ট। চীনদেশ ও পেরু এতদুভয়ের মধ্যবর্তী ভূভাগে যে বিভিন্ন জাতির বাস, তত্তাবৎ জাতিকেই এখানে সতেজে বাণিজ্য ব্যবসায় করিতে দেখা যায়, এবং তদ্দ্বারা তাহারা এত ধন উপার্জন করে যে, তাহা দেখিয়া ঐশ্বর্যশালী রাজাগণের হৃদয়েও ঈর্ষানল উদ্রেক হইতে পারে। ভূমণ্ডলের প্রায় সকল অংশ হইতেই দূতগণ স্ব স্ব জাতির স্বার্থ-সংরক্ষণ নিমিত্ত এখানে প্রেরিত হইয়া থাকেন। বহু খাল ও রাস্তা নির্মিত হইয়াছে, জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়াছে, এবং সমগ্র প্রদেশ প্রফুল্লোদ্যানের ন্যায় হাস্যময়ী মূর্তি ধারণ করিয়াছে। রেলওয়ে লাইন ও টেলিগ্রাফের তার দ্বারা কলিকাতা ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল অংশের সহিত সংযোজিত হইয়াছে। এমন কি, শান্তিপ্রিয় হিন্দুও অধুনা অর্থকরী বাণিজ্যের কুহকে বিমুগ্ধ। দেখা যায়, হিন্দুও বাণিজ্যে নিমজ্জিত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে ; বোধ হয় যেন, বর্তমান সময়ে ব্যবসায় অতীত অন্য কোন বিষয়েরই চিন্তা তাহার মনোমধ্যে স্থান পায় না। ইহা নিঃসন্দেহ, এ বিষয়ে প্রতীচ্য জগৎ প্রাচ্য জগৎকে বিমোহিত করিয়াছে। নানা প্রকারের মিল (অর্থাৎ কলকারখানা), ডকৃইয়ার্ড (জাহাজ মেরামতের আড্ডা), গাঁট কষার হাউস ও কুঠিসকল সংস্থাপিত হওয়ায় অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের অবস্থা স্বচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের বেতন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলতঃ আজকাল

গৃহস্থঘরে দাস-দাসী পাওয়া একবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। যে যাহা হউক, নানাপ্রকার শ্রমশিক্ষা ও বাণিজ্যের প্রসার হওয়াতে বহু লোকের অবস্থা যে ভাল হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বর্তমান সময়কে বাণিজ্য-যুগ বলা যাইতে পারে। কৃষি-ব্যবসায়েও নানা প্রকার সংস্কার ও উন্নতি প্রবর্তিত হওয়ায় দরিদ্র কৃষিজীবিগণের প্রভূত উপকার হইয়াছে। কুসিদজীবী মহাজনদিগের হস্তে তাহাদের অযথা সর্বনাশ হইতেছিল; তাহাদিগকে সেই ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত নানা স্থানে ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রতীকারের অন্যান্য উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। কল-কারখানা দ্বারা দরিদ্র কৃষকগণের যে বহুবিধ উপকার হইয়াছে, তন্মধ্যে স্বল্পমূল্য বস্ত্র এবং স্বল্পব্যয়ে ও স্বল্প সময়ে রেল বা স্টীমার যোগে কৃষিজাত দ্রব্যসমূহের দূরবর্তী বাজারে ও সুবিধাজনক স্থানে প্রেরণ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবার সেই সঙ্গে বিদ্যাবুদ্ধির আলোচনাসংক্রান্ত কেন্দ্রস্থলসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহার প্রভাব অতি দূরবর্তী অঞ্চলেও ছড়াইয়া পড়িতেছে। বীমা আফিস সমূহের সংস্থাপন বাণিজ্যযুগের এক অভিনব নিদর্শন। বাণিজ্যের প্রসার সাধনে ইহা বিলক্ষণ হিতকর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পরন্তু বাণিজ্যের এবং কল-কারখানার দ্বারা দ্রব্যজাত প্রস্তুত করণের বৃদ্ধির চিত্রের এক পৃষ্ঠ, যেরূপ সমুজ্জ্বল ও মনোহর, অপর পৃষ্ঠটি সেই পরিমাণে তমসাচ্ছন্ন ও বিভীষিকাময়। কলকার-খানা দ্বারা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ প্রস্তুত করিবার ব্যবসায় প্রসার লাভ করায় এতদ্দেশের যে কি বিষম অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করা যায় না। ইহারই বিষময় ফলে আমাদের হস্তচালিত তাঁতের কার্য বিলুপ্ত হওয়ায় তন্তু-বায়গণের এবং অন্যান্য শ্রেণীর শ্রমশিল্পীদিগের মুখের গ্রাস স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। হস্ত দ্বারা যে নানা প্রকার পশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহারও সর্বনাশ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, সুরাপানাদি অমিতাচার, অমিতব্যয়িতা প্রভৃতি কতকগুলি পাপ সমাজে প্রবেশ করিয়া যে কতদূর অপকার করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এখনই এই, আর কিছুদিন পরে যে কিরূপ অবস্থা হইবে তাহা ভাবিলেও অন্তরাত্মা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। প্রকৃত রাজনীতিবিদ্ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের ইহা সবিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া এই সময় প্রতিকারের পথ স্থির করা অবশ্য কর্তব্য।

অষ্টম অধ্যায়

ইংরেজ শাসনাধীনে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারবিতরণের ইতিবৃত্ত

ভল্‌টেয়ার বলিয়াছেন, "কোন প্রকার শাসনপ্রণালীই এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নির্দোষ হইতে পারে নাই, কারণ মানুষ চিরদিনই ষড়রিপুর অধীন; তাহাদের যদি রিপুই না থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের কোন প্রকার শাসনপ্রণালীরই প্রয়োজন হইত না। মানুষের সহিত মানুষের বিবাদস্থলে মানুষ দ্বারা বিচার বিতরণ ব্যাপারে পূর্বোক্ত উক্তির সত্যতা সবিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়া থাকে। কথায় বলে, আদিম অবস্থায় "জোর যার মুলুক তার" ছিল। প্রথম সৃষ্ট মনুষ্য যৎকালে নিজ প্রয়োজন সাধনার্থ ভূমি বেষ্টন করিয়া লন এবং স্বয়ং তাহা ভোগ করিতে থাকেন, তৎকালে তিনি সেই ভূমির অধিকারী ও স্বামী হইয়া পড়েন। ইহা হইতেই তাঁহার স্বত্বের উদ্ভব হয়। বর্তমান সভ্য দেশসমূহে পুরোহিত-বিচাবালয়গুলির কার্যাবলী অতি অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। প্রোটেস্টাণ্টগণ কর্তৃক ক্যাথলিকদিগের প্রতি এবং ক্যাথলিকগণ কর্তৃক প্রোটেস্টাণ্ট দিগের প্রতি ব্যবহার পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, রিপুগণ কিরূপে বিচারবুদ্ধিকে বিকৃত করে। হায়! অত্যাচার-উৎপীড়ন এইখানেই শেষ হয় নাই। পাপীদিগের চিরনরক ভোগের নিমিত্ত ভগবানের ক্রোধ ও অভিশাপের প্রার্থনা করা হইত। মানুষ যতদিন রিপুর অধীন থাকিবে, ততদিন পক্ষপাতশূন্য পূর্ণ ন্যায়বিচারের আশা করা বিড়ম্বনামাত্র। মানব গর্বের ফল সম্বন্ধে রুশোর উক্তির মধ্যে এমন একটি সত্য নিহিত আছে, যাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তিনি বলেন, "সমাজের বিশৃঙ্খলাসমূহের মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষ যে সমস্ত বিপৎপাত হইতে ক্লেশ পায়, সেগুলি ভ্রান্তি হইতে উদ্ভূত হয়,—অজ্ঞতা হইতে আরও অধিক উদ্ভূত হয়—আর আমরা যাহা আদৌ জানি না, সেগুলি আমাদের যত ক্ষতি করে, তাহা অপেক্ষা আমরা যাহা জানি বলিয়া মনে করি, সেগুলি তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি করে।

১৭শ ও ১৮শ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানেরা যে ভাবে বিচার বিতরণ করিতেন, তাহার নিন্দা করা কতকগুলি লেখকের রীতি হইয়া উঠিয়াছে। ঐ সময়ে ফ্রান্সে এবং ইউরোপের অন্যান্য অংশে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার আইনই এরূপ কঠোর ছিল এবং তন্নিবন্ধন নীতিসমূহের মধ্যে কতকগুলি এরূপ

অসঙ্গত ছিল যে,, তত্তুলনায় মুসলমানদিগের আইনকানুনগুলিকে অনেক শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে।

নবাব মহম্মদ রেজা খাঁ বলেন যে, মুসলমান-শাসনকালে দুই প্রকার বিচারালয় ছিল: একটির নাম ছিল—আদালত, অর্থাৎ আলিয়া বা নবাবের নিজ বিচারালয়, এবং অপরটির নাম ছিল—খালসা কাছারি। এই শেষোক্ত বিচারালয়ে ভূমির রাজস্ব, ঋণ ও অন্যান্য প্রকার মোকদ্দমার শুনানি ও মীমাংসা হইত। এই বিচারালয়ে যে রায় প্রকাশ করা হইত, তাহাতে হাকিমের অর্থাৎ বিচারকের স্বাক্ষর থাকিত। আদালতে অর্থাৎ নবাবের নিজ বিচারালয়ে খুন, ডাকাতি ও অন্যান্য গুরুতর অপরাধের ফৌজদারী মোকদ্দমাগুলির শুনানি ও বিচার হইত। এই বিচারালয়ে কয়েকজন বিচারক থাকিতেন, কিন্তু শেষ হুকুম দিবার ক্ষমতা নবাব স্বহস্তে রাখিতেন। বিচারকদিগের মধ্যে যিনি সর্বপ্রধান বা অধ্যক্ষ থাকিতেন, তিনি নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মোকদ্দমার সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া দিতেন, এবং মোকদ্দমার রায় সম্বন্ধে সকল বিচারকের মত এক হইলে নবাব তাহাতে স্বাক্ষর করিতেন। আসামীর নিজ ধর্ম ও আইন-অনুসারে তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করা হইত।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ সি. ডি. ফীল্ড সাহেব লিখিয়াছেন, মুসলমান-রাজত্বকালে দুই বিভিন্ন শ্রেণীর বিচারালয় কর্তৃক বিচার বিতরিত হইত; যথা—(১) কাজিদিগের অধিষ্ঠিত বিচারালয়। ইহারা মুসলমান আইনের সু-বিস্তৃত ব্যবস্থা অনুসারে কায করিতেন, এবং (২) রাজপুরুষগণের অধিষ্ঠিত বিচারালয়; ইহারা কোন নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন হইয়া কার্য করিতেন না, পরন্তু আপনাদের স্বার্থসাধনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই কার্য করিতেন, বিশেষতঃ বিবদমান পক্ষদ্বয় ভিন্ন জাতীয় ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইলে ইঁহারা বড়ই সুবিধা পাইয়া বসিতেন; কিন্তু রাজা সময়ে সময়ে আবেদনাদির তদন্ত করিতেন; কিন্তু যুদ্ধ ব্যাপারে ও রাজকীয় অন্যান্য কার্যে অথবা অন্তঃপুরের আমোদপ্রমোদে তাঁহাকে অধিক সময় ব্যাপৃত থাকিতে হইত বলিয়া তিনি বিচার-বিতরণ-কাযে নিয়মিত-রূপে বা কোনরূপ প্রণালীসঙ্গতভাবে যোগদান করিবার অবসর পাইতেন না। সুবাসমূহে অর্থাৎ বিভিন্ন প্রদেশগুলিতেও ঐ দুই শ্রেণীর বিচারালয় ছিল। কাজি সবিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তি হইলে তদনুপাতে বিচারবিতরণ-কার্যেও তাঁহার প্রভাব অধিক হইত; কিন্তু সাধারণতঃ সুবাদারগণ ও তাঁহাদের কর্মচারীরা অপেক্ষাকৃত গুরুতর মোকদ্দমাগুলির বিচারের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতেন, কাজেই সেস্থলে কাজি দলিলপত্র রেজিস্টারী করিবার ও বিবাহ সম্পন্ন করিবার কর্মচারীমাত্রে পরিণত হইয়া পড়িতেন। কোম্পানিকে দেওয়ানী সনন্দ প্রদানের অব্যবহিত পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদে যে সকল বিচারসম্পর্কীয় কর্মচারী ছিলেন, নিম্নে তাঁহাদের একটি তালিকা দেওয়া হইল:

১। নাজিম—ইনি প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধীদিগের বিচারকালে স্বয়ং প্রধান বিচারপতিরূপে অধ্যক্ষতা করিতেন।

২। দেওয়ান—ভূসম্পত্তিসম্পর্কীয় মোকদ্দমার বিচারভার ইহার হস্তে ছিল; কিন্তু ইনি খুব কম সময়ই স্বয়ং এই ক্ষমতার পরিচালনা করিতেন।

৩। দারোগা-আদালত-আলআলিকা অর্থাৎ ফৌজদারী আদালতে নাজিমের প্রতিনিধি—ইনি বিবাদ, ঝগড়া ও গালাগালির এবং ভূসম্পত্তি ও উত্তরাধিকার ব্যতীত অন্যান্য প্রকার সম্পত্তিসংক্রান্ত যাবতীয় মোকদ্দমার বিচার করিতেন।

৪। দারোগা-ই-আদালত দেওয়ানী—অর্থাৎ দেওয়ানী আদালতের দেওয়ানের প্রতিনিধি।

৫। ফৌজদার—অর্থাৎ পুলিসের কর্মচারী ও প্রাণদণ্ডযোগ্য নহে এরূপ যাবতীয় মোকদ্দমার বিচারক।

৬। কাজি—ইনি উত্তরাধিকারসংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার করিতেন।

৭। মুক্তাসিব—ইঁহার হস্তে মাতলামি এবং সুরা ও অন্যান্য নেশার জিনিস বিক্রয় সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার বিচার এবং কৃত্রিম বাটখারা ও কাঠাপালি প্রভৃতি পরিমাণ-যন্ত্রগুলির তদন্তের ভার ছিল।

৮। মুফ্‌তি—ইনি কাজির নিকট আইনের ব্যাখ্যা করিতেন, এবং কাজি তাহাতে একমত হইলে, তদনুসারে মীমাংসা করিতেন। তিনি ভিন্নমত হইলে নাজিমের নিকট তাহা নিবেদন করা হইত, এবং নাজিম অন্যান্য বিচারকদিগকে লইয়া একটি সভা করিতেন।

৯। কানুনগো—অর্থাৎ ভূমির রেজিস্ট্রার। ইঁহার নিকট ভূমিঘটিত মোকদ্দমার বিচারভার সময়ে অর্পণ করা হইত।

১০। কোতয়াল অর্থাৎ নিশাকালের শান্তিরক্ষক কর্মচারী। ইনি ফৌজদারের অধীন।

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিচার-বিতরণে ও পুলিসের কার্যে পশ্চাদুক্ত কর্মচারিগণ নিযুক্ত ছিলেন, যথা—(১) মীর-ই-আদল অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি, ইনি বোধহয় কাজি অপেক্ষা উচ্চপদস্থ ছিলেন, কারণ কাজির রায়ে ইঁহার অনুমোদন প্রয়োজন হইত; (২) শান্তিস্থাপন ও পুলিস রক্ষার নিমিত্ত ফৌজদার, এবং (৩) কোতয়াল অর্থাৎ নগরের হেড্ কনেস্টবল। ফৌজদার ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। মুসলমান রাজত্বের শেষাংশে বিচার-বিতরণের কার্য অনেকটা হীন হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্মাধিকরণগুলি নিরীহ নির্দোষ প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়নের প্রধান যন্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি, অতি সামান্য জমিদারেরাও আপনাদের এক একটি বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া বসিয়াছিল। সমরপ্রিয় দুঃসাহসিক পুরুষেরাই সমস্ত ক্ষমতা ও প্রভুত্ব আত্মসাৎ করিয়াছিল; তাহারা আপনাদের প্রভুত্ব

অক্ষুণ্ণভাবে বজায় রাখিবার অভিপ্রায়ে ধনবান ও বিত্তশালীদিগের বিভব লুণ্ঠন করিত। এরূপ অবস্থায় আইন-ই-আকবরী এবং প্রবলপ্রতাপ সম্রাট আলমগীর অর্থাৎ ঔরঙ্গজেবের ফেতাওয়াই-আলেমগিরি গ্রন্থের বিধিব্যবস্থাসমূহ যে উপেক্ষিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? সেগুলি তৎকালে নিতান্ত অকার্যকর হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্বোক্ত প্রকার দুঃসাহসিক পুরুষেরা এবং দস্যু-তস্করেরাই ন্যায়বিচারের বিধিব্যবস্থাসমূহ ব্যাখ্যা করিত। তৎকালে প্রত্যেকেই এক-একজন প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। ইতোমধ্যে ইউরোপীয়েরা রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাদের ব্যবসায় বাণিজ্য-সংক্রান্ত দ্বেষাদ্বেষি ও বিবাদবিসংবাদসমূহ তৎকালীন বিশৃঙ্খল অবস্থার পরিমাণ শতগুণে বর্ধিত করিয়া তুলিল।

হিন্দুরা কি ভাবে বিচারকার্য নির্বাহ করিতেন, তৎসম্বন্ধে আমরা কোন কথাই বলি নাই। আমাদিগের গ্রন্থের আয়তন আমাদিগকে তদ্বিষয়ে পূর্ণ আলোচনা করিতে দিতেছে না। মনুর ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কতিপয় স্মৃতিগ্রন্থ হইতে দেওয়ানী, ফৌজদারী, মিউনিসিপাল ও অপরাপর বিষয়সংক্রান্ত হিন্দু-ধর্মাধিকরণসমূহের পূর্ণতত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। ঐ সকল পুস্তকের অনেকগুলিই অধুনা ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ পাঠকগণ ঐ সমস্ত অনুবাদ পাঠ করিলে অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। ইংরেজ-শাসনকালের প্রথম অবস্থায় "জাতিমালা-কাছারী" নামে একটি হিন্দু বিচারালয় ছিল। তৎপ্রসঙ্গে ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব লিখিয়াছেন, "সাধারণতঃ জাতি-মালা কাছারী নামে অভিহিত জাতিবিষয়ক বিচারালয়টি গভর্ণমেণ্টের ন্যায় প্রাচীন, এবং ইহার কার্যকলাপ দেশের অন্যান্য বিচারালয়ের ন্যায় নিয়মিত ও শৃঙ্খলাসম্পন্ন।" ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবের উক্তি হইতে ইহাও জানা যায় যে, অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে যে সকল বিবাদ উপস্থিত হইত, এই বিচারালয় তাহারই নিষ্পত্তি করিত। ইহার কার্যবিবরণী হইতে প্রতীয়মান হয় যে, গভর্ণর জেনারেলের বেনিয়ানগণই (মুচ্ছুদ্দিগণই) স্বয়ং গভর্ণরের পরিবর্তে ইহার অধ্যক্ষতা করিতেন।

১৬৯৮ (১৬৯৯) খ্রীষ্টাব্দে বা তৎসমকালে কলিকাতা নগরী প্রেসিডেন্সি পদবীতে উন্নীত হয়, এবং এই প্রেসিডেন্সির নাম হয় "ফোর্ট উইলিয়াম ইন্ বেঙ্গল (Fort Williaim in Bengal)"। একজন প্রেসিডেণ্ট (সর্বাধ্যক্ষ) এবং নিম্নলিখিত কর্মচারিগণ-সংবলিত একটি কাউন্সিল (মন্ত্রিসমাজ) নিয়োজিত হন। কর্মচারিগণের পদের নাম, যথা—(১) একাউন্টাণ্ট (Accountant), (২) মালগুদামরক্ষক (Ware-house-keeper), (৩) ম্যারীন পার্সার (Marine Purser) এবং (৪) রিসিভার অভ রেভিনিউ বা কলিকাতার কলেক্টর (Receiver of Revenue or Collector of Calcutta)। জন্ বেয়ার্ড সাহেব কাউন্সিলের প্রথম প্রেসিডেণ্ট হইলেন। সর্বপ্রকার কার্য—বস্তুতঃ, সমস্ত

শাসনব্যাপার প্রেসিডেণ্ট ও কাউন্সিলের হস্তে ন্যস্ত ছিল। তৎকালে কোনরূপ বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী এলিজাবেথ যে সনন্দ প্রদান করেন, তদ্দ্বারা বণিক্ কোম্পানি আপনাদের ক্ষমতা লাভ করেন এবং সে ক্ষমতা স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাতে অন্যান্য নিয়মও দৃষ্ট হয়, যথা—"কোম্পানি এরূপ ও এত-গুলি আইন-কানুন, বিধি-ব্যবস্থা এবং আদেশ-নির্দেশ প্রস্তুত ও বিধিবদ্ধ করিতে পারিবেন, যাহা তাঁহাদের নিকট বা তথায় ও তৎকালে উপস্থিত তাঁহাদের অধিকাংশের নিকট উক্ত কোম্পানির এবং তাবৎ ফ্যাক্টর (Factors), মাস্টার (Masters), ম্যারিনার (Mariners), অন্যান্য কর্মচারিবর্গের সুশাসন ও সুপরিচালনের নিমিত্ত এবং তাঁহাদের ব্যবসায় ও বাণিজ্যের স্থায়িত্ব ও অধিকতর উন্নতিসাধনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ও সুবিধাজনক বোধ হইবে।" তাহারা আরও ক্ষমতা পাইলেন যে, তাঁহারা এরূপ আইন প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহারা ইচ্ছানুসারে তাহা রহিত বা পরিবর্তিত করিতে পারিবেন, এবং তদ্ভিন্ন লোকে যাহাতে ঐ সমস্ত আইন-কানুন যথাযথ ভাবে মানিয়া চলে, এতদুদ্দেশ্যে তাঁহারা আপনাদের বিবেচনামত কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড প্রভৃতি শাস্তিপ্রয়োগের ব্যবস্থা করিতেও পারিবেন।

১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ ইংরেজদিগের স্বার্থসাধনের বিশিষ্ট অনুকূল হইয়াছিল। ইংল্যাণ্ডেশ্বর ১ম জেমসের প্রখ্যাত দূত সার টমাস রো তাঁহার প্রতিনিধিরূপে ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীনগরে মোগল রাজসভায় উপস্থিত হন। তিনি মোগল-সম্রাট জাহাঙ্গীরের এরূপ প্রীতিভাজন হইয়া উঠেন যে, তিনি ভারতে বাণিজ্যকারী তাঁহার স্বদেশীয়গণের নিমিত্ত সম্রাটের নিকট হইতে অতি মূল্যবান অধিকারসমূহ লাভ করেন। কাউয়েল সাহেব বলেন, মোগল সম্রাট এই অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন যে, ইংরেজদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদের নিষ্পত্তি ইংরেজেরা স্বয়ংই করিতে পারিবেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৭শ শতাব্দীর অবসানের পূর্বেই মাদ্রাজে ও কলিকাতায় দুর্গনির্মাণের অনুমতিপ্রাপ্ত হন এবং তাহা কার্যেও পরিণত করেন। এইরূপে তাঁহারা আপন আপন কুঠির সীমার মধ্যে আপনাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহা রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সকল গড়বন্দীর ভিতর ইউরোপীয়দিগের ন্যায় দেশীয়েরাও গৃহনির্মাণপূর্বক বাস করিতে আরম্ভ করেন; এবং সেইজন্য নবাব দেশীয়দিগের বিচারার্থ কাজি বা অন্য বিচারপতি প্রেরণ করিতে উদ্যত হইলে কোম্পানির কর্মচারীরা তাঁহাকে এই কার্য হইতে নিবৃত্তি করিবার নিমিত্ত উৎকোচ প্রদান করিয়া বশীভূত করিতেন।

১৬০১ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দ ১৬৫৯ ও ১৬৬১ অব্দে পুনর্নবীভূত হয়। পরন্তু ১৬৯৮ অব্দে লর্ড গডলফিনের বিধান অনুসারে তদানীন্তন দুইটি কোম্পানি মিলিত হইয়া যায় এবং তদবধি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে পরিচিত হইতে

আরম্ভ করে। সেই সনন্দ অনুসারে কোম্পানি আপনাদের যাবতীয় দুর্গ, কুঠি ও আবাদের শাসনক্ষমতা প্রাপ্ত হন,—কেবল রাজক্ষমতাটুকু ইংল্যাণ্ডেশ্বরের নিজ হস্তে থাকে। পূর্বের ন্যায় বিচারালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু আইন করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে তৎকালে কোন কথাই বলা হয় নাই।

১৭২০ অব্দে বা তৎসমকালে শাসনসম্পর্কীয় কতকগুলি বিষয়ের ভার কলিকাতার "জমিদার" নামক কর্মচারীর হস্তে অর্পণ করা হয়। কাউন্সিলের কোন সদস্য যদি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী হইতেন, সাধারণতঃ তিনিই এই পদে অধিষ্ঠিত হইতেন। এই বিচারালয়ের নাম "ফৌজদারী কাছারী" ছিল। ১৭২০ অব্দে ইহার প্রথম স্থাপন কাল হইতে ১৭৫৬ অব্দ পর্যন্ত গোবিন্দরাম মিত্র জমিদারের দেওয়ান অর্থাৎ প্রতিনিধিরূপে কার্য করেন। স্টার্নডেল সাহেবের মতে গ্রীক নামক একজন সাহেব প্রথম জমিদার হন। জমিদারের প্রধান বা সদর কাছারী কলিকাতায় অবস্থিত ছিল; তথায় তিনি জমি প্রজাবিলি করিতেন এবং কোন প্রজা যথাসময়ে খাজনা দিতে না পারিলে তিনি তৎকালপ্রচলিত অন্য কোন বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী না হইয়া স্বয়ংই তাহাকে কারাবদ্ধ করিয়া ও বেত্রাঘাত করিয়া দণ্ডপ্রদান করিতেন। জমিদারের কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধে হলওয়েল সাহেব এইরূপ বলেন: তাঁহার দুইটি ক্ষমতা ছিল, সে দুইটি ক্ষমতা পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন। তিনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও কলেক্টর ছিলেন, এবং তদ্ভিন্ন জমিদারী কাছারীর অধ্যক্ষ অর্থাৎ বিচারপতি ছিলেন। এই পদের বেতন মাসিক দুই হাজার টাকা নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু হলওয়েল সাহেব বলেন, তাহার উপরি পাওনারও তুলনায় এই বেতন কিছুই নহে। কথিত আছে যে, "বিভিন্ন কুঠির আয়ের অধিকাংশই তাঁহার পকেটে যাইত। তদ্ভিন্ন তিনি নিজে স্বতন্ত্রভাবে বাণিজ্য করিতেন, এবং তাহা হইতেও প্রভূত লাভ পাইতেন।......তদানীন্তন প্রবলবাত্যাসঙ্কুল রাজনৈতিক ঝটিকায় তথাকথিত প্যাগোডা বৃক্ষ প্রকম্পিত হইলে তাঁহার উদরপূর্তির যথেষ্ট সুযোগ ঘটিত।"

উল্লিখিত আছে যে, যে সকল স্থলে দেশীয়েরা ইংরেজধর্মাধিকরণে বিচারপ্রার্থী না হইত, তত্তাবৎ স্থলে জমিদারই সমস্ত ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিতেন। তিনি দেশীয়দিগের মধ্যে সর্বপ্রকার পরিমাণ টাকার মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতেন। কেবল প্রাণদণ্ডের জন্য অপরাধের মোকদ্দমাতেই তিনি রায় প্রকাশ করিতে পারিতেন, কিন্তু যে স্থলে চাবুকের প্রহারে* মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হইত, কেবল সেই স্থলেই প্রেসিডেণ্ট বা কাউন্সিলের অনুমোদন গ্রহণ করা হইত।

* প্রাচীন মোগলসম্রাট ও নবাবগণ মুসলমানদিগকে ইংরেজদিগের প্রথানুসারে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়া মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করিতে দিতেন না, কারণ তাঁহাদের মতে মুসলমানের পক্ষে ঐরূপ মৃত্যু নিতান্ত অবমাননাজনক; সুতরাং প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধের স্থলে মোগলরাজের মুসলমান ও জেণ্টু (হিন্দু)

আমরা এক্ষণে জন্ জেফানিয়া হলওয়েল নামক বিখ্যাত জমিদারের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। তিনি জাতিতে আইরিশ ছিলেন। তিনি পূর্ব-ভারতগামী একখানি জাহাজের সার্জেণ্টের মেট (সহকারী) হইয়া ১৭৩২ অব্দে কলিকাতায় উপস্থিত হন। ১৭৩৬ অব্দে তিনি মেয়র্স কোর্টের অন্যতম অল্ডারম্যান নিযুক্ত হন এবং ১৭৪৮ অব্দে ইউরোপে প্রতিগমন করেন। তিনি জমিদারের কাছারী সংক্রান্ত কুপ্রথাসমূহ ও দোষাবলীর সংস্কারসাধনার্থ একটি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া ডিরেক্টর সভায় বিচারার্থ অর্পণ করেন, এবং ডিরেক্টরেরা তজ্জন্য তাঁহার প্রতি এতদূর সন্তুষ্ট হন যে, তাঁহারা তাহাকে কলিকাতার স্থায়ী জমিদার ও কাউন্সিলারের দ্বাদশ সদস্য নিযুক্ত করেন। ১৭৬০ অব্দে ক্লাইভ স্বদেশে প্রতিগমন করিলে তিনি কয়েক মাস গভর্ণররূপে কার্য করেন। তিনি এক সময়ে বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণঘটিত একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু করিতে উদ্যত হইলে, কোন ব্যক্তি তাঁহাকে ঐ কার্য হইতে বিরত করিবার অভিপ্রায়ে এক লক্ষ টাকা উৎকোচস্বরূপ প্রদান করেন। হলওয়েল সাহেব ঐ টাকা স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া উহা কোম্পানিকে অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি কতকগুলি মূল্যবান পুস্তিকা প্রচার করেন। সেগুলি হলওয়েল ইণ্ডিয়া ট্রাক্টস (Holwell India Tracts) নামে পরিচিত। তাহা হইতে কলিকাতা সংক্রান্ত অনেক প্রয়োজনীয় কথাই জানিতে পারা যায়। তিনি ১৭৬০ অব্দে ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং ১৭৯৮ অব্দে সেখানে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১৭২৬ অব্দে (পাদরি লর্ড সাহেব বলেন, ১৭২৪ অব্দে) কলিকাতায় 'মেয়র্স কোর্ট' সংস্থাপন ব্যাপারের আলোচনায় অনেক প্রাচীন কথার স্মৃতিই জাগিয়া উঠে। ডিরেক্টর-সভায় আদেশক্রমেই উহা প্রথম সংস্থাপিত হয়। ডিরেক্টরগণ-অপরাপর যুক্তি ব্যতীত এইরূপ যুক্তিও প্রদর্শন করেন যে, 'মান্দ্রাজ, ফোর্ট উইলিয়াম ও বোম্বাই নগরে দেওয়ানী মোকদ্দমাসমূহের অপেক্ষাকৃত সত্বর ও সুন্দর নিষ্পত্তির নিমিত্ত এবং প্রাণদণ্ডযোগ্য ও অন্যান্য প্রকার অপরাধ ও দুরাচরণের বিচার ও দণ্ডবিধানের নিমিত্ত যথোচিত ও যথোপযুক্ত ক্ষমতার অভাব দৃষ্ট হয়।' একজন মেয়র ও নয়জন অল্ডারম্যান লইয়া এই বিচারালয় গঠিত হয় এবং স্থির হয় যে, ইহাদের মধ্যে সাতজন অল্ডারম্যান ও মেয়র প্রকৃত বৃটেনজাত বৃটিশ-প্রজা হওয়া আবশ্যক। অবশিষ্ট দুইজন বৈদেশিক প্রোটেস্ট্যাণ্ট হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা গ্রেট বৃটেনের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ কোন রাজ্যের

অপরাধী প্রজাদিগকে এরূপ কশাঘাত করা হইত যে, তাহাতেই তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইত, পরন্তু চাবুক সাওয়ার নামক কর্মচারীরা সময়ে সময়ে এরূপ কার্যপটু হইতে যে, তাহারা ভারতীয় চাবুকের দুই তিন আঘাতেই দণ্ডিত ব্যক্তিকে শমনভবনে প্রেরণ করিতে পারিত।"—স্টার্নডেল সাহেব কৃত 'কলিকাতা কলেক্টরের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত।'

বা রাজার প্রজা হওয়া চাই। মেয়র ও অল্ডারম্যানদিগের নিয়োগ-ক্ষমতা গভর্ণর বা কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্টের হস্তে অর্পিত হয়। রেনি সাহেবের মতে, মেয়র প্রতি বৎসর অল্ডারম্যানগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। অল্ডারম্যানের পদ আজীবনকাল স্থায়ী হইত, কিন্তু গভর্ণর ও কাউন্সিল কোন যুক্তিসঙ্গত হেতুতে যে-কোনও অল্ডারম্যানকে পদচ্যুত করিতে পারিতেন। এই বিচারালয়ের সর্ব-প্রকার দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারক্ষমতা ছিল। তদ্ভিন্ন উইলের প্রোবেট বিচার এবং যাহারা উইল না করিয়া মরিত, তাহাদের বিষয়সম্পত্তি পরিচালনের ক্ষমতাপত্র অর্পণ করিবারও ইহার ক্ষমতা ছিল।

মেয়র ও অল্ডারম্যানগণের পারিশ্রমিক মাসিক ২০।২২ টাকা ছিল। রেনি সাহেব বলেন, মেয়র ও অল্ডারম্যানগণ অফিসের নির্দিষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। মেয়র একটি মখমলের গদির উপর উপবেশন করিতেন, এবং অল্ডারম্যানগণ গাউনের স্থলে লাল তাফতা ধারণ করিয়া উপস্থিত হইতেন। ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমায় কেবলমাত্র ইউরোপীয়দিগের উপরই "মেয়র্স কোর্টের" অধিকার ছিল; পরন্তু পক্ষগণের সম্মতিক্রমে দেশীয়দিগের পরস্পরের মধ্যবর্তী মোকদ্দমাও তথায় দায়ের হইতে পাইত। অবশেষে এইরূপ ঘোষিত হয় যে, দেশীয়দিগের মোকদ্দমাগুলি তাহাদের আপনাদের মধ্যেই নিষ্পত্তি হইবে, এবং তাহাদের উপর "মেয়র্স কোর্টের" কোনও ক্ষমতাই থাকিবে না। বুরশিয়ার সাহেব কলিকাতায় "মেয়র্স কোর্ট" নির্মাণ করেন। উহা তৎকালে "কোর্ট হাউস" নামে পরিচিত এবং ওল্ড কোর্ট হাউস্ স্ট্রীট্ নামক রাস্তায় অবস্থিত ছিল। কোন কোন লেখক উহার কার্যবিবরণী প্রসঙ্গে উহার অদ্ভুত বিচারফল ও রায় প্রকাশ করিয়া পাঠকগণকে আমোদিত করিয়া থাকেন। জনৈক লেখক "কলিকাতা রিভিউ পত্রে" পশ্চাল্লিখিত আখ্যায়িকা প্রচুর করিয়াছেন:

কলিকাতা কাউন্সিলের জনৈক ইউরোপীয় সদস্য (যিনি তৎকালে "জমিদার"-ও ছিলেন) উইলিয়াম উইলসন্ নামক জনৈক পাইল-প্রস্তুতকারকের নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ (মোট ৭৫॥/৹ পাই) ঋণী ছিলেন, এই শেষোক্ত ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তির নিমিত্ত সামান্য কোন কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পাইল প্রস্তুতকারক উক্ত ভদ্রলোকের নিকট আপনার প্রাপ্য টাকার বিল ও তৎসহ তাহার রসিদ প্রেরণ করিলেন, কিন্তু ভদ্রলোকটি তাহা অতিরিক্ত জ্ঞান করিয়া টাকা দিলেন না, অধিকন্তু সেই বিল ও রসিদ নিজে রাখিয়া দিলেন। পাইল প্রস্তুতকারক এই ব্যাপার মেয়র্স কোর্টের গোচর করিলেন। তখন সেই ভদ্রলোক সাধারণের নিকট অপদস্থ হইবার ভয়ে বিলের সমস্ত টাকা মায় মোকদ্দমার খরচা প্রদান করিয়া মোকদ্দমা আপসে মিটাইয়া ফেলিতে সম্মত হইলেন। বাদীর এটর্নির একজন হিন্দু 'কলিকাতার কৃষ্ণকায় বণিক' বেনিয়ান্ (মুচ্ছুদ্দী) ছিল। এই ব্যক্তি সমাজে সাতিশয় মান্যগণ্য ছিলেন। বাদীর এটর্নি আপনার এই বেনিয়ান্‌টিকে উক্ত ভদ্রলোকের নিকট উক্ত টাকার তাগাদায় পুনঃ পুনঃ প্রেরণ

করিতে বাধ্য হন। কিন্তু কোন বারেই কিছুমাত্র টাকা না পাইয়া শেষবারে অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন এবং উক্ত ভদ্রলোককে বলিলেন যে, যদি এই টাকা দেওয়া না হয়, তাহা হইলে যে কোনরূপ অশুভফল উৎপন্ন হইতে পারে। এই কথা বলায় সেই 'জমিদার' সাহেব ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন এবং কৃষ্ণকায় বণিক্‌কে ধরিয়া কাছারীতে লইয়া যাইবার আদেশ প্রদান করিলেন। তথায় নীত হইলে, বিনাবিচারে তাঁহার হাত-পা বাঁধা হইল ও তাঁহাকে কশাঘাত করা হইল এবং 'জমিদার' সাহেব স্বীয় চর্মপাদুকাদ্বারা তাঁহার মস্তকে প্রহার করিলেন।

গভর্ণর ভেরেলেস্ট সাহেব আর একটি আখ্যায়িকা এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন:

১৭৬২ অব্দে জনৈক দেশীয় ব্যক্তি তাহার একটি পত্নীকে পরপুরুষাভিগমন কার্যে ধরিয়া ফেলে। প্রাচ্য দেশের সর্বত্রই স্ত্রীলোকেরা তাহাদের স্বামীর ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন এবং প্রত্যেক স্বামী নিজ পত্নীকৃত অহিতাচরণের প্রতিশোধ গ্রহণকর্তা। সুতরাং ঐ ব্যক্তি পত্নীর অপরাধ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া তাহার নাসিকা কর্তনপূর্বক তাহার দণ্ডবিধান করে। পুরুষটি কলিকাতার সেশন (দায়রা) আদালতে অভিযুক্ত হইল। সে সমস্ত ঘটনা স্বীকার করিল, কিন্তু আত্মপক্ষসমর্থনার্থ বলিল যে, "আমি যেরূপ বিধিব্যবস্থা ও আচার ব্যবহারসমূহের মধ্যে শিক্ষিত হইয়াছি, তাহার বিরুদ্ধে আমি কোন অপরাধই করি নাই; স্ত্রী-লোকটি আমার নিজ সম্পত্তি এবং দেশীয় রীতি-অনুসারে তাহার দুশ্চরিত্রতার নিমিত্ত তাহার দেহে কোনরূপ চিহ্ন করিয়া দিবার অধিকার আমার আছে; আপনারা যে সমস্ত আইন-অনুসারে আমার বিচার করিতেছেন, তাহাদের কথা আমি পূর্বে কখনও শুনি নাই, কিন্তু আমি বিচারকগণকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই,—আপনারা কি বিশ্বাস করেন যে, যদি আমি জানিতাম যে ইহার দণ্ড মৃত্যু, তাহা হইলে আপনারা যাহাকে এক্ষণে অপরাধ বলিতেছেন, আমি কখনও তাহা করিতাম কি? এইরূপ সুন্দর আত্মপক্ষ সমর্থন-সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তি অপরাধী বিবেচিত হইয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, কারণ যদি আদালতের বিচার-ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে উহা অবশ্য ইংরেজের আইন-অনুসারেই বিচার-কার্য নির্বাহ করিবে।"

রাধাচরণ মিত্র নামক এক ব্যক্তি জাল করার অপরাধে মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু কলিকাতার অধিবাসীরা ১৭৬৫ অব্দের মার্চ মাসে এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করায় ঐ দণ্ডাজ্ঞা রহিত হইয়া যায়। রাধাচরণ মিত্রের বৃত্তান্ত সাধারণের নিকট সুবিদিত আছে, সুতরাং এস্থলে তাহার সবিস্তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ 'কলিকাতা রিভিউ পত্রে' জনৈক লেখক লিখিয়াছেন যে, "মেয়র্স কোর্ট" গভর্ণমেণ্টের অঙ্গুলি চালনার অধীন ছিল, 'এমন অনেক মোকদ্দমা ঘটিয়াছে যে, ঐ সকল স্থলে গভর্ণরের আদেশক্রমে বিচার ব্যর্থ বা রহিত হইয়া গিয়াছে, কারণ

গভর্ণর স্বীয় প্রভাববলে কোর্টের সদস্যগণকে যথেচ্ছ পরিচালিত করিতেন।' এইরূপে যদিও এমন অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে যে, তদ্বারা বিচার-বিতরণ কার্যে ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল বা অযোগ্যতার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, তথাপি ঐ সকল বিচারালয়ের দ্বারা যে তৎকালে মহোপকার সাধিত হইয়াছিল, তাহাতে মুহূর্তমাত্রও সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ঐগুলি সমাজের উপরও অতি সুস্পষ্ট শুভফলসমূহ উৎপাদন করিয়াছিল।

কোর্ট অফ্ রিকোয়েস্ট (Court of Request) নামক বিচারালয় ১৭৫৩ অব্দে স্থাপিত হয়। ইহাতে ২৪ জন কমিশনার থাকিতেন এবং তাঁহারা সকলেই কলিকাতার অধিবাসিগণের মধ্য হইতে গভর্ণর ও কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। যে সকল স্থলে ঋণ, শুল্ক বা বিবাদীয় বিষয় প্যাগোডা বা ৪০ শিলিঙের অনধিক, কেবল সেই সকল মোকদ্দমারই তাঁহারা বিচার করিতেন। প্রতি বৃহস্পতিবারে অভিযোগসমূহ শ্রুত হইত এবং ৩ জন সদস্য উপস্থিত হইলেই বিচারালয়ের অধিবেশন হইত। প্রথম প্রথম দেশীয় অধিবাসীরা কমিশনার নির্বাচিত হইতেন, কিন্তু অবশেষে কেবল ইউরোপীয় বণিকগণই সদস্যরূপে নির্বাচিত হইতেন।

"কোর্ট অফ কোয়ার্টার সেশন্‌স" নামক বিচারালয়ে কেবল নরহত্যা, রাজ-বিদ্রোহ প্রভৃতি উৎকট অপরাধ সমূহের বিচার হইত। ইহাও কথিত আছে যে, এতদ্ভিন্ন কলিকাতায় মোগলদিগের ক্ষমতাধীন আরও তিনটি বিচারালয় ছিল। কোম্পানির ভূমি ও কুঠির সীমার মধ্যে সুধারা ও শান্তি এবং সুশাসন পরীক্ষা করাই এই সকল বিচারালয়ের আদিম উদ্দেশ্য ছিল।

ইংরেজ কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পর বিচারালয়গুলির অবস্থা উত্তরোত্তর অধিকতর নিয়মবহির্ভূত হইয়া পড়িতে লাগিল। শাসন-তরণীর কর্ণ মুসলমান সুবাদারের হস্তেই ছিল। গুরুতর রাজনৈতিক হেতু বশতঃ তৎকালে শাসনরশ্মি মুসলমান-দিগের হস্তে রাখাই অত্যাবশ্যক বিবেচিত হইয়াছিল। এইরূপে রাজক্ষমতা এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারভার তাঁহাদের হস্তেই থাকিয়া যায়। সুবার শাসন দুই অংশে বিভক্ত ছিল, যথা—(১) দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্বসংগ্রহ এবং দেওয়ানী বিচারের প্রধান প্রধান বিভাগের পরিচালন, এবং (২) নিজামৎ অর্থাৎ সামরিক বিভাগ এবং তৎসহ ফৌজদারী বিচারবিভাগের তত্ত্বাবধান। তৎকালে দেওয়ানী নিজামতের অধীন ছিল। ইহা যেন স্মরণ থাকে যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ইংলণ্ডের রাজা ও পার্লামেণ্ট সভার শাসনাধীন ছিল। পার্লামেণ্ট সভা আবার ইংলণ্ডের জনসাধারণের অধীন। পলাসীর যুদ্ধের পর কোম্পানি এতদ্দেশে ভূম্যধিকার লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা শীঘ্রই দেখিলেন যে তাঁহারা মহা সঙ্কটে পতিত হইয়াছেন। পার্লামেণ্ট তাঁহাদের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদিগকে কি পরিমাণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব বিধিসঙ্গতরূপে প্রদান করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সদস্যের পর সদস্য

বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষের সুশাসনের নিমিত্ত সময়ে সময়ে এক একটি আইন বিধিবদ্ধ হইতে লাগিল এবং তদ্দ্বারা কোম্পানির উপর রাজার ক্ষমতাপরিচালনের ও শাসনের সীমা নির্দিষ্ট হইতে লাগিল। এদিকে ভারতবর্ষে দ্বিবিধ শাসনপ্রণালীর (অর্থাৎ ইংরেজী নীতিরীতিতে পরিচালিত এক প্রণালীর এবং প্রচলিত মুসলমান রীতি অনুসারে পরিচালিত অপর প্রণালীর) ফল অতি সত্বর প্রকাশ পাইতে লাগিল।

বাণিজ্য দ্বারা যে-কোন প্রকারে অধিক লাভ করাই কোম্পানির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; আবার সুবাদারের অত্যাচার উৎপীড়নে ও শোণিত শোষণে জনসাধারণ একরূপ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। এতৎ সম্বন্ধে জেনারেল বর্জায়ন্ সাহেবের উক্তির উল্লেখ করিলেই এস্থলে যথেষ্ট হইবে। পার্লামেন্টের কমন্স সভা ১৭৭২ অব্দে ভারতের অবস্থা বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত যে কমিটি নিযুক্ত করেন, এই মহাত্মা তাহার চেয়ারম্যান্ অর্থাৎ সভাপতি বা অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, পাপাচার, অর্থশোষণ ও অবিচারের এরূপ দৃশ্য, এরূপ অশ্রুত-পূর্ব নিষ্ঠুরাচরণ এবং নৈতিক সাধুতার প্রত্যেক নিয়মের, প্রত্যেক ধর্মবন্ধনের ও শাসন-প্রণালীর প্রত্যেক নীতির এরূপ প্রকাশ্য উল্লঙ্ঘন পূর্বে আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই * * * এরূপ বহু অপরাধ সর্বদা ঘটিত, যাহা মানবপ্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ এবং এমন বহু কার্য ঘটিত, যাহা বিশ্বাসঘাতকতা ও নরহত্যা দ্বারা সংসাধন করা হইত।

১৭৬৫ অব্দ অতি গুরুতর পরিবর্তন সমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট। উক্ত বৎসর লর্ড ক্লাইভ শেষ বার বঙ্গদেশে আগমন করেন। হেস্টিংস নামক স্থানের যুদ্ধের পর "উইলিয়াম দি কঙ্কারার" উপর যেরূপ অতি গুরুতর ও দুঃসাধ্য কার্যসাধনের ভার পড়িয়াছিল, এবার লর্ড ক্লাইভও তদ্রূপ গুরুতর ও দুঃসাধ্য কার্য সাধনের ভার প্রাপ্ত হন। ইণ্ডিয়া অফিসে ক্লাইভের শত্রুগণ প্রথমে যেভাবে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণের ভাব প্রদর্শন করেন এবং তাঁহারা পরে আপনাদের উক্তির প্রত্যাহার করায় ক্লাইভ যে ভাবে উক্ত ভার গ্রহণ করেন, তত্তাবতের পুঙ্খানু-পুঙ্খ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া এস্থলে অনাবশ্যক। টরেন্স সাহেব স্বকীয় 'এম্পায়ার ইন এসিয়া' (Empire in Asia) নামক গ্রন্থে সেই অবস্থার কথা অতি বিশদভাবে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন:

"লোকের চক্ষু আর একবার ক্লাইভের উপর পতিত হইল। তিনি যে অবস্থা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহার আরাম ও বিলাস উপভোগ করিতে কেবল আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র। বার্কেলি স্কোয়ারস্থিত তাঁহার ভবন, তাঁহার সাজসজ্জা, এমন কি তাঁহার পরিচ্ছদ পর্যন্ত তাঁহার দৈনিক বিভব ও উল্লাসের পরিচয় প্রদান করিত। পার্লামেন্ট সভায় তাঁহার আয়ত্তাধীনে এক ডজন ভোট ছিল; এজন্য প্রতিযোগী রাজনৈতিকগণ তাঁহার সঙ্গলাভের চেষ্টা করিত। জীবিত সেনানায়কদিগের মধ্যে একমাত্র তিনিই রীতিমত যুদ্ধে প্রকৃত প্রস্তাবে জয়লাভ

করিয়াছিলেন ; এজন্য তিনি হর্স গার্ডস (Horse guards) দলে পরম সমাদর প্রাপ্ত হইতেন। ইংরেজদিগের মধ্যে একমাত্র তিনিই জাতীয় ঋণের পরিমাণ বর্ধিত না করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরের অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন, এজন্য রাজা তৃতীয় জর্জ লেভিতে (দরবারে) তাঁহার সহিত কথা কহিতে ভালবাসিতেন। সেন্ট জেমস স্ট্রীটের খোশপোশাকী ফুলবাবুরা তাঁহাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিলেও এবং বিলাসিনী রমণীকুল তাঁহাকে অমার্জিত বলিয়া হাস্যপরিহাস করিলেও জনসাধারণ তাঁহাকে বীর বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল এবং রাজনীতিবেত্তারা তাঁহাকে অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। ইণ্ডিয়া স্টকের স্বত্বাধিকারিগণ ভাবিতে লাগিলেন, যদি ক্লাইভকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারা যায়, তাহা হইলে সমস্তই নিশ্চিত সুন্দররূপে চলিবে। চেয়ারম্যান সলিভ্যান সাহেব কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত শত্রু ছিলেন, এবং তাঁহার সহযোগীদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহার নিকট নত হইতে সঙ্কুচিত হইতে লাগিলেন, কারণ তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, তিনিই অতঃপর তাঁহাদের প্রভু হইয়া বসিবেন। কিন্তু এদিকে অবস্থা খারাপ হইতে হইতে আরও খারাপ হইয়া উঠিল এবং ক্রটিসমূহ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। শতকরা ১০ টাকা হারে ডিভিডেণ্ড (লাভ) কিরূপে দেওয়া হইবে, ইহাই ভাবনার বিষয় হইল। ইণ্ডিয়া হাউসে বিষম বাদানুবাদ উপস্থিত হইল, তাহাতে ক্লাইভ জেদ করিলেন যে, সলিভ্যানকে পদচ্যুত করা হউক। অবশেষে তিনি কলিকাতার শাসন-বল্গা পুনর্গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন, এবং রাজা তাঁহার এইরূপ নামকরণ করিলেন,—এশিয়ার যাবতীয় ইংরেজ সৈন্যের জেনারেল ইন চীফ, অর্থাৎ প্রধান অধিনায়ক।

ক্লাইভ প্রথমে অতি মহনীয় দৃঢ়তার সহিত কর্মচারিবর্গের সংস্কার-সাধনে ব্রতী হইলেন ; এই কাযের নিমিত্ত তাঁহাকে উত্তরকালে বহু ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। তৎপরে তিনি কোম্পানির অধিকারকে বিধিসঙ্গত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দিল্লীর প্রবলপ্রতাপ মোগল সম্রাটের নিকট হইতে তিনি দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণ করিলেন ; ইহাতে বঙ্গের শাসনপ্রণালী এক অভিনব ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল। বঙ্গের আভ্যন্তরিক শাসনসংক্রান্ত এই সকল সুব্যবস্থা ব্যতিরেকে তিনি কতিপয় সন্ধিপত্রদ্বারা ভারতের অন্যান্য রাজশক্তির সহিতও সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকারের শাসন-সংস্কারসাধনে ও রাজনৈতিক কার্যের সম্পাদনে লর্ড ক্লাইভের পারসী ভাষার সেক্রেটারী ও দেওয়ান মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর তাঁহাকে বিস্তর সাহায্য করেন। দেওয়ানী সনন্দে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার মর্মার্থ এইরূপ :

"এই সুসময়ে আমাদের রাজকীয় সনন্দ (যাহা সকলকে অবশ্যই মানিয়া চলিতে হইবে) প্রচার, করা হইল ; যেহেতু উচ্চ ও প্রতাপান্বিত, উন্নত সম্ভ্রান্তগণের মধ্যে মহাসমুন্নত, প্রখ্যাত যোদ্ধাদিগের মধ্যে প্রধান, আমাদের বিশ্বস্ত ভৃত্য

ও প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী, এবং আমাদের রাজকীয় অনুগ্রহলাভের সুযোগ্য ইংরেজ কোম্পানির অনুরাগ ও উপকারের বিবেচনায় আমরা তাঁহাদিগকে বঙ্গীয় ১১৭২ অব্দের ফসল রবির প্রারম্ভ হইতে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এই প্রদেশত্রয়ের দেওয়ানি এমনভাবে প্রদান করিলাম যে, ইহাতে অন্য কোনও ব্যক্তির সংস্রব থাকিবে না এবং আদালত দেওয়ানির নিমিত্ত যে শুল্ক প্রদান করিতেন, তাহাও তাঁহাদিগকে দিতে হইবে না, অতএব ইহা আবশ্যক যে, উক্ত কোম্পানি রাজকীয় করস্বরূপ বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা প্রদানের প্রতিভূ হইতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন (এই টাকা নবাব নাজুম্-উদ্দৌলা বাহাদুরের সময় হইতে নিরূপিত হইয়াছে) এবং ঐ টাকা নিয়মিতরূপে রাজসরকারে প্রেরণ করেন, এবং এই স্থলে, যেহেতু উক্ত কোম্পানিকে বঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশগুলির রক্ষার জন্য বহুসৈন্য পোষণ করিতে হইবে, অতএব রাজসরকারে উক্ত ২৬ লক্ষ টাকা প্রেরণের পর এবং নিজামতের সমস্ত ব্যয় নির্বাহের পর পূর্বোক্ত প্রদেশগুলির রাজস্ব হইতে যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা আমরা তাঁহাদিগকে অর্পণ করিলাম। ইহাও আবশ্যক যে, আমাদের রাজকীয় বংশধরগণ, উজিরগণ, মর্যাদা-দাতৃগণ, উচ্চপদস্থ ওমরাহগণ ও কর্মচারিগণ, দেওয়ানীর মুৎসুদ্দিগণ, সুলতানের কার্যের ম্যানেজার (তত্ত্বাবধায়ক), জায়গীরদার ও ক্রোড়ীয়গণ, ইঁহারা ভাবিকালীনই হউন, বা বর্তমান কালীনই হউন যাঁহারা আমাদের রাজকীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত সতত চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই যেন উক্ত পদটি পূর্বোক্ত কোম্পানির হস্তে পুরুষানুক্রমে চিরদিনের নিমিত্ত থাকিতে দেন। ইঁহারা কস্মিনকালেও পদচ্যুত হইবেন না, এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহারা কোনও কারণেই ইহাদের কার্যে ব্যাঘাত উপস্থিত করিবেন না এবং ইহারা যে দেওয়ানীর সর্বপ্রকার শুল্ক প্রদান ও রাজকীয় দাবি হইতে বিমুক্ত, ইহা তাঁহারা অবশ্যই জ্ঞান করিবেন। আমাদের এতদ্বিষয়ক আদেশাবলী অতিশয় কঠোর ও সুনিশ্চিত বুঝিয়া তাঁহারা যেন তাহা হইতে বিচ্যুত না হন। ইতি—তারিখ জালুসের ষষ্ঠ বর্ষের ২৪শে সফর, ১২ই আগস্ট ১৭৬৫।"

ক্লাইভ দেওয়ানী লাভ করিয়া যান বটে, কিন্তু ওয়ারেন্ হেস্টিংসই দেশের শাসনকার্যে উহার পূর্ণ প্রয়োগ করেন। ক্লাইভ বিচার বিভাগের কার্য—দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্বীয় নবাবের হস্তে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহার প্রকৃত তত্ত্বাবধানের এক প্রথা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন: উহাই ডবল গবর্ণমেণ্ট অর্থাৎ দ্বিবিধ শাসনপ্রণালী নামে অভিহিত হইয়াছে। এইরূপে তিনি যে সামান্য সংস্কার প্রবর্তিত করেন, তাহা কিছু দিনের জন্য একরূপ চলিয়াছিল কিন্তু কু-শাসন ও অত্যাচার উৎপীড়ন পুনরায় জাগিয়া উঠিল। অবশেষে ১৭৭১ অব্দে ডিরেক্টরেরা তাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে, তাঁহারা স্বয়ং দেওয়ান হইবেন এবং কোম্পানির কর্মচারিগণ দ্বারা স্বহস্তে রাজস্বের সমস্ত পরিচালন ও তত্ত্বাবধানভার গ্রহণ করিবেন। ইহাতে ভূসম্পত্তি-সংক্রান্ত স্বত্বসমূহের

সম্পূর্ণ পুনর্গঠনের এবং বিচারবিতরণের কার্য স্বহস্তে গ্রহণের প্রয়োজন হইয়া উঠিল। যে নীতি ইতঃপূর্বে স্থিরীকৃত হইয়াছিল, সেই নীতি অর্থাৎ শাসনব্যাপার ইংরেজদিগের তত্ত্বাবধানাধীনে নবাবের কর্মচারিবর্গের হস্তে পরিত্যাগ এবং রাজকার্যপরিচালনের প্রত্যক্ষ ভার কোম্পানির কর্মচারিগণের হস্তে অর্পণরূপ নীতি ইহা দ্বারা সুস্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হইল। ইহার পরেই ওয়ারেন হেস্টিংস মাদ্রাজ হইতে স্থানান্তরিত হইয়া বঙ্গের গভর্ণরের পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং ১৭৭২ অব্দের প্রথম ভাগে বাঙ্গালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ওয়ারেন্ হেস্টিংসই শাসনকার্যে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে মহম্মদীয় আইন ও অফিসগুলি উঠাইয়া দিয়া তত্তৎ স্থলে কোম্পানির রেগুলেশন ও ভৃত্যবর্গকে সংস্থাপন করিলেন। অবশেষে তিনি রাজধানী ও তৎসহ প্রধান বিচারালয়গুলি মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় উঠাইয়া আনিলেন। পাদরি গ্লীগ সাহেব এতৎ সম্বন্ধে তাঁহার ক্রিয়াকলাপের এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন:

তিনি প্রদেশত্রয়ের কার্যের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, কোষাগার অর্থশূন্য ও গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং প্রভাবশূন্য। কেহই বলিতে পারিত না, রাজস্ব কিরূপে সংগৃহীত হইত; তাহাও আবার বৎসর বৎসর উত্তরোত্তর অল্প লাভজনক হইতেছিল। এমন কোন বিচারালয় ছিল না যে, যেখানে লোকে প্রবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বা দুর্বলের চাতুরীজালের বিরুদ্ধে আবেদন করিতে পারে। পুলিশের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল; তদ্রূপ পুলিশকে তৃণজ্ঞান করিয়া দস্যুগণ দলে দলে দেশের সর্বত্র বিচরণ করিত। তদুপরি এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া বহু লোককে গ্রাস করিয়াছিল; এক্ষণে তাহার ফলে বিষম দারিদ্র্য ও রোগ দেখা দিল;—দুর্ভিক্ষহতাবশিষ্ট লোকেরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। বাণিজ্যের অবস্থাও তদ্রূপ; দেশীয় ও বিদেশীয় উভয় প্রকার বাণিজ্যই অংশতঃ ব্যক্তিবিশেষের অসদাচরণ-বশতঃ ও অংশতঃ বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষস্থানীয়গণের ঔদাসীন্য হেতু সম্পূর্ণ ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছিল। সামান্য দুই বৎসর কালের মধ্যে হেস্টিংস সাহেব এই অবস্থার সম্পূর্ণ বিপর্যয় করিয়া তুলিলেন। ডাকাত, সন্ন্যাসী এবং অন্যান্য লুণ্ঠন-কারীদিগের অত্যাচার হইতে প্রদেশগুলিকে ক্রমশঃ উদ্ধার করা হইল। উহারা যেখানেই দেখা দিতে লাগিল, তিনি সেইখানেই উহাদিগকে ধরিয়া সাজা দিতে লাগিলেন, এবং এইরূপে অবশেষে উহাদের উৎপাত নির্মূল করিলেন। রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ের দারুণ বিশৃঙ্খলা নিবারণ করিবার নিমিত্ত তিনি পরীক্ষাস্থলে প্রথমে পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত ভূমির যে বন্দোবস্ত করিলেন, তৎকালের সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত সে সময়ে আর হইতে পারিত না। বিচারকার্যনির্বাহার্থ তিনি জেলায় জেলায় ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট স্থাপন করিলেন এবং সাধারণের শান্তিরক্ষার্থ জেলায় জেলায় ডিস্ট্রিক্ট অফিসার নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে শাসনসংস্কারের বিলক্ষণ সৌকর্য

সাধিত হইল। তিনি সুপ্রীম কাউন্সিলকে কতিপয় কমিটিতে বিভক্ত করিলেন, এবং যে সমস্ত তত্ত্বাবধায়ক বোর্ড দ্বারা কোন কাজই হইত না, সেই সমস্ত বোর্ডের স্থলে এক এক বিভাগের উপরে এক একজন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (তত্ত্বাবধায়ক) নিযুক্ত করিলেন,—ইহাতে কার্য-যন্ত্র সুন্দররূপে চলিতে লাগিল এবং তাহার বিভিন্ন চক্রসমূহ যথানিয়মে ও সুশৃঙ্খলে ঘুরিতে লাগিল।

এদিকে যথাকালে হেস্টিংস সাহেব ইণ্ডিয়া অফিসের সহকারিতায় ও সহযোগিতায় নানা বিভাগের সংস্কারসাধনের পন্থা আবিষ্কার করিতেছিলেন, ওদিকে তৎকালে ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ কোম্পানীর কর্মচারিগণের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিতেছিলেন; কারণ ঐ সকল কর্মচারী কতিপয় বৎসর মাত্র এদেশে থাকিয়া অগাধ ধনসম্পত্তিসহ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন এবং প্রাচ্য রাজার হালে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতেন। এইরূপ আকস্মিক ভাগ্যবিবর্তনে অনেকেরই বিষম ঈর্ষার উদ্রেক হইত এবং তজ্জন্য তাহাদের নামে নানাপ্রকার দোষারোপ হইত। ক্রমে ভারতপ্রবাসী ইংরেজগণের নিন্দাবাদে ওয়েস্ট মিনিস্টার প্রাসাদের ভিত্তিসমূহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, এবং তাহাদের অন্যায্য অর্থোপার্জন অসম্ভবপর করিয়া তুলবার নিমিত্ত ও ভারতরাজ্যের শাসন ব্যাপার সুনিয়মে পরিচালিত করিবার জন্য বিবিধ বিধিব্যবস্থা ও আইন কানুন স্থিরীকৃত ও বিধিবদ্ধ হইতে লাগিল।

১৭৭২ অব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস্ কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালত নামে একটি চরম বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথম প্রথম প্রেসিডেণ্ট এবং কাউন্সিলের তিন জন বা ততোধিক সংখ্যক সদস্য লইয়া এই কোর্টের অধিবেশন হইত। মফস্বল আদালতের যে যে স্থলে বিবাদের বিষয়ীভূত সম্পত্তির মূল্য ৫০০০ হাজার টাকার অধিক হইত, সেই সেই স্থলেই ঐ সকল আদালতের উপর ইহার অধিকার ছিল।

পার্লামেণ্ট মহাসভা ভারতরাজ্যের শাসনসৌকর্যার্থ ১৭৭৩ অব্দে "রেগুলেটিং এক্ট্" নামে যে একটি আইন জারি করেন, তাহার বিধানানুসারে কলিকাতায় সুপ্রীমকোর্ট নামক বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পার্লামেণ্ট সভায় সভ্যগণ দুই দলে বিভক্ত এবং দুই দলের মত পরস্পরের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই দুই দলের মধ্যে যখন যে দল প্রবল থাকেন, তখন সেই দলই ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রিত্ব করেন। এই সময়ে যে দল মন্ত্রিত্ব করিতেছিলেন, তাঁহাদেরই সবিশেষ যত্ন ও চেষ্টায় উক্ত আইন বিধিবদ্ধ ও সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হয়; কারণ তাঁহাদের মনে এইরূপ একটা দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, ভারতস্থ ইংরেজগণ লুণ্ঠন ও প্রবঞ্চনা দ্বারা অগাধ অর্থ উপার্জন করিয়া থাকেন। বিচার ও শাসনবিভাগের স্বতন্ত্রীকরণই এই বিচারালয় স্থাপনের মুখ্য ও ব্যক্ত উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, এই সুপ্রীমকোর্ট ইংল্যাণ্ড হইতে প্রাপ্ত সহায়তার বলে ক্রমশঃ নিম্ন আদালতগুলির উপর কর্তৃত্ব করিতে সমর্থ হইবে এবং সমস্ত বিচার বিভাগ শাসনকর্মচারীদিগের

অধীনতা-পাশ ছেদন করিয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে পারিবে। সুপ্রীম কোর্টে প্রথমতঃ একজন চীফ্ জাষ্টিস্ (প্রধান বিচারপতি) এবং তিনজন পিউনি জজ অর্থাৎ অধস্তন বিচারপতি নিযুক্ত হন। তাঁহারা গভর্ণর ও কাউন্সিলের অনধীন হইলেন, এবং তদ্ভিন্ন তাঁহাদের হস্তে বিস্তৃত দেওয়ানী ও ফৌজদারি ক্ষমতা অর্পিত হইল। এই সকল বিচারপতি এইরূপ সংস্কারবদ্ধ হইয়া বঙ্গে পদার্পণ করিলেন যে, কোম্পানির কর্মচারিগণের অবিচারে ও অযথা উৎপীড়নে এতদ্দেশীয়দিগের দুঃখের অবধি নাই। পশ্চাল্লিখিত আখ্যায়িকায় তাঁহাদের সেই পূর্ববদ্ধ সংস্কারের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। এ দেশের লোকেরা উৎকট অত্যাচার উৎপীড়নে ক্লেশ ভোগ করিতেছে, এইরূপ প্রবল ধারণা লইয়া সুপ্রীম কোর্টের নবনির্বাচিত বিচারপতিগণ যখন চাঁদপাল ঘাটে অবতীর্ণ হইয়া এতদ্দেশীয়দিগকে নগ্নপদ দেখিলেন, তখন তাহাদের মধ্যে একজন অপর জনকে কহিলেন, "ঐ দেখ ভাই! এ দেশের লোক কি দারুণ উৎপীড়নই সহ্য করিতেছে। প্রয়োজনের পূর্বে সুপ্রীম কোর্টের সৃষ্টি হয় নাই। আমি বোধ করি, আমাদের কোর্ট প্রতিষ্ঠার ছয় মাসের মধ্যেই এই সকল হতভাগ্য ব্যক্তি জুতা ও মোজা পায়ে দিবার সংস্থান প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং এই সকল বিচারপতি যে এ দেশে উপস্থিত হইয়া সেই দিনই শাসনকর্মচারীদিগের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করিয়া তাহাদের দমনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি আছে?

এইরূপে সুপ্রীম কাউন্সিল (১৭৭৩ অব্দের যে রেগুলেটিং এক্টের বিধান-অনুসারে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইয়াছিল, তাহারই বিধান অনুসারে এই সুপ্রীম কাউন্সিলও সৃষ্ট হয়) এবং সুপ্রীম কোর্ট প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপূর্ণ নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, এবং তাহার ফলে বিচার ও শাসন-সংক্রান্ত ঊর্ধ্বতন কর্মচারীরা বিবদমান প্রতিপক্ষরূপে পরস্পরের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন চীফ্ জাষ্টিস্ এবং তাঁহার সহযোগী বিচারপতিগণ মনে করিতে লাগিলেন, কেবল কলিকাতার উপর কেন, কোম্পানির অধিকারস্থ তাবৎ ভূভাগের উপরই তাঁহাদের একাধিপত্য আছে। এই সময়ে এরূপ কথা ও জনশ্রুতি রটিতে লাগিল যে, এই সকল বিচারপতি যখন ইংল্যাণ্ডের রাজা ও পার্লামেণ্ট সভা হইতে ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন এবং যখন তাঁহারা কোন মতেই এ দেশের প্রধান শাসনকর্তার অধীন নহেন, তখন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল ও তাঁহার মন্ত্রিগণকে পর্যন্ত গ্রেপ্তার করিতে পারেন। মেকলে সাহেব স্বীয় স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় এই অবস্থার যে সমুজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা কিয়দংশে উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত অতিরঞ্জন হইলেও তাহাতে ইহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন;—"এই ইংরেজ ব্যবহারাজীবগণের আগমনে দেশ মধ্যে যে বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছিল; কোনও মারহাট্টা আক্রমণেও তাহা হয় নাই। সুপ্রীম কোর্টের সুবিচারের

তুলনায় পূর্ববর্তী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উৎপীড়কদিগের যাবতীয় অবিচারই পরম সুখকর বলিয়া প্রতীয়মান হইত।”

অবশেষে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ যখন মফস্বলের প্রাদেশিক বিচারালয়গুলি বিধিসঙ্গত রূপে স্থাপিত কি না—এই তর্ক উপস্থিত করিলেন, তখনই বুঝা গেল তাঁহাদের খেয়াল চরম সীমায় উঠিয়াছে। অতঃপর কাশীজোড়ার রাজার সুপ্রসিদ্ধ মোকদ্দমায়—সুপ্রীম কাউন্সিল এবং সুপ্রীম কোর্ট প্রকাশ্য সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। স-কাউন্সিল গভর্ণর জেনারেল রাজাকে বলিয়াছিলেন, তিনি যেন সুপ্রীম কোর্টর ডিক্রি প্রভৃতি আদেশ মান্য না করেন। সুপ্রীম কোর্টও গভর্ণর জেনারেল এবং কাউন্সিলের সদস্যগণের প্রত্যেকের নামে ব্যক্তিগত ভাবে সমন জারি করিলেন। অবশেষে ইংল্যাণ্ডে পার্লামেণ্ট সভায় আবেদন করা হইল এবং ১৭৮১ অব্দে একটি সংশোধক আইন জারি হইল। তদ্দারা সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইল, উহাকে সুপ্রীম কাউন্সিলের অধীন করা হইল এবং মফঃস্বলের বিচারালয়গুলির যে দেওয়ানীর অধীনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও স্বীকৃত হইল। এইরূপে ক্ষমতা ও প্রভাব সঙ্কুচিত হওয়ায় সুপ্রীম কোর্ট দ্বারা দেশের সবিশেষ হিত সাধিত হইতে লাগিল এবং উহা শীঘ্রই ইউরোপীয় ও দেশীয় উভয় সমাজের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল। এই গুরুতর সমস্যাকালে ওয়ারেন্ হেস্টিংস যে ধীরতা ও তীক্ষ্ণ মেধার সহিত কার্য করেন, তাহাতেই এই ঘোর সঙ্কট কাটিয়া যায়। অতঃপর তিনি সুবুদ্ধিসহকারে সার ইলাইজা ইম্পেকে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করায়, সমস্ত অপ্রীতিকর গণ্ডগোল চুকিয়া গেল। এই ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া মেকলে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন এবং ইম্পের চরিত্রের প্রতিও ঘৃণাসূচক শ্লেষোক্তি বর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু “বঙ্গদেশ রক্ষা পাইল, সৈনিক বলের সহায়তা গ্রহণ আর করিতে হইল না।” কেহ কেহ সুপ্রীম কোর্টকে কতকটা একাধারে মিলিত ইংল্যাণ্ডের কোর্ট অফ্ চ্যানসারি (Court of Chancery) ও কোর্ট অফ্ কিংস্ বেঞ্চের (Court of King's Bench) সহিত তুলনা করিয়াছেন।

১৮০১ অব্দে বা তৎসমকালে সুপ্রীম কোর্টের গঠনে আরও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধিত হইল এবং চিহ্নিত সিভিল সার্ভিস (Covenanted Civil Service) হইতে বাছিয়া আরও দুইজন পিউনি জজ নিযুক্ত করা হইল। ইহার কিছু কাল পরে স্থিরীকৃত হইল যে, সিভিলিয়ানেরাও সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ পাইতে পারিবেন। এইরূপে উত্তরোত্তর উহার গঠনে কিছু কিছু পরিবর্তন চলিতে লাগিল। অবশেষে ১৮৬২ অব্দে সুপ্রীম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালত—এই দুইটি বিচারালয় একত্র মিলিত করিয়া উহাদের স্থলে বর্তমান কলিকাতা হাইকোর্টের সৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশ এই হাইকোর্টের এলাকাধীন। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত, আদিম ও

আপীল। ইহার আদিম বিভাগ কতকটা পূর্বতন সুপ্রীম কোর্টের এবং আপীল বিভাগ সদর দেওয়ানী আদালতের প্রতিরূপ। ইহার আদিম বিভাগে কেবলমাত্র কলিকাতা শহরের দেওয়ানী মোকদ্দমার প্রথম বিচার হইয়া থাকে। আপীল বিভাগে আদিম বিভাগের এবং মফঃস্বল আদালতের মোকদ্দমার আপীলের শুনানী ও বিচার হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এই বিভাগে ফৌজদারী মোকদ্দমার মোশন ও আপীলের বিচার এবং অন্যান্য কাযও হইয়া থাকে। হাইকোর্টে আবার ইন্‌সলভেন্সি, একলিজিয়াস্টিক প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগ আছে, এবং তদ্ব্যতীত রেজিস্ট্রার, রিসিভার প্রভৃতিও কতিপয় আফিসও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। দেওয়ানী মোকদ্দমায় স্থলবিশেষে কলিকাতা হাইকোর্টে নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে আপীল হইয়া থাকে। প্রিভি কাউন্সিলের বিচার-বিভাগের ভার একটি জুডিসিয়াল কমিটির হস্তে ন্যস্ত। উক্ত কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট লর্ড চ্যানসেলর এবং বিলাতের সর্বোচ্চ শ্রেণীর আর কয়েকজন জজ লইয়া এই কমিটি গঠিত। তদ্ভিন্ন রাজা ইচ্ছা করিলে আরও দুইজন প্রিভি কাউন্সিলরকে কমিটির সদস্য নিযুক্ত করিতে পারেন। ইহাদের মধ্যে তিন জন সদস্য উপস্থিত হইলেই আদালতের কার্য চলিতে পারে এবং অধিকাংশের মতানুসারে বিচারের জয় পরাজয় হয়। জুডিসিয়াল কমিটির এই কয়েকটি ক্ষমতা আছে, যথা—(১) ইচ্ছানুসারে সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া বা লইবার আদেশ করা, (২) পুনর্বার শুনানির নিমিত্ত মোকদ্দমা অধস্তন বিচারালয়ে প্রেরণ করা, এবং (৩) এইরূপ পুনর্বার শুনানীর সময় আরও সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা, পূর্বে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, এরূপ প্রমাণ গ্রাহ্য করা, পূর্বে যাহা গ্রাহ্য করা হইয়াছে, এরূপ প্রমাণ অগ্রাহ্য করা এবং ইংল্যাণ্ডেশ্বরের অধিকারস্থ রাজ্যের যে-কোনও বিচারালয়ে ইতর বিচারের আদেশ করা। প্রিভি কাউন্সিলের বিচারের উপর আর আপীল চলে না। ১৭২৬ অব্দে যৎকালে মেয়র্স কোর্ট স্থাপিত হয়, তদবধি ভারতবর্ষের উপর প্রিভি কাউন্সিলের আধিপত্য চলিয়া আসিতেছে।

পূর্বতন কোর্ট অফ্ রিকোয়েস্টস্ নামক বিচারালয়ের স্থলে ১৮৫০ অব্দে বা তৎসমকালে কলিকাতার "স্মল জজ কোর্ট" স্থাপিত হয়।

গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে পুলিশের অকর্মণ্যতা ও উৎকোচগ্রহণাদি দোষের কথা সকলের মুখেই বিঘোষিত হইতে লাগিল। এবিষয়ের সংস্কার-সাধন-চেষ্টা প্রথমতঃ প্রেসিডেন্সি নগরগুলিতেই হয়; তদুদ্দেশ্যে প্রথমতঃ ম্যাজিস্ট্রেট হইতে স্বতন্ত্র কয়েকজন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং দেশীয় ও ইউরোপীয় বেসরকারী জাস্টিস্ অফ্ দি পীস নিযুক্ত করা হইল। এই পরীক্ষায় উক্ত প্রকার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির যৌক্তিকতা সর্বত্রই প্রতিপন্ন হইল। ওদিকে জাষ্টিস্ অফ্ দি পীসগণও অতি সন্তোষজনকরূপে আপনাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কাউয়েল সাহেবের সেই 'লেকচার' পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বেঙ্গল কাউন্সিলের ১৮৬৬ অব্দের ৪ আইনের বিধানের মর্ম এই যে,

কলিকাতার পুলিশের সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভার পুলিশ কমিশনার নামক একজন কর্মচারীর হস্তে থাকিবে এবং তিনি লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর (ছোট লাট) কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন ; তদ্ভিন্ন উক্ত কমিশনারের আদেশক্রমে তাঁহার কার্যসম্পাদন জন্য ছোট লাট্ বাহাদুর তদধীনে এক বা একাধিক ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত করিতে পারিবেন। কলিকাতা শহরে বিশেষ এক প্রকার পুলিশ ফৌজ থাকিবে এবং তাহার লোকসংখ্যা ছোট লাট ভারত গভর্ণমেণ্টের অনুমোদনক্রমে নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন। কমিশনার এই সকল লোককে নিযুক্ত করিবেন। তিনি তাহাদের অর্থদণ্ড করিতে এবং উহাদিগকে পদচ্যুত করিতেও পারেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বিশেষ আবশ্যক স্থলে সাধারণ পুলিশের ক্ষমতাবিশিষ্ট স্পেশ্যাল কনেস্টবলও নিযুক্ত করিতে পারেন। কলিকাতা হাইকোর্টের অধীনে আর দুইটি বিচারালয় আছে। তথায় যাবতায় মিউনিসিপাল ও পুলিশ সংক্রান্ত এবং অন্যান্য প্রকার ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার হইয়া থাকে। বিচারকার্যের সুবিধার নিমিত্ত বর্তমান সময়ে তিন জন ফৌজদারী ম্যাজিস্ট্রেট তিনটি আদালতের অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন, এবং তদ্ব্যতীত মিউনিসিপাল মোকদ্দমার বিচারের নিমিত্ত আর একজন মিউনিসিপাল ম্যাজিস্ট্রেট আছেন। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটগণের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা আছে। বোধহয়, পূর্বে যে জমিদারের কাছারী ছিল এবং কলিকাতার ইংরেজদিগের প্রথম উপনিবেশ স্থাপনকালে জাস্টিস্ অফ্ দি পীসগণের যে কাছারী ছিল, ঐ দুইটি বিচারালয়ের স্থলে কলিকাতা পুলিশ কোর্টের উদ্ভব হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় কলিকাতায় দুইটি জেলখানাও ছিল। একটি ছিল লালবাজারে। তৎসম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "উহা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর, কিন্তু উহাতে স্ত্রীলোকের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠের অভাব আছে।" অপরটি ছিল বড়বাজারে। তৎসম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "একটা আবদ্ধ স্থান, তথায় অত্যন্ত রোগপীড়া হওয়ার সম্ভব।" বর্তমান সময়ে প্রেসিডেন্সী জেল নামক একটি কারাগার ময়দানের (গড়ের মাঠের) উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। ইহাও উল্লিখিত আছে যে, শুক্রবার অপরাধীদিগকে বেত্রদণ্ড দিবার দিন বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল।

সেকালে ব্যবহারাজীবগণের সহিত কর্তৃপক্ষের প্রায়ই সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইত। ১৭৭৪ অব্দে একব্যক্তি লিখিয়াছেন, "ভারতীয় সেনাদলের যাত্রাকালে গলিত মাংসভোজী বায়সদল যেরূপ তাহাদের অনুসরণ করে, তদ্রূপ যে সকল এটর্নি শিকারের অন্বেষণে জজের অনুগমন করে, তাহারা দেশীয়দিগের মধ্যে মামলা-প্রিয়তার ভাব পরিপুষ্ট রাখিতে সতিশয় কৃতকার্য হইয়া থাকে ; তাহার একটি বিশিষ্ট কারণ এই যে, শিশুরা যেরূপ নূতন খেলনা পাইলে অতিশয় অহ্লাদিত হয়, দেশীয়েরাও তদ্রূপ বিরক্তিজনক মামলা-মোকদ্দমা দ্বারা পরস্পরকে উত্যক্ত করিয়া তুলিবার সুযোগ পাইলে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। আর এই যে সমাজের কণ্টকস্বরূপ বেলিফের (পিয়াদার) দল, এই দুর্বৃত্ত দল ভারতে নূতন

আবির্ভূত, ইহারা আইনের নির্যাতনে উৎপীড়িত হতভাগ্য শিকারের প্রতীক্ষায় শহরের প্রত্যেক রাস্তাতেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখা যায়। যে ইংরেজী উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারিতার ভাব গোলামকে প্রভুর প্রতি অবমাননাসূচক ব্যবহার করিতে এবং তাহার সেই ঔদ্ধত্য জন্য যথাযোগ্য দণ্ডিত হইলে তাহাকে ওয়েষ্টমিনিস্টারে ড্যামেজের (ক্ষতিপূরণের) নালিশ উপস্থিত করিতে শিক্ষা দেয়, অধুনা অতি সামান্য ভৃত্যেরাও সেই উদ্ধত ভাব প্রকাশ করতে শিক্ষা পাইয়া থাকে। যে সকল ভদ্রলোক আপনাদের গোলামের গায়ে হাত তুলিতে সাহসী হন, তাঁহাদের প্রতি এক্ষণে প্রতিদিনই যথেচ্ছ অর্থদণ্ডের প্রয়োগ হইয়া থাকে ওয়েস্টমিনিস্টারে যে বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ম্যাজিস্ট্রেট্ মেছুনীর ঝগড়ার বিচার করেন এবং শিলঙ ওয়ারেণ্টের বিক্রয়দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, এরূপ ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস যেরূপ, আজকাল বাঙ্গালার চীফ জাস্টিসের ভবনও সেইরূপ।

ওয়াণ্টার হ্যামিণ্টন স্বকীয় গেজেটিয়ারে লিখিয়াছেন, "সুপ্রীম কোর্টে সর্বশুদ্ধ ২০জন ব্যবহারাজীব স্বাধীনভাবে কার্য করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে ১৪ জন এটর্নি এবং ৬ জন ব্যারিস্টার। সে সময়ে ব্যবহারজীবগণ অগাধ অর্থ উপার্জন করিতেন, এবং তাঁহারা দেশীয়দিগের মধ্যে মোকদ্দমা বাধাইয়া তাদের মামলাপ্রিয়তা বাড়াইয়া তুলিতেন।" আর এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "ব্যবহারাজীবগণ যে এক একজন ধনকুবের হইয়া এদেশ হইতে প্রতিগমন করেন, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। তাঁহাদের ফি অত্যন্ত অধিক! তুমি যদি কোন বিষয়ে একটিমাত্র কথা জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে তোমাকে একটি সোনার মোহর ঝাড়িতে হইবে, আর তিনি যদি তিন ছত্রের একখানি পত্র লেখেন, তাহা হইলে অমনি ২৮ টাকা। পাছে তাহাদের হস্তে পড়িতে হয়, এই ভয়ে আমার থর থর কম্প উপস্থিত হয়; কারণ এত অধিক ব্যয়ভার বহন করিবার পর কত টাকাই বা উদ্ধার হইবে। সে যাহা হউক, এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে আদালতের রেজেস্টারিতে ১২ জন এটর্নির সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে; ইহাদিগকে তিন বৎসর মাত্র আর্টিকেল্ড্ ক্লার্ক (articled clerk) থাকিতে হয়, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এটর্নি হইতে হইলে পাঁচ বৎসর কাল এরূপ ক্লার্ক থাকিতে হয়। উইল প্রস্তুত করিবার ফি উহার দৈর্ঘ্যের পরিমাণানুসারে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। সে ফির ন্যূন পরিমাণ পাঁচ মোহর, কিন্তু ঊর্ধ্ব পরিমাণের নির্দেশ নাই, উহা যথেচ্ছ হইতে পারে। বিবাহ সংক্রান্ত চুক্তি পত্রাদির কথা কি বলিব, তাহাতে লোককে প্রায় সর্বস্বান্ত হইতে হয়। আর আদালতের প্রসেস্ উভয় পক্ষকেই সর্বস্বান্ত করিয়া থাকে। ৺প্যারিচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন, তৎকালে এটর্নির ক্লার্ক (উকিলের কেরাণী) হওয়া একটা বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল; তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ছিল, কতকগুলি ছাঁকা ছাঁকা বাঁধা বোল, আর যখন তিনি সেই সকল বোলের ব্যবহার করতেন, তখন লোকের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত।

সদর দেওয়ানী আদালত ও সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠার সহিত উকিল ও প্লীডার

নামক আর এক শ্রেণীর ব্যবহারাজীব আবির্ভূত হইয়াছেন। এটর্নিদিগের সহিত ইঁহাদের প্রভেদ এই যে, ইঁহারা সকল আদালতেই মোকদ্দমার সওয়াল জবাব করিতে পারেন; কিন্তু এটর্নিরা তাহা পারেন না। এই উকিল ও এটর্নি সম্প্রদায় উত্তরোত্তর সাতিশয় প্রভাবসম্পন্ন এবং কলিকাতা সমাজে বিশেষ গণ্যমান্য হইয়া উঠিতেছেন। এই ব্যবসায় বিলক্ষণ অর্থকর বলিয়া যুবকদিগের দৃষ্টি স্বতঃই ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং একথা বলিলে বোধ করি কিছুই অত্যুক্তি হইবে না যে, দেশের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাই এই ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইয়া ইহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। প্রথম অবস্থা হইতেই এই ব্যবসায়ে ব্যাবহারজীবগণ অগাধ অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। রমাপ্রসাদ রায়, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মোহিনীমোহন রায় প্রভৃতি অনেকেই স্ব স্ব উত্তরাধিকারীদিগকে বহুমূল্য সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কি, প্রভূত অর্থাগমের এই অভিনব পথ একমাত্র ইংরেজের আবিষ্কৃত। আজকাল উকিল মোক্তারের ছড়াছড়ি হওয়ায় এই ব্যবসায়ের আয় বহুজনের মধ্যে বিভক্ত ও বণ্টিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে উহার মোট পরিমাণ কিছুমাত্র কমে নাই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে। মোকদ্দমার সংখ্যা দিন দিন অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিতেছে, আর আইনের বিলম্বও অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। বিচারকগণ এই নিয়ত বর্ধমান কার্য শেষ করিয়া তুলিতে পারিতেছেন না। উকিল ব্যতীত বহুসংখ্যক দেশীয় ও ইউরোপীয় ব্যারিস্টার আছেন; তাঁহাদের আয়ের কথা শুনিলে সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যে সকল লেখক পূর্বতন ব্যবহারজীবগণের আয় দেখিয়া অবাক্ হয়েছিলেন, তাঁহাদের প্রেতাত্মা যদি এক্ষণে এই দেশের অবস্থা দেখিতে আসেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ হইবে, বলিতে পারা যায় না। বিচার অধুনা সহজে বা সামান্য ব্যয়ে পাইবার উপায় নাই। মোকদ্দমায় কিরূপে সর্বস্বান্ত হইতে হয়, তাহাই বুঝাইবার নিমিত্ত এক সময়ে একটি দেশীয় সংবাদপত্রে একটি বিদ্রূপাত্মক চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার মর্ম এইরূপ;—দুই ভ্রাতার পৈতৃক একটি দুগ্ধবতী গাভী ছিল। গাভীটির বিভাগ ও বণ্টন লইয়া ভ্রাতৃদ্বয় বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। চিত্রে এক ভাই গাভীর শৃঙ্গ ধরিয়া এবং অপর ভাই তাহার পুচ্ছ ধরিয়া টানাটানি করিতেছে; সেই অবকাশে উকিল বাবু গাভীটি দোহন করিয়া দুগ্ধটুকু বাহির করিয়া লইতেছেন।

পূর্বোক্ত বিচারালয় ব্যতীত অন্যান্য যে সকল অফিস-আদালত কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছে, স্থানাভাববশতঃ সে সকলের কথা এস্থলে কিছুই বলিতে পারা গেল না। বর্তমান শাসনপ্রণালী যে, এতদ্দেশীয়দিগের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও মনোভাবের সবিশেষ পরিবর্তন সাধন করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ শাসনকার্য পরিচালনের পাশ্চাত্য প্রথাটি এদেশে সম্পূর্ণ নূতন। প্রজাসাধারণের মস্তকে যে গুরুতর ব্যয়ভার পতিত হইয়াছে,

তাহা বহন করা নিতান্ত ক্লেশকর হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান শাসনপ্রণালী হইতে যে সমস্ত উপকার ও সুবিধা লাভ হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হইতেছে। এই পরগাছা হইতে যে নানা কুফলও না ফলিতেছে, এরূপও নহে। এ কথা সত্য যে, আমাদের ইংরেজশাসনকর্তৃগণ অতি উন্নত ও মার্জিত ভাব এবং সাধু উদেশ্য লইয়া এদেশের শাসনসংস্কারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহাদের সদুদ্দেশ্য সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে যে উপকার লাভ হইয়াছে, তাহা অবিমিশ্র শুভজনক নহে। এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধিবাসী-বর্গের বিদ্যাবুদ্ধিবিষয়ক নৈতিক ও সাংসারিক উন্নতিকল্পে যে সকল বিধিব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছে, তাহাব তত্ত্ব আলোচনা করিলে, এই মতের সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে। ইংরেজের বিধিব্যবস্থা প্রণয়নপ্রণালী ক্রমোন্নতিশীল। ১৮৫৭ অব্দের সিপাহীবিদ্রোহ প্রশমনের পর যৎকালে ইংলণ্ডেশ্বরী স্বহস্তে ভারতের শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন, তদবধি গভর্ণমেণ্টের বিধিব্যবস্থাসমূহ এক নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষ এক্ষণে ইংলণ্ডেশ্বরের সাম্রাজ্যের একটি অংশ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ইহার হিতাহিতও এক্ষণে ইংল্যাণ্ডের গভর্ণমেণ্টের সবিশেষ চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছে।

নবম অধ্যায়

মুদ্রাযন্ত্র বা সংবাদপত্র

যে সমস্ত কারণ প্রভাব বিস্তার করিয়া আধুনিক সভ্যতাকে বর্তমান পথে পরিচালিত করিয়াছে, তন্মধ্যে সংবাদপত্র অন্যতম প্রধান কারণ। সংবাদপত্রের প্রভাবের পরিমাণও ইহার যথোচিত স্থান নির্ণয় করা একান্ত দুঃসাধ্য। অনেকে বলিয়াছেন, "সংবাদপত্র রাজ্যের চতুর্থ বল।" বোধহয়, ইহার শক্তি তদপেক্ষাও অধিক। ল্যাটিন ভাষায় একটি প্রবাদ-বাক্য আছে, উহার অর্থ—'জনসাধারণের বাণীই ভগবানের বাণী'। সংবাদপত্র সেই জনসাধারণের বাণী প্রচার করিবার ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। সভ্যতার উন্নতির সহিত সংবাদপত্রের ইষ্টানিষ্ট-সাধনশক্তি অতি দ্রুতবেগে বৃদ্ধি ও পুষ্টি লাভ করিতেছে। ইংল্যাণ্ডের মহাবাগ্মী চেদাম যে সমস্ত প্রসিদ্ধ বক্তৃতা দ্বারা অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহার এক স্থলে সংবাদপত্রকে বায়ুর ন্যায় সর্ববন্ধনমুক্ত ও অব্যাহত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই সংবাদপত্রের রাজনীতি-সমালোচক আরাম কেদারায় অর্ধশয়ান অবস্থায় আরাম করিতে রাজা, সেনাপতি, রাজমন্ত্রী, ধর্মযাজক ও জনসাধারণকে স্ব স্ব কর্তব্য

সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না। ইহা চরিত্রহীন ব্যক্তিদিগকে চরিত্র দান করিয়া থাকে।

সংবাদপত্রের প্রকৃতি এইরূপ। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সিসিরো ও ডিমস্থিনিস যৎকালে বক্তৃতাদ্বারা জগৎকে মুগ্ধ করেন, তৎকালে সংবাদপত্রের শক্তি বিকশিত হয় নাই। অথধুনিক বাগ্মিগণকে বক্তৃতা করিতে বা প্রবন্ধ পাঠ করিতে বিস্তর অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কারণ তাঁহারা জানেন যে, যে নবশক্তি সদা আত্মাভিমানে মত্ত ও যাহার নিকট কোন ব্যক্তির, কোন ধর্মের পরিত্রাণ নাই, সেই শক্তি অচিরে তাঁহাদের উক্তি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিবে এবং সর্বজনসমক্ষে উপস্থিত করিয়া তাহার সমালোচনা করিবে। কথিত আছে যে, "সিজারের মহিষী সর্বপ্রকার নিন্দা ও সন্দেহ হইতে মুক্ত হইবে।" কিন্তু মহাপ্রভাবশালী সংবাদপত্রের নিকট তাঁহাকেও মস্তক নত করিতে হয়; নচেৎ উহা এক সময়ে সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবে এবং তাঁহার চরিত্রের দোষ উদ্‌ঘাটন করিতে সঙ্কুচিত হইবে না। বস্তুতঃ ইহা "শিক্ষকগণকেও শিক্ষা দিয়া থাকে"। ইহাই বিস্ময়ের বিষয় যে, চারিশত বৎসর কালের মধ্যে ইহা এতাদৃশ প্রভাবসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে এবং এরূপ অনির্বচনীয় ক্ষমতা অধিকার করিতে পারিতেছে। উল্লিখিত আছে যে, প্রথম সংবাদপত্র জার্মানি দেশে ১৪৯৮ অব্দে প্রকাশিত হয়।

বস্তুতঃ অতি প্রাচীনকালে যখন শাসনবিজ্ঞান ও শাসন-নীতি অতি অপক্ব অবস্থায় ছিল, সে সময়ে প্রশংসা ও নিন্দাবাদ সাধারণ্যে প্রচার করায় যে যথেষ্ট সুফল ফলিত, তাহা বেশ বুঝা যায়, কারণ প্রশংসা প্রচার দ্বারা সৎকর্মে উৎসাহ দেওয়া হইত এবং নিন্দা প্রচারে অসৎকর্মের দমন হইত। অন্যান্য লোকের ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা ও অনুমোদন করা, অথবা তাহাতে সম্মতি দেওয়া আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম। লোকে বলে, সত্য ও ন্যায় সমধিক প্রচার দ্বারাই বিলক্ষণ পুষ্টিলাভ করে। সংবাদপত্রের শিক্ষা দিবার শক্তিও বিলক্ষণ আছে, কারণ একাল পর্যন্ত জ্ঞান-বিস্তারের যে সমস্ত উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে সংবাদপত্র অতি অল্পকাল মধ্যে বহুলোকের নিকট যেরূপ সত্বর জ্ঞান বিস্তার করিতে পারে, আর কোনও উপায় দ্বারাই তেমন হয় না। ইহা জনসাধারণকে ভাব ও চরিত্র দান করে, এবং ইহা দ্বারা বর্তমান সাহিত্যের যে কতদূর উন্নতি সাধিত হইতেছে, তাহা বলিয়া বলিয়া শেষ করা যায় না। জ্ঞান-জনিত সাধুতা বলিয়া যে একটা জিনিস আছে, তাহা জ্ঞান বিস্তারের এই নবাবিষ্কৃত যন্ত্র দ্বারা বিলক্ষণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা বহু সংখ্যক লোকের মত গঠিত ও পরিচালিত করে এবং তাহার প্রতিধ্বনিও করিয়া থাকে। তথাকথিত 'বাক্‌শক্তিহীন" লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত প্রজা সংবাদপত্রকেই তাহাদের স্বত্বাধিকারের প্রকৃত ব্যাখ্যাকর্তা ও রক্ষক বলিয়া জানে। সুতরাং ইহা যে অল্পকাল মধ্যে মানবসমাজের বিষয় ব্যাপারে এতাদৃশ প্রভাব ও ক্ষমতা লাভ

করিবে, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? ইউনিভারসিটি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক হেনরি মর্লি "সংবাদপত্র প্রাচীন ও আধুনিক" এতদ্বিষয়ক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ইহার বীজ মধ্যযুগে প্রথম রোপিত হয়। খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে ভেনিস নগরে কর্তৃপক্ষীয়দিগের দ্বারা প্রস্তুত সাধারণের চিত্তাকর্ষক সংবাদসমূহে পূর্ণ একখণ্ড হস্তলিখিত কাগজ কোন প্রকাশ্য স্থানে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবার কথা প্রচলিত ছিল। ঐ প্রথা হইতেই সংবাদপত্রের উদ্ভব হয়। পূর্বোক্ত সংবাদপূর্ণ কাগজ পড়া যাহারা শুনিতে যাইত, তাহাদিগকে এক এক "গেজেটা" (এক প্রকার সামান্য মূল্যের মুদ্রা) দিতে হইত; ঐ গেজেটা কথা হইতেই উত্তরকালে "গেজেট" শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। মর্লি সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, ইংল্যাণ্ডে পূর্বে বণিকগণ যে সংবাদপূর্ণ চিঠিপত্র বিদেশে লইয়া যাইতেন, তাহা হইতেই সংবাদপত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে জনসাধারণের চিত্তাকর্ষক বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে সংবাদপূর্ণ কাগজ বাহির করা হইত। ইংল্যাণ্ডে ন্যাথানিয়েল বট্‌লার এবং ড্যানিয়েল ডিফো "উইক্‌লি নিউস (Weekly News)" নামে একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। মুসলমান শাসনকালে দেশীয় রাজগণের ব্যয়ে সংবাদসংবলিত কাগজ রাজকীয় গেজেট রূপে বাহির করা হইত। ঐ সকল কাগজে সত্য ও মিথ্যা ঘটনার বিবরণ সত্য বলিয়া প্রকাশ করা হইত, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোনরূপ সমালোচনা বা মন্তব্য প্রকাশিত হইত না। ঐরূপ কাগজের নাম ছিল "আকবর"। তাদৃশ গভর্ণমেণ্টের অধীন লেখকগণের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ইংরেজী সংবাদপত্রের সহিত ঐ সকল আকবরের তুলনাই হইতে পারে না।

ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত অতি বিচিত্র। প্রায় দুরতিক্রম্য অসুবিধা সমূহের মধ্যে ইহার উদ্ভব হয়, এবং তাহার পর পদে পদে ইহাকে নানারূপ সঙ্কটে পড়িতে হয়। তখন অবস্থা এরূপ ছিল যে, কর্তৃপক্ষীয়েরা ভারতে স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। ফরাসীরা তখনও বিলক্ষণ প্রভাবশালী ছিল এবং দারুণ উদ্বেগের কারণ হইয়া পড়িয়াছিল। তদ্ভিন্ন কতকগুলি ইংরেজ, বিশেষতঃ খ্রীষ্টীয়ান পাদরিরা, দেশীয়দিগের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতির তারস্বরে নিন্দা করিতেছিল। ঈদৃশ অবস্থায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষীয়েরা এই সব শক্তির অভ্যুদয় যে দারুণ ঈর্ষার চক্ষে দেখিবেন, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? তৎকালে এতদ্দেশের ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট বিলাতের এক বিশেষ সভার প্রত্যক্ষ অধীন ছিল, এবং সেই প্রভুরা এতদ্দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রকে বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সার জন্ ম্যাল্‌কম সাহেবের ভারত ইতিহাসের পরিশিষ্টে তাঁহার যে বক্তৃতা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতেই এই প্রণালীর সর্বোৎকৃষ্ট সমর্থন দৃষ্ট হয়। ঐ সমর্থনে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এতৎপ্রসঙ্গে উইলিয়ম ডিগ্‌বি সাহেব লর্ড হেস্টিংসকে ভারতীয় ইংরেজী সংবাদপত্রসমূহকে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ

করিবার সুযোগ প্রদানের নিমিত্ত প্রশংসা করিয়াছেন। পরন্তু এ বিষয়ে সার চার্লস মেট্‌কাফই (পরে লর্ড মেট্‌কাফ) সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান ও প্রশংসা পাইবার যোগ্য। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। তিনি পদত্যাগ করিয়া গমন করিলে সার চার্লস মেট্‌কাফ কিছুদিন তাঁহার পদে অস্থায়িভাবে কার্য করেন এবং সেই সুযোগে সেই সংস্কার সাধন করিয়া ভারতবাসীগণের আশীর্বাদভাজন হন। এই কার্য তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নিজ দায়িত্বে সংসাধন করিয়াছিলেন,—এ বিষয়ে মেকলে সাহেব তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীনতা লাভ করে। সার চার্লস্ মেট্‌কাফ প্রকৃতই "ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাদাতা" নামে অভিহিত হয়েছেন। যে মনোভাব ও প্রবৃত্তির উত্তেজনায় তিনি এই কার্যে ব্রতী হন, তাহা তাঁহার নিজ উক্তিতেই প্রকাশমান। তাঁহাকে যে অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হয়, তদুত্তরে তিনি বলেন, "জ্ঞান বিস্তারের ফলে পরিণামে ভারতে আমাদের রাজত্বের বিলোপ হইবে, ইহাই যদি উহাদের একমাত্র যুক্তি হয়, তাহা হইলে আমি এ বিষয়ে উহাদের সহিত তর্ক করিতে চাহি না, পরন্তু এইমাত্র বলিব যে, ফলে যাহাই হউক না কেন, জ্ঞান বিস্তার করা আমাদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। ভারতের অধিবাসীদিগকে অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন রাখিয়াই যদি ইহাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশীভূত করিয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের রাজত্ব এদেশের পক্ষে অমঙ্গলের কারণ হইবে, সুতরাং তাহার বিলোপ হওয়াই উচিত। * * * * আমরা যে কেবল দেশের রাজস্ব সংগ্রহ করিবার ও তদ্দ্বারা এই দেশ অধিকারে রখিবার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করিবার নিমিত্ত এবং অনটন পড়িলে ঋণ করিয়া তাহা পুরণ করিবার নিমিত্ত এখানে আছি, ইহা কখনই হইতে পারি না। নিঃসন্দেহই ইহা অপেক্ষা বহু মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আমরা এখানে আছি। তন্মধ্যে একটি প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দেশের সর্বত্র ইউরোপের মার্জিত জ্ঞান, সভ্যতা ও শিল্পবিজ্ঞান বিস্তার করিব এবং তদ্দ্বারা জনসাধারণের অবস্থার উৎকর্ষ বিধান করিব। এই সমস্ত অভিপ্রায় সিদ্ধির পক্ষে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।"

কলিকাতাবাসীরা এই মহোপকারের স্মরণার্থ ভাগীরথীর তীরে একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া তাহার নাম "মেট্‌কাফ হল্" রাখেন। যে উদ্দেশ্যে এই অট্টালিকা নির্মিত হয়, তৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, "ইহাতে একটি সাধারণ পুস্তকালয় থাকিবে এবং নানাপ্রকারে জ্ঞানবিস্তার কল্পে ইহার ব্যবহার হইবে। ইহাতে এইরূপ একটি ক্ষোদিত লিপি থাকিবে যে, স্যার চার্লস্ মেটকাফ্ ১৮৩৫ অব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রকে স্বাধীনতা প্রদান করেন; তদ্ভিন্ন উক্ত স্বাধীনতাদাতার অর্ধ-প্রতিমূর্তিও অট্টালিকা মধ্যে স্থাপিত হইবে।"

ইহার পর ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দুইবার অস্থায়িভাবে হরণ করা হয়। একবার ১৮৫৭ অব্দে সিপাহীবিদ্রোহরূপ শোচনীয় ঘটনার সময়, এবং দ্বিতীয়বার ১৮৭৮ অব্দে লর্ড লিটনের শাসনকালে। পরন্তু এই দ্বিতীয়বারে কেবল দেশীয় ভাষায় প্রচলিত সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করা হইয়াছিল। পরে লর্ড রিপন মহোদয় ১৮৭৮ অব্দে এই বিষম পক্ষপাতমূলক অহিতকর আইন রহিত করিয়া দেন।

১৭৬৮ অব্দে বোণ্টস্ নামক একজন সাহেব কাউন্সিল হাউসে এবং অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে এই মর্মে একটি বিজ্ঞাপন দেন যে, "যাহাতে প্রত্যেক লোকের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, এরূপ অতি প্রয়োজনীয় অনেকগুলি কাগজপত্র তাঁহার হাতে আছে, কোনও ব্যক্তি পাঠ করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাহা পাঠ করিতে দিবেন; আর মুদ্রণকার্যে অভিজ্ঞ কোন এক বা একাধিক ব্যক্তি মুদ্রাযন্ত্র চালাইতে চাহিলে তিনি সে বিষয়েও সর্বপ্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন, এবং তদ্ব্যতীত মুদ্রাযন্ত্রের আবশ্যক অক্ষর ও অন্যান্য সরঞ্জামও তিনি প্রদান করিবেন।" কলিকাতায় মুদ্রাযন্ত্রের অভাব সম্বন্ধে তিনি প্রায়ই অনুযোগ করিতেন। বস্টিড সাহেব এই সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করিবার সময় বলিয়াছেন,— "বোণ্টস সাহেব প্রকাশ্যে এই অনুযোগ প্রকাশ করিলেও তাহার পর একাদশ বৎসরেরও অধিক কাল ঐ অভাব অপূর্ণ অবস্থাতেই থাকিয়া যায়, কারণ মুদ্রিত আকারে সাধারণ সংবাদ প্রকাশ এবং দৈনন্দিন কাজকর্ম ও ইউরোপীয় অধিবাসীদিগের সামাজিক অভাবসমূহ প্রচার করিবার প্রধান উপায় মুদ্রাযন্ত্র। এই মুদ্রাযন্ত্র এশিয়ার সর্বপ্রধান নগর (কলিকাতা) ১৭৮০ অব্দের পূর্বে প্রাপ্ত হয় নাই।" কলিকাতায় প্রচলিত প্রথম সংবাদপত্রের নাম "বেঙ্গল গেজেট"; উহা ১৭৮০ অব্দের ২০শে জানুয়ারী শনিবার (অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ "টাইমস্" প্রকাশিত হইবার আট বৎসর পূর্বে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা প্রচারিত হইবার বিজ্ঞাপনে এইরূপ লিখিত ছিল; "রাজনীতি ও বাণিজ্য-বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র, সকলেরই নিকট উন্মুক্ত, কিন্তু কাহারও প্রভাব-পরিচালিত নহে।" দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৮ ইঞ্চি—এইরূপ দুই খণ্ড কাগজে ইহার অবয়ব গঠিত হইত; তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তিন কলম (স্তম্ভ) করিয়া মুদ্রিত "ম্যাটার" থাকিত, এবং তাহার অধিকাংশই বিজ্ঞাপনে নিয়োজিত হইত। এতৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে: "এই ক্ষুদ্র কাগজের অধিকাংশ স্থান কলিকাতার ও মফঃস্বলের পত্রলেখকগণের পত্রে পূর্ণ হইত, তদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে ইউরোপ হইতে যে নূতন সংবাদ আসিত, তাহাও উদ্ধৃত হইত। ইহার কাগজ এবং ছাপা অতি কদর্য ছিল।" জেম্‌স্ অগস্টস হিকি নামক একজন সাহেব ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। বস্টিড্ সাহেবের লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, উক্ত সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার পূর্বে হিকি সাহেবকে বহু ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। জীবনসংগ্রামে তাঁহাকে নানাপ্রকার ভাগ্যবিপর্যয় অতিক্রম

করিতে হইয়াছিল। বস্টিড্ সাহেব আরও বলেন,—"প্রথমে যে সকল লেখকের নামের তালিকা বাহির হয়, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিবার সময় স্বত্বাধিকারী প্রকাশ করিয়াছেন যে, সংবাদপত্ররূপ হিতকর অনুষ্ঠানটিকে তিনি যদি সৌভাগ্যক্রমে সৌষ্ঠবসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলেই আপনাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত জ্ঞান করিবেন, যেহেতু উহা অল্পকাল মধ্যে একটি অমোঘ পিত্তঘ্ন ঔষধরূপে পরিণত হইবে, কারণ তিনি আশা করেন যে, তাঁহার গ্রাহকেরা টিংচার অভ্ বার্ক, ক্যাস্টর অয়েল বা কলম্বো রুট্ অপেক্ষা উহা হইতে অধিকতর প্রকৃত উপকার লাভ করিবেন।" এই নবজাত সংবাদপত্রের জীবনের প্রথম কয়েক মাস বেশ সুখশান্তিতে কাটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ইহা সাধারণতঃ নীরস ও অনেকটা ইতর প্রকৃতির হইলেও মোটের উপর নিরীহভাবেই চলিয়াছিল। প্রধানতঃ স্বাধীন বাণিজ্যব্যবসায়ী জনগণ হইতে এবং বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজ হইতে ইহার নিমিত্ত গ্রাহক সংগ্রহ করা হইত। ইহার সমলোচনা এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ ইউরোপীয় ও ভারতীয়দিগের প্রতিকূলে তুল্যরূপেই চালিত হইত। ওয়ারেন হেস্টিংস ও স্যার ইলাইজা ইম্পের প্রতি আক্রমণের নিমিত্ত এই সংবাদপত্র বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। ফ্রান্সিস্ সম্বন্ধে বস্টিড বলেন,—"এমন কথা বলা যায় না যে, তাহার চরিত্র আচরণ সকল সময়েই এতদূর নিষ্কলঙ্ক ছিল যে, নীতিপ্রিয় হিকি তাহার সমালোচনা করিবার সুযোগ কখনই প্রাপ্ত হন নাই; নিরপেক্ষভাবে চলিতে হইলে যে সকল স্থলে প্রকাশ্য মন্তব্য প্রকাশ করাই সঙ্গত, সে সকল স্থলে হয় ত কোন কথাই বলা হয় নাই, অথবা তাঁহার অনুকূলেই বলা হইয়াছে। সমাজের সরকারী নেতাদিগের মধ্যে একমাত্র ফ্রান্সিসই কোমল ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

আর এক স্থলে লিখিত আছে,—"সরকারী কার্যে বা সামাজিক হিসাবে যাঁহারা প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের অনেককেই যেরূপভাবে ও যে ভাষায় আক্রমণ করা হইত, তাহাতে বিদ্বেষপূর্ণ শক্রতার ভাবই প্রকাশ পাইত; আবার তাঁদের মধ্যে যাঁহারা সর্বপ্রধান, তাঁহাদিগকে সাধারণের নিকট নিতান্ত ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র করিয়া তোলা হইত।"

হিকির সমালোচনার রীতি-প্রণালী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে: "বেঙ্গল গেজেট যাহাদিগকে সাধারণের নিকট বিদ্রূপপাত্র করিতে ইচ্ছা করিত, তাহাদিগকে করাঘাত করিবার জন্য উহার এই একটি প্রিয় প্রথা ছিল যে, উহা একটি নাটক বা প্রহসনের অভিনয়ের বা কনসার্টের বিজ্ঞাপন ঘোষণা করিত (কারণ ঐগুলিই তৎকালে প্রচলিত আমোদ ছিল) এবং সেই সঙ্গে উহার লক্ষ্য ব্যক্তিবর্গের এক একজনকে অতি সামান্য ও সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত করিয়া কে কোন্ অংশের বা চরিত্রের অভিনয় করিবে, তাহা নির্দেশ করিয়া দিত।"

পাদরি লঙ সাহেব বলেন: "উহার লেখা ক্রমশঃ এরূপ জঘন্য হইয়া উঠিল যে, ১৭৮০ অব্দের ১৩ই নবেম্বর গভর্ণমেণ্ট এক আদেশ প্রচার করিয়া জেনারেল

পোস্ট অফিস হইতে উহার প্রচলন রহিত করিয়া দিলেন, কারণ কিছুদিন হইতে উহাতে এমন কতকগুলি কদর্য প্যারাগ্রাফ বাহির হইতেছিল যে, তাহাতে ব্যক্তিগত চরিত্রের নিন্দাগ্লানি বিদ্যমান এবং তাহার লেখার ফলে উপনিবেশের শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। হিকি তাঁহার কাগজ বিলি করিবার নিমিত্ত ২০ জন হরকরা নিযুক্ত করিলেন এবং বলিলেন যে, যদিও তাঁহাকে হোমারের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাথা রচনা করিয়া কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় বিক্রয় করিয়া বেড়াইতে হয়, তথাপি তিনি গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ক্ষান্ত হইবেন না। এইরূপে দীর্ঘকাল বিবাদ করিবার পর, তাঁহাকে কারাগারে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়।"

"ওরিজিনাল ইনকোয়ারি" নামক গ্রন্থের লেখক ভারতের স্বাধীন-মুদ্রাযন্ত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে হিকির বেঙ্গল গেজেট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন: "স্থানীয়গভর্ণমেণ্টগুলি ১৭৯৩ অব্দের আইনের বিধানানুসারে নির্বাসনদণ্ড দানের ক্ষমতাপন্ন হওয়ার সময় হইতে ভারতে স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্রের অস্তিত্ব মুহূর্তের জন্যও ছিল না বটে, তথাপি কলিকাতার সেন্সরের পদ সৃষ্ট হইবার পূর্বে এবং উহা উঠিয়া যাইবার পরে, কোন কোন সংবাদপত্র-সম্পাদক সময়ে সময়ে নিজ দায়িত্বে রাজকীয় কার্যাবলীর ও সরকারী কর্ম-চারীদিগের সম্বন্ধে প্রকৃত ব্যাপার ও আপনাদের মতামত প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছেন এবং তাহার ফলে অনেক সময় আপনাদের সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন। এইরূপ কথার প্রচার দ্বারা কখনও যে কোন বিশেষ বা স্থানীয় ভাবের কোনও অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ পাওয়া যায় না; অথবা তাহা বিশ্বাস করিবার বিন্দুমাত্রও হেতু দৃষ্ট হয় না। পরস্পর বিসংবাদী বিধি ব্যবস্থা দ্বারা যে গুরুতর বিশৃঙ্খলাসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়, এবং তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৭৮০ অব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে; কিন্তু হিকির বেঙ্গল গেজেটের প্রচার দ্বারা যে গুরুতর অনিষ্ট ঘটিয়াছিল বলিয়া সার জন ম্যাল্‌কম অনুমান করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি একটিও দৃষ্টান্ত দিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, উক্ত সংবাদপত্রের ফাইল পরীক্ষা করিলে তৎকালে জনসাধারণের মধ্যে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইত, তাহাদের ভাব ও প্রকৃতি এবং যাঁহারা উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদের চরিত্রের অনেক তথ্যই অবগত হওয়া যায়; আর ঐরূপ সংবাদপত্র পাঠ ভিন্ন তদানীন্তন কালের অবস্থার প্রকৃত জ্ঞান লাভের অন্য উপায়ও নাই।"

বর্তমান সময়ের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, তদানীন্তন কালের ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাসঙ্কোচক বিধি ব্যবস্থাগুলি নিতান্ত কঠোর বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ভারত গভর্ণমণ্টের চরিত্র ও কার্যসম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের আলোচনাই নিষিদ্ধ ছিল। এই নিয়মের লঙ্ঘনকারী

দেশীয় হইলে তাহার প্রতি অর্থ ও কারাদণ্ডের এবং বিলাতজাত ইংরেজ হইলে তাহার প্রতি নির্বাসনদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। তদানীন্তন কালের অবস্থানুসারে এই সমস্ত নিষেধবিধির আবশ্যকতা হইয়াছিল, অথবা তৎকালীন কর্তৃপক্ষীয়-দিগের যথেচ্ছচারিতা হইতে উহাদের উদ্ভব হইয়াছিল, একথা এখন নিশ্চয় করিয়া বলা সহজ নয়। পরন্তু ইহাই কৌতূহলের বিষয় যে, দেশীয়দিগের অপেক্ষা ইংরেজদিগের প্রতিই অধিক দণ্ডের প্রয়োগ হইত। তৎকালে মুদ্রাযন্ত্রের পরিচালন ভার প্রায়শঃ ইংরেজদিগের হস্তেই ছিল। কিন্তু কতিপয় বর্ষ পরে, সম্ভবতঃ ১৮১৬ অব্দ হইতে, এতদ্দেশীয়েরা সংবাদপত্রপ্রচার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

সুপ্রসিদ্ধ জেমস্ সিল্ক বাকিংহাম কর্তৃক সম্পাদিত "কলিকাতা জার্ণাল" নামক সংবাদপত্র লইয়া জন অ্যাডাম সাহেবের বিস্তর বিবাদ-বিসংবাদ চলিয়াছিল। মাননীয় জন অ্যাডাম কিছুদিনের জন্য গভর্ণর হন। সম্পাদক অতি উদ্ধত ও বিদ্বিষ্টময় ভাবে গভর্ণরের ব্যক্তিগত চরিত্র আক্রমণ করিয়া দোষের কার্য করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। পরন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার প্রতি যে নির্বাসনদণ্ডের প্রয়োগ করা হইয়াছিল এবং তাঁহাকে যেরূপ কষ্ট দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ন্যায়সঙ্গত হয় নাই।

লর্ড হেস্টিংসের শাসনকালে একমাত্র ইংরেজরাই সংবাদপত্র পরিচালন করিতেন এবং তাঁহার নিকট বিলক্ষণ উৎসাহ ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতেন। মাদ্রাজের অধিবাসীরা উক্ত মহাত্মাকে যে অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন, তদুত্তরে তিনি বলেন—"আমি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-সঙ্কোচক বিধিসমূহ অপনীত করিয়াছি এবং ভারতীয় ইংরেজগণকে মতামত প্রচারের স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছি, কারণ আমার বিবেচনায় উহা ইংরেজ জাতির প্রকৃতিসিদ্ধ অধিকার।" আর এক স্থলে উক্ত মহাত্মা বলেন, "নিজের সাধুতার জ্ঞান থাকিলে, সাধারণের সমালোচনা দ্বারা কর্তৃপক্ষীয়দিগের আত্মশক্তির কিছুই হ্রাস হয় না; প্রত্যুত তদ্দ্বারা তাঁহাদের শক্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।" সুখের বিষয় এই যে, সে সময়েও কর্তৃপক্ষীয়েরা প্রকাশ্য সমালোচনার শক্তি ও উপকারিতা অনুভব করিতেন। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, তদানীন্তনকালে উচ্চপদস্থ ক্ষমতাপন্ন রাজপুরুষদিগের ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ্যে সমালোচনা করা অতি গুরুতর ব্যাপার ছিল, এবং গভর্ণমেণ্ট যে সময়ে সময়ে সংবাদপত্র সংক্রান্ত অভিযোগ উপস্থিত করিতেন, তাহারও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পরন্তু ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র পরে যে ক্ষমতা লাভ করে, তাহা যে উত্তরোত্তর পরিপুষ্ট ও বর্ধিত হইয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। উদারহৃদয় গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং মুদ্রা-যন্ত্রের মহিমা বেশ বুঝিতেন, এমন কি সিপাহী-বিদ্রোহের সেই নিদারুণ সঙ্কট-কালেও তিনি তাহা বিস্মৃত হন নাই। উক্ত মহাত্মা বলিয়াছিলেন,—"মুদ্রা-যন্ত্রের স্বাধীনতা দ্বারা যে ইষ্ট সাধিত হয়, তাহা এরূপ সুস্পষ্ট ও সর্বজনস্বীকৃত

যে, উহার অপব্যবহার দ্বারা যে অনিষ্ট উৎপন্ন হয় তদপেক্ষা ইষ্টের গুরুত্ব অধিক—অনিষ্ট ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ইষ্ট চিরস্থায়ী।"

ক্রমে আরও কয়েকখানি সংবাদপত্র নগরে আবির্ভূত হইয়াছিল: "মনিটরিয়াল গেজেট" নামে একখানি সংবাদপত্র ছিল; পাদরি লঙ সাহেব বলেন, ১৭৮০ অব্দে কিয়ার্নাণ্ডার সাহেবের একটি মুদ্রাযন্ত্র ছিল। বর্তমান প্রধান প্রধান ইংরেজী সংবাদপত্রগুলির পূর্ব বৃত্তান্ত জানিতে পাঠকগণের কৌতূহল হইতে পারে, এজন্য পশ্চাতে তাহা প্রকাশ করা গেল:

জন বুল—ইহাই উত্তরকালে "ইংলিশম্যান্" রূপে আবির্ভূত হয়। বাকিংহাম সম্পাদিত "কলিকাতা জার্নাল" নামক সংবাদপত্রের প্রভাব খর্ব করিবার উদ্দেশে ১৮২১ অব্দে ইহা প্রকাশিত হয়। বাকিংহাম সাহেব ১৮১৮ অব্দে "কলিকাতা জার্নাল" প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই সংবাদপত্রের পরিচালনার্থ প্রথমে ৩০,০০০ টাকা মূলধন নিয়োগ করা হয়, কিন্তু পরে ক্রমে ক্রমে মূলধন যোগ করিতে করিতে কারবারটির মূল্য পরিণামে চারি লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়, এবং উহাতে বৎসরে ৮০ হইতে ৮০ হাজার টাকা লাভ হইত। প্রথম পাঁচ বৎসরে ইহা বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। সকল শ্রেণীর লোকেই ইহার গ্রাহক মধ্যে পরিগণিত ছিল। কিন্তু তাহার পর ইহা কর্তৃপক্ষীয়দিগের বিরাগভাজন হইয়া পড়ে, এবং সম্পাদকের নামে কয়েকটি মানহানির মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়। বাকিংহাম সাহেবের মতে, তৎকালে কলিকাতায় আর ছয়খানি সংবাদপত্র ছিল। তন্মধ্যে "এশিয়াটিক মিরর" পাদরি জন ব্রাইসের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। বর্ণিত আছে যে, মাননীয় আডাম্স্ সাহেবের সহিত তাঁহার ভয়ানক বাগযুদ্ধ ঘটে, তাহাতে ইউরোপীয় সমাজ একেবারে চটিয়া যায় এবং তাঁহার কাগজ ক্রমশঃ অবনতি পাইতে থাকে। এক্ষণে একমাত্র কলিকাতা জার্নাল'ই নিজ বিরাগভাজন কর্মচারীদিগের প্রতিকূল সমালোচনা করিতে লাগিল। এই সময়ে "জনবুল" পত্র উহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অবতীর্ণ হইল। সৈনিক ও অসৈনিক রাজপুরুষেরাই ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও উন্নতিসাধক হইলেন। সুতরাং ইহা অচিরকাল মধ্যে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়া উঠিল। অতঃপর কলিকাতা জার্নালের সম্পাদক জন বুল সম্পাদকের নামে মানহানির এক নালিশ উপস্থিত করেন। বোধ হয়, সে সময়ের ইংরেজী সংবাদপত্রগুলির প্রকৃতি ও অবস্থার

---

* বস্টিড সাহেব সেকালের সংবাদপত্রের এইরূপ একটি তালিকা দিয়াছেন . —ইণ্ডিয়ান্ গেজেট (নবেম্বর, ১৭৮০) : কলিকাতা গেজেট এণ্ড ওরিএন্টাল এডভার্টাইজার (সম্পাদক ফ্রান্সিস্ গ্ল্যাডউইন, ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৪) ; বেঙ্গল জর্নাল (ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৫) ; ওরিএন্টাল ম্যাগাজিন (৬ই এপ্রিল, ১৭৮৫) ; কলিকাতা ক্রনিকল (জানুয়ারি, ১৭৮৬)।

সহিত বর্তমান সময়ের বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহের পরস্পরের সহিত বাগযুদ্ধের তুলনা করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

ইংলিশম্যান—যে রাজনৈতিক ভাব লইয়া "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস্" জন্মগ্রহণ করে, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব লইয়া ইহা আবির্ভূত হয়। ১৮২১ অব্দে, অর্থাৎ যে বৎসর ইংলণ্ডেশ্বর চতুর্থ জর্জের সহিত তদীয় হতভাগা মহিষীর বিবাদ চরম সীমায় উপস্থিত হয়, সেই বৎসর "জন বুল" রাজার পক্ষসমর্থনকারী এবং ব্যক্তিগত কুৎসাবাদের নিন্দাকারীরূপে জন্মগ্রহণ করে। ব্যক্তিগত কুৎসাই এ পর্যন্ত কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহের প্রধান অবলম্বন ছিল, কিন্তু জনবুল এক নূতন পথে চলিতে লাগিল। থিওডোর হুকের পত্রের নামের অনুকরণে এই নাম রাখা হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হয়। ইহা অচিরকাল মধ্যে বহু উচ্চপদস্থ সিভিলিয়ানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিল এবং কিছুদিনের মধ্যে সরকারী মুখ-পত্রস্বরূপ হইয়া পড়িল। পরন্তু সর্বপ্রকার সংস্কারের দৃঢ় বিরোধী হওয়ায় অল্প-কাল মধ্যে ইহার গ্রাহক-সংখ্যা অনেক কমিয়া গেল। অবশেষে যখন জে. এইচ. স্টকেলার সাহেব ১৮৩৩ অব্দে নামমাত্র মূল্যে ইহা ক্রয় করেন, তখন ইহার মুমূর্ষু-দশা। স্টকেলার সাহেবই ইহার নাম "ইংলিশম্যান্" রাখেন ও ইহাকে নবজীবন প্রদান করেন। তৎকালে সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক থ্যাকারের পিতৃব্য চার্লস্ থ্যাকারে ইহার অন্যতম বেতনভোগী লেখক কর্মচারী ছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে এরূপ লিপিচাতুর্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয়, থ্যাকারে পরিবারের মধ্যে উক্ত ঔপন্যাসিকই যে একমাত্র সাহিত্যরথী ছিলেন, এরূপ নহে। এই ইংলিশম্যান্ মুদ্রাযন্ত্রেই সুপ্রসিদ্ধ মেকলে তাঁহার ক্লাইভ ও হেস্টিংস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি প্রথম মুদ্রিত করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর জে. ওবি. সাণ্ডার্স ইংলিশম্যানের স্বত্ব ক্রয় করিয়া লন। তাঁহারই পুত্র ইহার বর্তমান প্রধান স্বত্বাধিকারী।

স্টেটস্‌ম্যান এণ্ড ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া—ইহা প্রথমতঃ "ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া" নামে মাসিক পত্রের আকারে ১৮১৮ অব্দের এপ্রিল মাসে আবির্ভূত হয়। ডাক্তার মার্শম্যান উহার উক্তরূপে নামকরণ করেন, এবং মিশনারিদিগের যত্নপ্রভাবেই ইহার জন্ম হয়। ভারতবর্ষের উন্নতি ও সংস্কার সংক্রান্ত নানা বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ, লর্ড হেষ্টিংসের প্রভাবে দেশ মধ্যে যে সমস্ত নানাবিধ সভাসমিতি উৎপন্ন হইতেছিল, তাহাদের রিপোর্ট, এবং অন্যান্য দেশের বাইবেল, মিশনারি ও শিক্ষা-সংক্রান্ত সমাজসমূহের কার্যাবলীর উল্লেখ ও সমালোচনা প্রকাশ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ডাক্তার মার্শম্যান ১৮২০ অব্দের জুন মাসে ইহার এক ত্রৈমাসিক সংস্করণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। দেশের হিতাহিত সম্পর্কীয় বহু বিষয়ের আলোচনার জন্য ইহার কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহার নিয়মিত প্রকাশে ব্যাঘাত ঘটিতে থাকে। সেইজন্যই তিনি ভারতসংক্রান্ত বিষয়সমূহের প্রবন্ধ এবং ভারতের ইষ্টানিষ্টের সহিত সম্পর্ক

থাকিতে পারে এরূপ যে-কোন গ্রন্থ ইউরোপে বা ভারতে প্রচারিত হউক, তাহার সমালোচনা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত একখানি ত্রৈমাসিক পত্রের সৃষ্টি করেন। প্রথম প্রথম কিছুকাল ইহা সতীদাহপ্রথা নিবারণের পক্ষাবলম্বন করে, এবং মাননীয় আডাম সাহেব ইহার ঐ সমস্ত মর্মভেদী প্রবন্ধ একটা বিশেষ নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে বলিয়া কাউন্সিলে আবেদন করিতে বাধ্য হন, কারণ উক্ত নিয়মানুসারে ঐ সময়ে, যেরূপ আলোচনায় দেশীয়দিগের মনে তাহাদের ধর্মবিশ্বাসে বা ধর্মকর্মে হস্তক্ষেপ হইবে বলিয়া আশঙ্কা জন্মিতে পারে, এরূপ এরূপ আলোচনা করা নিষিদ্ধ ছিল। অ্যাডাম সাহেব ঐ আবেদন করিয়া প্রার্থনা করেন যে, সংবাদপত্র সম্পাদকগণকে যেন ভবিষ্যতে ঐরূপ আলোচনা হইতে বিরত থাকিতে আদেশ করা হয়। কিন্তু লর্ড হেস্টিংস ঐ সমস্ত প্রবন্ধ বিশেষ আপত্তিজনক বিবেচনা না করায় তিনি অ্যাডাম সাহেবের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অধিকন্তু তিনি ডাক্তার মার্শম্যান্‌কে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, আমার নিজের কথা বলিতে হইলে, সতাদাহ প্রথা সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যায়, ইহাই আমার একান্ত অভিপ্রায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, মুদ্রাযন্ত্র তৎকালে দৃঢ়রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। লর্ড হেস্টিংস ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রকে সর্বদা উৎসাহ দিতেন, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষীয়েরা এবং তাঁহার নিজ কাউন্সিলের সদস্যগণ তাঁহাকে নানাপ্রকার বাধা দিতেন, তিনি ভারতবর্ষে আসিবার সময় মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে অতি উদার মত লইয়া আসিয়াছিলেন। ভারত ইতিহাসের পাঠকগণ বিদিত আছেন যে, ১৭৯৯ অব্দে যৎকালে টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময়ে মুদ্রিতব্য বিষয়ের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার কঠোর নিয়মাবলী প্রবর্তিত হয় অর্থাৎ সেন্সর প্রথার সৃষ্টি হয়। নিয়ম হয় যে, "প্রত্যেক প্রিণ্টারকে নিজ কাগজের প্রত্যেক সংখ্যায় আপনার নাম সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে এবং তাহা প্রকাশ করিবার পূর্বে তাহার একখণ্ড অনুলিপি গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর পরিদর্শনার্থ প্রেরণ করিতে হইবে, অন্যথা তাঁহাকে ইংল্যাণ্ডে প্রতিগমনরূপ দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে।" সেন্সর (পাণ্ডুলিপি পরীক্ষক) যে প্রবন্ধটি গভর্ণমেণ্টের বা সমাজের ক্ষতিকর হইতে পারে বলিয়া মনে করিতেন, তাহা তিনি কলমের আঁচড়ে কাটিয়া দিতেন। এই হেতু তৎকালে সংবাদপত্রসমূহ প্রায়ই দুই একটি কলমে কেবল তারকাচিহ্নের (*) শোভা লইয়া প্রকাশিত হইত। লর্ড হেস্টিংস তাঁহার কাউন্সিলের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৮১৮ অব্দের ১৯শে আগস্ট তারিখে কোনরূপ হেতুবাদ প্রদর্শন না করিয়া উক্ত প্রকার পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার প্রথা রহিত করিয়া দেন। সম্পাদকদিগের নিমিত্ত তিনি কতকগুলি নিয়মও বিধিবদ্ধ করেন। ভারতবর্ষ সংক্রান্ত ইলাণ্ডীয় কর্তৃপক্ষগণের বিধিব্যবস্থা ও অন্যান্য কার্যের প্রতিকূল মন্তব্য, স্থানীয় শাসনকর্তাদিগের রাজনৈতিক কার্যের আলোচনা, এবং কাউন্সিলের সদস্য, সুপ্রীম কোর্টের জজ, বা লর্ড বিশপের সরকারী কার্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রকাশ করা তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ হইল। তদ্ভিন্ন, দেশীয়

প্রজাবর্গের মনে তাহাদের ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মকর্মে হস্তক্ষেপ করিবার সঙ্কল্প হইয়াছে এইরূপ আশঙ্কা বা সন্দেহ জন্মিতে পারে এরূপ ভাবের আলোচনা করা; অথবা ইংরেজী ও অন্যান্য সংবাদপত্র হইতে ঐ শ্রেণীর প্রবন্ধ সঙ্কলন করিয়া পুনঃ প্রকাশ করা, এবং যাহাতে সমাজমধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ ও অনৈক্য জন্মিতে পারে, এরূপ ভাবের ব্যক্তিগত কুৎসা বা চরিত্র সমালোচনা প্রচার করাও নিষিদ্ধ হইল। আরও বিধান হইল যে, কেহ এই সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিল গভর্ণমেণ্ট তাঁহার নামে সুপ্রীম কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, অথবা অপরাধীর লাইসেন্স (অনুমতিপত্র) রহিত করিয়া তাঁহাকে ইউরোপে ফিরিয়া যাইবার আদেশ করিতে পারিবেন। ফলতঃ এই সমস্ত নিয়ম এরূপ কঠোর হইয়াছিল যে, সেগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করিলে সর্বপ্রকার স্বাধীন সমালোচনাই একেবারে অন্তর্হিত হইত। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা সাধারণতঃ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন, এবং ঐ সকল নিয়ম জারি হইবার পরও তাঁহারা একবার একটি ফৌজদারি মোকদ্দমা অনুমোদন করিতে অস্বীকৃত হন। লর্ড হেস্টিংসও আপনার শাসন-কালকে সংবাদপত্র সম্পাদকের নির্বাসনরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। এই সমস্ত কারণে নিয়মগুলি শীঘ্রই মৃতপ্রায় অকার্য্যকর এবং মুদ্রাযন্ত্র কার্য্যতঃ স্বাধীন হইয়া পড়িল।

১৮৩৫ অব্দে "ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া" পত্রের সাপ্তাহিক সংস্করণ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। মার্শম্যান্, ম্যাক্ ও লীচম্যান—এই তিন জন উদার ব্যক্তি ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। এতৎসম্বন্ধে লিখিত আছে: "স্থির হয় যে রাজনীতি অপেক্ষা এই পত্রিকা ধর্মের ভাবে অধিক পরিচালিত হইবে, এবং ইহাকে ভারতের নৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক সর্ববিধ মঙ্গলসাধক বিষয়সমূহের আলোচনার যন্ত্রস্বরূপ করা হইবে। যৎকালে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এইরূপ বিষয়সমূহের আলোচনাগুলিকে অতীব উদারভাবে উৎসাহ প্রদান করিতেছিলেন, সেই অনুকূল সময়ে ইহার জন্ম হয়। ইহার প্রথম কয়েক সংখ্যা তাঁহার শাসনকাল সমাপ্ত হইবার পূর্বেই প্রকাশিত হওয়ায় তিনি যেভাবে ইহা পরিচালিত হইতেছিল, তদ্বিষয়ে আপনার সন্তোষ জ্ঞাপন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। যাহা নিরবচ্ছিন্ন ধর্মবিষয়ক নহে, অথচ সকল বিষয়েই আলোচনা ধর্মের ভাবে করিতে প্রস্তুত, এরূপ একখানি কাগজের আবির্ভাবে সর্বশ্রেণীর মিশনারীরা আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন এবং সর্বান্তঃকরণে ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি দেখা গেল, প্রথম বৎসরের অন্তে ইহার গ্রাহকসংখ্যা দুইশতের অধিক নহে।"

১৮৭৪ অব্দে (কেহ কেহ বলেন ১৮৭৫ অব্দে) রবার্ট নাইট্ সাহেব ৩০,০০০ হাজার টাকা মাত্র মূল্যে এই কাগজের লাভালাভের স্বত্ব ক্রয় করেন। "ইণ্ডিয়ান স্টেটসম্যান" এই নামে ইহার দৈনিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

কয়েকমাস পরে "ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া" ইহার সহিত মিলিত হয়। ইহার বর্তমান সাপ্তাহিক সংস্করণ "ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া এণ্ড স্টেট্‌সম্যান" নামে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুবিখ্যাত সংবাদপত্র সম্পাদক রবার্ট নাইটের জীবনচরিতের আলোচনা যেমন কৌতুকাবহ, তেমনই শিক্ষাপ্রদ। তিনি এতদ্দেশীয়দিগের পক্ষাবলম্বী বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের একজন কর্মচারী ছিলেন, এবং বোধ হয়, পরে ভারতগভর্ণমেণ্টের আসিস্টাণ্ট সেক্রেটারী হইয়াছিলেন,* পরন্তু সবিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন লেখক বলিয়াই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। স্টেটসম্যানের সহিত সংস্রবে আসিবার পূর্বে তিনি "ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট" নামক কলিকাতায় আর একখানি পত্র সম্পাদন করেন। ঐ সময়ে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট তাঁহার নামে একটি মানহানির মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। উহা আপসে মিটিয়া যায়, এবং নাইট সাহেব নগদ ২০,০০০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট পত্রের লাভালাভের স্বত্ব গভর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রয় করেন। তাঁহার সমসাময়িক ইংরেজ লেখকগণের মধ্যে সংবাদপত্র সম্পাদন পটুতায় তাঁহা অপেক্ষা কেহ শ্রেষ্ঠ ছিলেন কি না সন্দেহ। অর্থনীতি-ঘটিত বিষয়সমূহের আলোচনায় তিনি সবিশেষ দক্ষ ছিলেন। তিনি যাহা কিছু লিখিতেন, তাহাতেই তাঁহার স্বাধীনচিত্ততা, উদার সহানুভূতি ও লিপিকৌশলের সৌন্দর্য প্রকাশ পাইত এবং তজ্জন্য তাঁহার কাগজখানি দেশমধ্যে বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী ও দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া পড়ে। তিনি প্রকৃতই ভারতের হিতৈষী মিত্র ছিলেন। ভারতবাসীরা তৎকৃত উপকারসমূহ কখনই বিস্মৃত হইতে পারিবে না। আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে এই সংবাদপত্র-খানিকে নানারূপ ভাগ্যবিপর্যয় অতিক্রম করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তিনি

---

* রবার্ট নাইটের বোম্বাই জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ—তিনি বোম্বাই টাইমস পত্রের একজন সাময়িক লেখক ছিলেন। ডাক্তার বুইস্ট অবসর গ্রহণ করিলে তিনিই উহার সম্পাদক হন। ১৮৫৮ হইতে ১৮৬৪ অব্দ পর্যন্ত প্রায় ৭ বৎসরকাল তিনি ঐ কার্যে নিযুক্ত থাকেন এবং প্রভূত পরিশ্রম করিয়া কাগজ-খানিকে লোকপ্রিয় করিয়া তোলেন। দেশীয় স্বত্বাধিকারীর এবং অপরাপর যাঁহাদের উহাতে অংশ ছিল, সকলেই ১৮৬০ অব্দে উহার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া সম্পাদকের নিকট উহা বিক্রয় করেন। তাঁহার সম্পাদকত্বকালে বোম্বাই টাইমস স্বীয় নামের পরিবর্তন করিয়া "টাইমস অফ্ ইণ্ডিয়া" এই নাম ধারণ করে। তাঁহার সম্পাদকত্বের শেষভাগে আমেরিকার যুদ্ধের জন্য তুলার বাজারে দুর্ভিক্ষ ঘটায় বোম্বাই-এর অসম্ভব অত্যদ্ভুত সমৃদ্ধি ঘটে। কোটি কোটি টাকা নগরে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। এই সমৃদ্ধিপ্রবাহের সর্বোচ্চ তরঙ্গের সময় নাইট সাহেব অবসর গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার ভারতীয় বন্ধুগণ তৎকৃত মহোপকার সমূহ স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাকে এককালীন ৭৫,০০০ হাজার টাকা প্রদান করেন।

মৃত্যুকালে ইহাকে বিলক্ষণ লাভজনক কারবার করিয়া আপনার উত্তরাধিকারী দিগকে দিয়া গিয়াছেন। অধুনা ইহা ভারতের মধ্যে একখানি সমধিক প্রচার ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সংবাদপত্র।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ—জেম্‌স্ উইলসন সাহেবের সম্পাদকত্বকালে ইহা বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। ১৮৬৪ অব্দের ১৮ই আগস্ট ডেলি নিউস পুরাতন "বেঙ্গল হরকরা" পত্রের সহিত মিলিত হয়। এই পত্রখানি ১৭৯৫ অব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। কাপ্তেন ফেন্‌উইক যৎকালে ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস্ পত্রের প্রধান সম্পাদক ছিলেন, তৎকালে জেমস্ উইলসন সময়ে সময়ে সহকারী-সম্পাদকরূপে কার্য করিতেন। উইলসনের সহিত পার্কার নামক একজন সাহেবও ইহার স্বত্বাধিকারী হন। কিন্তু পরে উইলসনই ইহার একমাত্র স্বত্বাধিকারী হন। প্রথমে ইহার নিজের মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। তৎকালে ইহা বেঙ্গল প্রিন্টিং কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত হইত। কিন্তু ক্রমে কাগজের উন্নতি হইলে, ইহার নিজেরই একটি মুদ্রাযন্ত্র হয়। জেমস উইলসন যৎকালে এদেশ পরিত্যাগ করেন, সেই সময়ে তিনি একটি লিমিটেড কোম্পানির নিকট কারবারটি বিক্রয় করিয়া যান। ইহার বর্তমান সম্পাদকের নাম জে. সি. উইলসন এবং ইহার অন্যান্য কার্যপরিচালনভার অধুনা একটি লিমিটেড কোম্পানির হস্তে ন্যস্ত।

শিক্ষিত ভারতবাসীরাও অনেকগুলি প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ইংরেজী সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টগুলি ইউরোপীয়দিগের পরিচালিত পত্র অপেক্ষা কোন ক্রমেই নিকৃষ্ট নহে। শ্রীনাথ ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে প্রভৃতি বাঙ্গালীরা সংবাদপত্রে লিখিতেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সংবাদপত্র-সম্পাদক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কাশীপ্রদাদ ঘোষ "হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার" নামক পত্রের সম্পাদক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। উহা ১৮৪০ অব্দে বা তৎসমকালে প্রচারিত হয়। কথিত আছে যে, দেশীয়দিগের পরিচালিত ইংরেজী সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে উহাই বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। কাশীপ্রসাদ গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকার রচনাতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি কাপ্তেন ডি. এল রিচার্ডসনের একজন প্রসিদ্ধ ও প্রিয় ছাত্র ছিলেন। রামবাগানের দত্তবংশীয় ঈশানচন্দ্র দত্ত "হিন্দু পাইওনিয়ার" পত্রের সম্পাদক ছিলেন। পরন্তু সে সময়ের দেশীয়পরিচালিত ইংরেজী সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে উক্ত হিন্দু পাইওনিয়র প্রধান।

হিন্দু পেট্রিয়ট—পত্রই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হইয়াছিল। ইহার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে রামগোপাল সান্ন্যাল কৃত কৃষ্ণদাস পালের জীবন চরিতে লিখিত আছে যে, শ্রীনাথ ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ ইহার

প্রথম সম্পাদক ছিলেন। বড়বাজারনিবাসী মধুসূদন রায় নামক এক ব্যক্তি এইরূপ একখানি পত্র প্রকাশের কল্পনা করেন। কালাকায় স্ট্রীটে তাঁহার একটি মুদ্রাযন্ত্র ছিল। সেই যন্ত্রেই হিন্দু পেট্রিয়েটের প্রথম সংখ্যা ১৮৫৩ অব্দে মুদ্রিত হয়। স্কাইন্ সাহেব "রেইস এণ্ড রাইয়ত" পত্রের সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনবৃত্তান্তে হিন্দু পেট্রিয়টের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন : যে সকল সাময়িক পত্র একটি জাতির সাহিত্যিক ভাবের উন্মেষণ ঘোষণা করে, তন্মধ্যে একখানির নাম 'বেঙ্গল রেকর্ডার', এবং তাহারই চিতাভস্ম হইতে হিন্দু পেট্রিয়টের জন্ম হয়। ইহার স্বত্বাধিকারী এটিকে লোকসানের কারবার দেখিয়া ১৮৫৪ অব্দে অতি নামমাত্র মূল্যে মুদ্রাযন্ত্র ও কাগজের স্বত্ব বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হন। তৎকালে হরিশ্চন্দ্র ইহার একজন প্রধান লেখক ছিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবার সুযোগ উপস্থিত, সুতরাং তিনি ইহার ক্রেতা হইলেন। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপার অতি গোপনে সমাহিত হইল, কারণ তাঁহার প্রভু মিলিটারি অডিটার জেনারেল আপনার অধস্তন কর্মচারীকে সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হইতে দিবেন—এরূপ সম্ভাবনা অতি অল্পই ছিল। সুতরাং কার্যটা বেনামিতে হইল, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে সম্পাদক খাড়া করা হইল। কিন্তু কাগজ সম্পাদন ও পরিচালনের সমস্ত ভার হরিশের উপর পড়িল। ইহার জন্য তাঁহাকে অনেকদিন কঠোর ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল; এমন কি, এক সময়ে এই দরিদ্র কেরাণীকে ইহার ব্যয়-সঙ্কুলনার্থ আপনার সামান্য বেতন হইতে মাসিক প্রায় ১০০ টাকা করিয়া ব্যয় করিতে হইত। তিনি বীরোচিত সাহসের সহিত অটল ভাবে এই ক্লেশ সহ্য করেন, এবং অবশেষে তাঁহার কাগজের উন্নতির সহিত আয়েরও সচ্ছলতা ঘটে। পরন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুতে তাহার পরিজনবর্গকে একটি সুন্দর সাহিত্যিক সম্পত্তির লাভভোগে বঞ্চিত হইতে হয়। অতঃপর মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ কাগজখানি ক্রয় করিয়া লন এবং অতি সামান্য অর্থ দিয়া বেনামদারের দাবি মিটাইয়া দেন।" রামগোপাল সান্যাল লিখিয়াছেন, মহানুভব কালীপ্রসন্ন সিংহ ৫০০০ হাজার টাকায় কাগজের স্বত্ব ক্রয় করিয়া পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হস্তে উহার পরিচালনের ভার অর্পণ করেন। এই সময়ে কৃষ্ণদাস পাল, কৈলাসচন্দ্র বসু এবং নবীনকৃষ্ণ বসু ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলে উক্ত প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত তাঁহাদের হস্তে ইহার পরিচালনভার প্রদান করেন। অবশেষে কৃষ্ণদাস পালই ইহার একমাত্র সম্পাদক হন। ১৭৬২ অব্দে হিন্দু সমাজের কতিপয় প্রধান ব্যক্তির অনুরোধে, কালীপ্রসন্ন সিংহ এই কাগজের পরিচালনভার মহারাজ রমানাথ ঠাকুর, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহারাজা বাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এই কয়েকজন ট্রাস্টির হাতে অর্পণ করেন। এই ট্রাস্ট সংক্রান্ত দলিল ১৮৬২ অব্দে লিখিত ও পঠিত হয়। এই সময়ে পেটরিয়টের অতি

সামান্য আয় ছিল। তৎকালে ইহার গ্রাহক-সংখ্যা আড়াই শতের অধিক ছিল না। ১৮৬৩ অব্দে ইহার সাফল্যলাভবিষয়ে সন্দেহ অনেক পরিমাণে অপনীত হইল। এতদিন পেট্রিয়ট প্রতি বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে বাহির হইত, কিন্তু এখন হইতে সোমবারে প্রকাশিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণদাসের সময়ে ইহা সাপ্তাহিক ছিল, কিন্তু এক্ষণে দৈনিক হইয়াছে। কৃষ্ণদাস পালের রচনার রীতিপদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে এন. এন. ঘোষ মহোদয় লিখিয়াছেন যে, হিন্দু পেট্রিয়টে তাঁহার লেখায় সুমার্জিত বুদ্ধি, মতের উদারতা এবং তর্কশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইত, কিন্তু তাহাতে উচ্চ অঙ্গের লিপিকুশলতা অতি কদাচিৎ প্রকাশ পাইত।" কৃষ্ণদাস পাল বেশ সামাজিক লোক ছিলেন এবং তাঁহার একটি অসাধারণ গুণ ছিল, তিনি শাসনকর্তাদিগের ও তাঁহার স্বদেশীয়দিগের উভয় শ্রেণীরই শ্রদ্ধা-বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারিতেন। তিনি দেশীয় সমাজের অনেকেরই প্রতিনিধি-স্বরূপ ছিলেন। তিনি পেট্রিয়টে আপনার স্বাভাবিক মাধুর্য ও ধীরতা অনু-প্রবিষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার মন প্রকৃত কার্যপ্রবণ ছিল। তাঁহার মনের ছায়া তাঁহার লেখায় সুপরিস্ফুট হইত। তিনি স্বাধীনভাবে সকল বিষয়ের সমালোচনা করিতেন। তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া কোন কথা বলিলে, সে গুপ্তকথা তিনি কখনই ব্যক্ত করিতেন না, এবং কখনও কাহাকেও ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করিয়া কটূক্তি বর্ষণ করেন নাই। তাঁহার এই এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, তিনি অতি সহজে প্রকৃত ব্যাপার আয়ত্ত করিয়া ফেলিতে পারিতেন, কিন্তু নিজ মনোভাব কর্তৃক পরিচালিত হইয়া তিনি কখনও বাগাড়ম্বর প্রকাশ করিতেন না।

ইণ্ডিয়ান মিরর—সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার ৺মনোমোহন ঘোষের দেশ-হিতৈষিতায় ও ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থসাহায্যে ১৮৬১ অব্দে পাক্ষিকপত্ররূপে ইহার আবির্ভাব হয়। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেনও ইহাতে লিখিতেন। কিছুদিন পরে মনোমোহন ঘোষ ব্যারিস্টার হইবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে গমন করিলে ইহার পরিচালনভার নরেন্দ্রনাথের হস্তে পতিত হয়। তাঁহার সুদক্ষ সম্পাদনে ইহা সাপ্তাহিক আকার ধারণ করে। অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ও ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন ইহাকে দৈনিক করিবার কল্পনা করেন। অবশেষে অন্যতম বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে সম্পাদক ও বর্তমান সম্পাদকের পিতৃব্যপুত্র কৃষ্ণবিহারী সেনকে সহ-সম্পাদক করিয়া কেশবচন্দ্র সেনকে সহসম্পাদক করিয়া, কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭৮ অব্দে আপনার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করেন। কয়েক বৎসর যাবৎ সমগ্র ভারতবর্ষে ইহাই একমাত্র দেশীয় পরিচালিত ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র ছিল। ১৮৭৯ অব্দে নরেন্দ্রনাথ সেন ইহার একমাত্র স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক হন তৎপূর্বে ইহা কয়েকজনের মিলিত সম্পত্তি ছিল। কয়েক বৎসর ইহার একটি বিশেষ রবিবারে সংস্করণ বাহির হইয়াছিল; তাহাতে কেবল ধর্মবিষয়ের আলোচনা হইত। রবিবারের কাগজখানি কৃষ্ণবিহারী সেন সম্পাদন করিতেন।

অমৃতবাজার-পত্রিকা—ইহার জন্মস্থান যশোহর জেলা। প্রায় ৩৫।৩৬ বৎসর হইল, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ ও তদীয় ভ্রাতৃগণের যত্নে ইহার জন্ম হয়। তাঁহাদের জননীর পবিত্র স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁহারই নামের অনুকরণে ইহার নামকরণ হয়। ইহা প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইত; তৎপরে বাঙ্গালা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই লিখিত হইত। শিশিরকুমার ঘোষ কৃত "ইণ্ডিয়ান স্কেচেস্" নামক পুস্তকের ভূমিকায় লিখিত আছে যে, "লর্ড লিটনের মুদ্রাযন্ত্রের মুখরোধক আইনের যখন প্রথম সূচনা হইল ও স্পষ্ট বুঝা গেল যে, দেশীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রসমূহ অল্লাধিক পরিমাণে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবে, সেই সময়ে ঘোষভ্রাতারা স্থির করিলেন যে, অতঃপর তাঁহাদের অমৃতবাজার পত্রিকা একমাত্র ইংরেজী ভাষায় লিখিত ও প্রচারিত হইবে।" নানাপ্রকার ভাগ্য-বিপর্যয়ের পর ইহা এক্ষণে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী সংবাদপত্র হইয়া উঠিয়াছে। জীবনসংগ্রামের সেই প্রথম অবস্থায় ইহার স্বত্বাধিকারীরা মাননীয় রাজা দিগম্বর মিত্র বাহাদুর, মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাত্মাদিগের নিকট যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৮৯ বা ১৮৯০ অব্দে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পরামর্শে কাগজখানিকে দৈনিকরূপে প্রকাশ করার কথা স্থির হয় এবং তাহা কার্যেও পরিণত হয়। তৎকালে রাজা বাহাদুর নিজ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নানাপ্রকারে যে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা বিলক্ষণ সময়োপযোগী হইয়াছিল।

বেঙ্গলি—অধুনা ইহা দৈনিকরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহার বর্তমান সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশীয়-পরিচালিত ইংরেজী সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে ইহা সবিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ও প্রভাবশালী। কলিকাতা সিমলার ঘোষবংশীয় প্রসিদ্ধ সুলেখক ও সুপণ্ডিত ৺ গিরিশচন্দ্র ঘোষের সম্পাদকত্বে ইহার জন্ম। ১৮৬১ অব্দে বেঙ্গলির প্রথম সংখ্যা মুদ্রিত হয়। তৎকালে ইহা সাপ্তাহিক ছিল এবং প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইত। গিরিশ চন্দ্র ঘোষ তৎকালে গভর্ণমেণ্টের অধীনে মিলিটারি পে একজামিনারের অফিসে চাকরি করিতেন। ১৮৬৯ অব্দ পর্যন্ত তিনিই বেঙ্গলীর সম্পাদক ছিলেন। উক্ত অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার সহযোগী ৺ বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ইহার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন, এবং ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ সুপণ্ডিতগণ ইহাতে যোগদান করেন। ১৮৮৮ অব্দে বা তৎসমকালে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেঙ্গলির স্বত্ব ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত জিনিসপত্র ক্রয় করিয়া লন। এই ব্যাপার লইয়া কিছু গোলযোগ উপস্থিত হয়, কিন্তু রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺ মহারাজকুমার নীলকৃষ্ণ বাহাদুরের মধ্যস্থতায় তাহার সুন্দর মীমাংসা হইয়া যায়। ১৯০০ অব্দে বা তৎসমকালে কবিরাজ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন ও রাজা বাহাদুরের ঐকান্তিক আগ্রহে ও সহকারিতায় বেঙ্গলি দৈনিকরূপে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়।

ইণ্ডিয়ান নেশন—দেশীয় পরিচালিত ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাদের প্রত্যেকটির কথা সংক্ষেপে বলিলেও তাহা নিতান্ত বিরক্তির কারণ হইয়া উঠিবে। এজন্য এস্থলে কেবল "ইণ্ডিয়ান নেশন" পত্রের উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব। লর্ড রিপণের শাসনকালে যখন ইলবার্ট বিল লইয়া তুমুল আন্দোলন ও বাগবিতণ্ডা চলিতেছিল, সেই ঘোর দুর্দিনে ১৮৮২ অব্দে ইহার জন্ম হয়। অগাধ পণ্ডিত ও চিন্তাশীল সুলেখক এবং মেট্রপলিটান ইনস্টিটিউশন নামক কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ব্যারিস্টারপ্রবর শ্রীযুক্ত এন্. এন্. ঘোষ ইহার সম্পাদক।

আমরা এক্ষণে দেশীয় ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। শ্রীযুক্ত এন. এন. ঘোষ মহোদয় স্বরচিত মহারাজ নবকৃষ্ণের জীবন চরিতের এক স্থলে বলিয়াছেন, "ইংল্যাণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের সংযোগ ভগবানের বিধানক্রমেই হইয়াছে।" এই উক্তি যে অত্যন্ত সারবান্, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা সংবাদপত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রাকালে আমরা এই উক্তির প্রতিধ্বনি না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। দেশীয় ভাষাসমূহের পুষ্টি-সাধনের নিমিত্ত ইংরেজ রাজপুরুষ ও মিশনারিগণ যে কতদূর যত্ন চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার অভিপ্রায়ে ইংরেজ মিশনারিরা প্রথমে নিজেরাই প্রভূত শ্রম স্বীকার করিয়া দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, এবং তৎপরে উন্নতিসাধনের দিকে মনোনিবেশ করেন। "জাতীয় শিক্ষা" কথাটির অর্থ "জনসাধারণকে তাহাদের মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান।" ডাক্তার ক্যারি, মার্শম্যান, ওয়ার্ড ও ডফ্ প্রমুখ মিশনারিগণ, লর্ড হেস্টিংস, ওয়েলেস্লি, হার্ডিঞ্জ, স্যর চার্লস ট্রেভলিয়ান ও হ্যালিডে প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ, এবং ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি বেসরকারী ইংরেজ মহাপুরুষগণ সদাশয় প্রণোদিত হইয়া দেশীয় ভাষার পরিপুষ্টি ও উৎকর্ষ সাধনকল্পে বিস্তর সহায়তা করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার ভবিষ্যৎ যে বিলক্ষণ আশাপূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রায় ৫০ বৎসর গত হইল, জনৈক লেখক কোন সাময়িক পত্রে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—"ড্যান্টির পূর্বে ইটালীয় ভাষা যেরূপ অপরিপক্ক ছিল, পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্বে বাঙ্গালা ভাষাও তদ্রূপ অপক্ক ছিল। ড্যান্টি আবির্ভূত হইলেন এবং সেই একজন লোক একখানি মাত্র গ্রন্থ 'ডিভাইন কমেডি' রচনা দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন যে, তাঁহার দেশীয় ভাষা অতি উচ্চ ও জটিল ভাব প্রকাশে সমর্থ। বঙ্গদেশেও কি আমরা সেইরূপ আশা করিতে পারি না? বাঙ্গালা ভাষার দ্রুত ও অশ্রুতপূর্ব উন্নতির কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, পূর্বোক্ত লেখকের ভবিষ্যদ্বাণী অনেকটা সফল হইয়াছে।

রাজা রামমোহন রায় কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের স্থাপয়িতা। এই ব্রাহ্ম-সমাজের আন্দোলনে কেবল যে বাঙ্গালা সংবাদপত্রেরই পুষ্টি ও উন্নতি হইয়াছে,

তাহা নহে, প্রত্যুত তাহা হইতে বাঙ্গালা ভাষা এবং সাহিত্যও বিলক্ষণ সহায়তা লাভ করিয়াছে। প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম সাহিত্যসেবীদিগের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, চিরঞ্জীব শর্মা, গৌরগোবিন্দ রায়, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তদানীন্তন কালের ব্রাহ্মদিগের লেখনী দেশের প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইত, কারণ তাঁহারা মনে করিতেন, এই ধর্ম কুসংস্কারময় এবং ইহা কোনরূপ প্রব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। আদিম বৈদান্তিক নীতির পুনঃ স্থাপনের ফলে একটি নতন ধর্মমত সৃষ্ট হইল। বলা বাহুল্য, এই নব ধর্মমতের অনেক ভাবই ইউরোপীয় ধর্মশাস্ত্র হইতে ও নানাপ্রকার ইউরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্র হইতে গৃহীত হইয়াছিল। বিবেকই মনুষ্যের কাযের নিয়ন্তা, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি কল্পিত নীতি, দেশের সর্বনাশসাধক প্রকৃত ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযান, পুরোহিত শ্রেণীর (ব্রাহ্মণজাতির) ধ্বংসসাধন, জাতিভেদ-প্রণালীর সম্পূর্ণ বিলোপ, হিন্দু রমণীগণকে তাঁহাদের তথাকথিত দুর্দশা ও হীনাবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া পুরুষদিগের ন্যায় একই প্রকার অধিকার প্রদানপূর্বক পুরুষদিগের সহিত একাশনে সংস্থাপন প্রভৃতি বিষয় প্রকাশ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। এই সকল ভদ্রলোক দেবপ্রতিমার বিনাশ বিষয়ে যেরূপ আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও নিতান্ত বিস্ময়াবহ। ইঁহারা সমাজ, পৈতৃকধর্ম ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া দূরে অপসৃত হইয়াছেন, এবং ইঁহাদের মতে যাহা যাহা গুরুতর অনিষ্টের কারণ, সমাজের ক্ষতিকর ও উন্নতির প্রতিরোধক, সেগুলির মূলোচ্ছেদ করিবার অভিপ্রায়ে আপনাদের সাংসারিক উন্নতির সর্বপ্রকার চেষ্টায় জলাঞ্জলি দিয়াছেন। কোন কোন ইংরেজ ও ফরাসী লেখকের সর্বনাশকর রীতি-প্রণালী এ দেশের সর্বপ্রকার অনিষ্টের একমাত্র প্রতীকার বলিয়া ইহারা যেরূপ সমাদার ও সাহসের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে আর কখনও তাহা ঘটে নাই। এক শ্রেণীর ইউরোপীয় দার্শনিক লেখকগণের মনোমুগ্ধকরী ও ওজস্বিনী ভাষা ইহাদিগকে এতদূর অভিভূত ও জ্ঞানশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইঁহারা হিন্দুজাতির বিশেষ ভাব ও প্রকৃতি এবং পূর্ব গৌরবাদির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া সমাজের গঠন ও সামাজিক অন্যান্য বিষয় জ্যামিতির অনুশীলনীর প্রতিজ্ঞার ন্যায় বিচার করিয়া থাকেন। ফরাসী দার্শনিক মালব্রন্‌শের ন্যায় ইহারা কল্পনার প্রয়োগ করিয়া কল্পনার নিন্দা করেন। এইরূপে গোঁড়ামির সহায়তায় ইহারা সমাজের প্রাচীন নিয়মাবলী ও গঠন ভয়ানকভাবে বিপর্যস্ত করিয়া তোলেন।

রাজা রামমোহন রায়কেই বর্তমান বাঙ্গালা গদ্যের জনক বলা যাইতে পারে। তাঁহার গদ্য রচনা বেশ সরল ছিল। হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের জটিল বিষয়গুলি বাঙ্গালা সরল গদ্যে প্রকাশ করিয়া তিনি যেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্বে আর কেহই তেমন পারেন নাই। রামমোহন রায় ১৮২১ অব্দে "ব্রাহ্মণ পত্রিকা" নামে একখানি কাগজ বাহির করিতে আরম্ভ করেন। কাগজ-

খানি অতি অল্পকাল জীবিত ছিল। কথিত আছে যে, উহার লেখা অতি তেজস্বী ছিল। উহার আক্রমণ প্রধানতঃ মিশনারিদিগের বিরুদ্ধেই চালিত হইত। সমাচার-চন্দ্রিকার প্রভাব খর্ব করিবার নিমিত্ত 'সংবাদ-কৌমুদী' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। রামমোহন রায় এবং পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ তাহার সম্পাদক ছিলেন। 'বঙ্গদূত' নামে আরও একখানি কাগজ ছিল। আর. মার্টিন, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়া রামমোহন রায় উহা চালাইতেন। রামমোহন সংস্কৃত, পারসী ও আরবী ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন রঙ্গপুরে কালেক্টরের অফিসে চাকরি করিবার সময় তিনি এরূপ অধ্যবসায় ও যত্নের সহিত ইংরেজী শিখিতে প্রবৃত্ত হন যে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি মনোবিজ্ঞান ও ঈশ্বরতত্ত্ববিষয়ক দুরূহ গ্রন্থসকল বুঝিতে সমর্থ হন। তিনি ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন তিনি ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড দর্শনে গমন করিয়াছিলেন এবং বহু বড় লোক ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। তিনি নানাদিকে যেরূপ ক্রিয়াশীলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বজাতির মধ্যে সভ্যতা ও জ্ঞানবিস্তারের নিমিত্ত যেরূপ উদারভাবে যত্ন-চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি সংস্কারক, রাজনীতিবেত্তা ও ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তক বলিয়া বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি হুগলি জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইংল্যাণ্ডের অন্তঃপাতী ব্রিস্টল নগরে ১৮৩৩ অব্দে কালগ্রাসে পতিত হন।

তিনি ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত, ৺ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু, সহচর ও সহযোগী ছিলেন

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদকত্বে ইহা প্রথমে পাক্ষিক ও পরে মাসিক রূপে প্রকাশিত হয়। তাঁহার সম্পাদকত্বকালে ইহার লেখা এরূপ চিত্তাকর্ষক ছিল যে, লোকে অতি আগ্রহের সহিত ইহার প্রচারের প্রতীক্ষা করিত। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন;—"ইউরোপীয় বিজ্ঞানের আবিষ্কার-সমূহ, নৈতিক উপদেশাবলী, বিভিন্ন জাতি ও শাখা জাতির এবং চেতন ও অচেতন জগতের বিবরণ, এবং যাহাতে বুদ্ধিমান বাঙ্গালীর মনে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিতে ও মন হইতে অজ্ঞানান্ধকার ও কুসংস্কার দূরীভূত হইতে পারে, তৎসমস্তই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় স্থান পাইত।" এই পত্রিকা অদ্যাপি জীবিত আছে; ৺ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার বর্তমান সম্পাদক। সাহিত্যক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার দত্ত অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি বাঙ্গালায় অনেক নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহার প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। তিনি সাতিশয় কোমলস্বভাব, দয়ালু, অমায়িক, অধ্যয়নরত ও শান্তিপ্রিয় ছিলেন। তিনি নীরবে দেশের উন্নতির কার্য করিয়া যাইতেন। তিনি ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কালগ্রাসে পতিত হন। বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, সেগুলি

কেবল কলিকাতার কেন, বঙ্গদেশের সর্বত্রই অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগের পাঠ্যপুস্তকরূপে মহাসমাদরে গৃহীত হইয়াছে।

কি ইংরেজী, কি বাঙ্গালা, উভয় প্রকার সংবাদপত্র পরিচালন ক্ষেত্রেই ৺ কেশবচন্দ্র সেন যেরূপ শ্রম স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতীব মহনীয় 'ইণ্ডিয়ান্ মিরর' পত্রের সম্পাদনে তিনি কিরূপ সহকারিতা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। রবিবারের মিরর তাঁহারই যত্নে প্রকাশিত হয়। ঐ কাগজে প্রথম প্রথম কেবল ধর্মতত্ত্ব ও মানবের কর্তব্য তত্ত্বই আলোচিত হইত তিনি বাঙ্গালায় "সুলভ সমাচার" নামে এক পয়সা মূল্যের একখানি কাগজ বাহির করেন; সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, তিনিই বঙ্গদেশে সুলভ সংবাদ পত্রের প্রকৃত জন্মদাতা। উহা "নববিধান" হইতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বাঙ্গাল সাহিত্যও গ্রহণ করে। বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতিকল্পে উহার যত্ন চেষ্টা সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য, সন্দেহ নাই। সংসারে কি হইতেছে, না হইতেছে এ তত্ত্বের সংবাদ যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সাধনকল্পে আড়ম্বরবিহীন ব্রাহ্মেরা অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছেন। বোধ হয়, কেশবচন্দ্র সেন হইতেই বাঙ্গালা বক্তৃতায় প্রচারের সৃষ্টি। সময়ে সময়ে দেখা যাইত যে, বীডন স্কোয়ার নামক উদ্যানের এক পার্শে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকেরা বাইবেল প্রচার করিতেছেন এবং তাহারই অদূরে কেশবচন্দ্র নানাজাতীয় জনমণ্ডলীর মধ্যস্থলে আপনার একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেছেন বাঙ্গালায় চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করিবার পথ তিনিই প্রদর্শন করেন। অক্লান্ত শ্রম-শীল কেশবচন্দ্রের নিকট স্ত্রী-শিক্ষাও যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করিয়াছিল। নগরের যে অংশে দেশীয়দিগের বাস, সেই অংশে (অর্থাৎ উত্তরাংশে) 'য়্যালবার্ট হল্ নামে সাধারণ-মন্দির আছে, প্রধানতঃ কেশবচন্দ্রের যত্নেই তাহা নির্মিত হয় লোকে তথায় সভা করিয়া রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মবিষয়ক ও অন্যান্য প্রসঙ্গের অবাধে আলোচনা করিতে পারে। দেশীয় থিয়েটার এবং ব্যায়াম ও অন্যান্য ক্রীড়াকৌতুকের তিনি একজন বিশিষ্ট পৃষ্টপোষক ও সংস্কারসাধক ছিলেন 'ইণ্ডিয়া ক্লাব' তাঁহারই দ্বারা স্থাপিত হয়। তাঁহার সুবিখ্যাত জামাতা কুচবিহার-ধিপতিই উহার বর্তমান 'পেট্রন'। ১৮৮২ অব্দে উহা প্রথম স্থাপিত হয় ইংরেজ ও ভারতবাসীদিগের মধ্যে সামাজিক ভাবের পরিবর্ধনই উহার প্রধান উদ্দেশ্য। কেশবচন্দ্রের ক্রিয়াশীলতা বহুমুখীন। তিনি কলুটোলার সেনবংশের প্যারীচরণ সেনের মধ্যমপুত্র। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর তাঁহার জন্ম হয় প্রথম বয়সে তিনি নাটকাভিনয়াদি থিয়েটারের আমোদ-প্রমোদের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি এইরূপ আমোদে অন্যূন ১০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া ফেলেন। তিনি হিন্দু মেট্রপলিটান কলেজে শিক্ষালাভ করেন কথিত আছে যে, পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হইবার পূর্বে তিনি আপনাকে জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপনের উপযোগী করিবার অভিপ্রায়ে যেন

ভগবৎ-প্রণোদিত হইয়া কয়েক বৎসর অতি আগ্রহের সহিত বাইবেল এবং ইংরেজী ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কীয় বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রথমে কিছুদিন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত আদি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন; কিন্তু কেশবের স্বাধীনতাপ্রিয় ক্ষমতাশালী হৃদয়কে বশীভূত করা দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠে। কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন এবং অল্পকাল মধ্যে নিজ মহৎ চরিত্র ও গুণের অনুরূপ পদ লাভ করিলেন। আমরা তাঁহার জীবনের কার্যাবলীর সূক্ষ্ম বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না। তাঁহার শিষ্য ও সহযোগী সুযোগ্য শ্রীযুক্ত প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার যে জীবনচরিত প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার জীবনের অনেক কথাই জানিতে পারা যায়। ভারত-রাজরাজেশ্বরী স্বর্গীয়া ভিক্টোরিয়া ভারতবাসীদিগের মধ্যে একমাত্র কেশবচন্দ্রের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া আনন্দলাভ কয়িয়াছিলেন। কেশব ও তাহার পরিজনবর্গ এবং ইংল্যাণ্ডের রাজপরিবারবর্গের মধ্যে সর্বদাই চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলিত। রামমোহন রায় এই নবধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বটে, কিন্তু কেশবই ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক। তাঁহারই যত্ন ও চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজ এতাদৃশ শ্রদ্ধেয় হইয়াছে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র কালগ্রাসে পতিত হন।

মিশনারিরা যে এ-দেশের অনেক উপকার করিয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীরামপুরের মিশনারিরাই বাঙ্গালা সংবাদপত্রের উন্নতির পথপ্রদর্শক। প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র “সমাচার দর্পণ” তাঁহাদেরই দ্বারা ১৮১৮ অব্দে প্রকাশিত হয়। কেবল তাহাই নহে, বাঙ্গালা ভাষায় ছাপিবার অক্ষর এবং মুদ্রাযন্ত্রও তাঁহারাই প্রথমে প্রবর্তিত করেন। ৺রেভারেণ্ড লালবিহারী দে লিখিয়াছেন: “ওয়ার্ড সাহেব কর্তৃক ইংল্যাণ্ড হইতে আনীত মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইল। পঞ্চানন নামক একজন বাঙ্গালী কর্মকারের সহায়তায় এক ফাউণ্ট বাঙ্গালা অক্ষর ঢালা হইল। এই পঞ্চানন ডাক্তার উইল্‌কিন্স সাহেবের নিকট “পাঞ্চ” কাটিতে শিখিয়াছিল। ১৮০০ অব্দের ১৮ই মার্চ বাঙ্গালার ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় দিন; ঐ দিন ক্যারি সাহেব ‘মথি লিখিত সুসমাচার’ নামক ধর্ম-পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা মুদ্রিত করেন। উহার শেষ পৃষ্ঠা ১৮০১ অব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি মুদ্রিত হয়। সমগ্র ‘নিউ টেস্টামেণ্ট’ ঐখানেই মুদ্রিত হইয়াছিল। অতঃপর খ্রীষ্টধর্মসম্বন্ধীয় পুস্তিকা সকল ঘন ঘন ছাপা হইতে লাগিল। এই মিশনের ব্যয়নির্বাহার্থ মার্শম্যান সাহেব ও তদীয় পত্নীর অধীনে একটি বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করা হইল।” ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট মিশনারিদিগকে কলিকাতায় বাস করিতে না দেওয়ায় মার্শম্যান, ওয়ার্ড, গ্র্যাণ্ট ও ব্রাণ্ডসন শ্রীরামপুরে বাস করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাদের কলিকাতায় বাসের অনুমতি লাভের নিমিত্ত ক্যারি সাহেব প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। দিনে-মারেরা তাঁহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। একটি যথোপযুক্ত গৃহ ক্রয় করিয়া

মিশনারিরা তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন, এবং কিছুদিন পরে ক্যারি সাহেবও আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ডাক্তার ক্যারিই প্রথমে বাঙ্গালা শিক্ষা করেন এবং ঐ ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন। ইহাতে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। 'সমাচার-দর্পণ' আবির্ভূত হইবার কয়েক মাস পূর্বে মার্শম্যান ও তদীয় বন্ধুগণ "দিগদর্শন" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। আবার দর্পণের আবির্ভাবের কয়েকদিন পরে কৃষ্ণমোহন দাসের সম্পাদকত্বে "সংবাদতিমিরনাশক" নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। হিন্দু-ধর্মনীতির পৃষ্ঠ-পোষকতা করা ও হিন্দুদিগের স্বার্থরক্ষা করাই এই সাপ্তাহিক পত্র প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ৺ দ্বারকানাথ ঠাকুর ইহার গ্রাহক শ্রেণী-মধ্যে পরিগণিত ছিলেন।

লর্ড হেস্টিংসের কৃপায় ডাক্তার মার্শম্যান প্রচলিত মাশুলের এক-চতুর্থাংশ মাত্র প্রদান করিয়া ডাকযোগে "দর্পণ" প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক ১৮১৬ অব্দে "বাঙ্গালা গেজেট" সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। বোধ হয়, উহাই প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র। রেলি সাহেবের মতে, ছাপিবার জন্য বাঙ্গালা অক্ষরের ব্যবহার ১৭৭৮ অব্দে প্রবর্তিত হয়, এবং বাঙ্গালা ভাষার প্রথম পুস্তক—একখানি ব্যাকরণ হুগলিতে মুদ্রিত হয় ঐ ব্যাকরণখানি এন. বি. হ্যালহেড নামক একজন প্রসিদ্ধ প্রাচ্য-ভাষাবিৎ পণ্ডিত কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস হ্যালহেডের মুরুব্বি ছিলেন : বঙ্গীয় সেনাদলের অন্যতম লেফ্টেনান্ট চার্লস উইল্‌কিন্স কর্তৃক বাঙ্গালা ছাপিবার অক্ষর প্রথমে প্রস্তুত হয়, এবং তাহার নিকট পঞ্চানন এই বিদ্যা শিক্ষা করেন। এই দেশীয় কর্মকারক প্রত্যেক অক্ষরের মূল্য এক টাকা চারি আনা লইত : খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত দেশীয়দিগের মধ্যে ৺রেভারেণ্ড ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মাতৃভাষার যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছেন। তিনি ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় বহু সংবাদপত্র সম্পাদন ও পরিচালন করিয়াছিলেন। প্রায় ছাত্রাবস্থাতেই তিনি "এন্‌কোয়ার" নামে একখানি কাগজ বাহির করেন ; তদ্ভিন্ন তিনি ডিরোজিও সাহেবের উপদেশে ও পরিচালনে প্রচারিত—'পার্থিনন' পত্রেও প্রবন্ধ লিখিতেন, কিন্তু এ পত্র ডাক্তার উইলসনের আদেশে রহিত হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তিনি "ইভাঞ্জেলিস্ট" নামে আর একখানি পত্রও সম্পাদন করিতেন। তিনি বহু বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে 'সবদর্শনসংগ্রহ' (১৮৬১-৬২ অব্দে প্রকাশিত), এবং তাঁহার স্বকৃত টীকাসংবলিত 'রঘুবংশ', 'কুমার-সম্ভব', 'ভট্টি-কাব্য' ও 'ঋগ্‌বেদ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৪৬ অব্দে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে তিনি 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' প্রকাশ করেন এবং ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেলের নামে তাহা উৎসর্গ করেন। তিনি ইংরেজী সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক, ফরাসী ও বাঙ্গালা ভাষায় সুপণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ

ছিলেন। তাঁহার অহমিকশূন্যতা, সৎস্বভাব বিনয় ও সাধু চরিত্রের জন্য সকলেই তাঁহাকে যথোচিত ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৮৭৬ অব্দে তিনি ডি. এল উপাধি লাভ করেন। তিনি একজন প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী ছিলেন, এবং বহু দেশহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার সংস্রব ছিল। ১৮১৩ অব্দে কলিকাতা নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সে কালের মিশনারিরা যে উদ্দেশ্যেই হিন্দু ও মুসলমানদিগের ভাষা ও সাহিত্য অনুসন্ধান ও শিক্ষা করিয়া থাকুন না কেন, সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহাদের দ্বারা যে স্থায়ী রকমের কাজ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এতৎসম্পর্কে ওয়ারেন্ হেস্টিংস-প্রমুখ গভর্ণরগণও অনেক কাজ করিয়াছেন। হেস্টিংসের বিশিষ্ট অনুগ্রহে ডাক্তার উইল্‌কিন্স ভগবদ্গীতার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন, এবং সার উইলিয়াম জোন্স, কোলব্রুক্, ম্লাডউইন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও পণ্ডিতগণ অনুসন্ধিৎসু ইউরোপীয়দিগের উপকারার্থ প্রাচ্য ভাষার গ্রন্থসমূহের প্রচারে নানাপ্রকারে সহায়তা করিয়াছিলেন। প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইউরোপীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ীদিগের যত্ন চেষ্টায় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের নিমিত্ত বহু জটিল প্রশ্ন মীমাংসিত হইয়াছে। তাহাতে প্রাচীন জগতের বহু অদ্ভুত তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। উহার সাহিত্যিক গুরুত্ব সম্বন্ধে জনৈক লেখক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "এই ঘটনা একমাত্র গ্রীক সাহিত্যের পুনরভ্যুদয় অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্পগুরুত্ববিশিষ্ট, কিন্তু ধর্মবিষয়ক ও দার্শনিক হিসাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, তদপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ...।" উক্ত লেখক আর এক স্থলে বলিয়াছেন, ইহা "ভূতলস্থ অন্ধকারময় গহ্বরে দীপ লইয়া যাইয়া তাহার আলোক সাহায্যে পৃথিবীর নানা প্রকার আঙ্গিক পরিবর্তনের অনুসন্ধান এবং প্রকৃতির ধ্বংসপ্রাপ্ত জগতের ধ্বংসাবশেষ সমূহের আবিষ্কার করিয়াছে...।" তদ্ভিন্ন ইহা "ভাষার গভীরতম প্রদেশসমূহের প্রকাশ করিয়াছে, বিভিন্ন জাতির নানা দেশে উপনিবেশ সংস্থাপনার্থ প্রস্থান ও সাম্রাজ্যের পরিবর্তনসমূহ আবিষ্কার করিয়াছে, এবং মানবজাতির কোন কোন অংশের লুপ্তচিহ্নের পুনরুদ্ধার করিয়াছে।"

হিন্দুরা বিদ্যানুরাগের নিমিত্ত চিরপ্রসিদ্ধ। হিন্দুরা বিদ্যাকে যেরূপ আদর ও মূল্যবান জ্ঞান করেন, বোধ হয় ভূমণ্ডলের আর কোন জাতিই সেরূপ করেন না। ইহাদের বিদ্যানুরাগ কিরূপ মহনীয় এবং এ বিষয়ে ইহারা কিরূপ মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা পশ্চাল্লিখিত আখ্যায়িকা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে :

এক সময়ে মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা আয়ের একটি জমিদারী দান করিতে চাহেন। তৎকালে উক্ত পণ্ডিত মহাশয় এই বলিয়া তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন যে, অর্থলাভ

অনর্থের মূল ও তাহাতে ধর্মপ্রবৃত্তি বিনাশ পায়, এবং তাঁহার বংশধরেরা ধনবান্ হইলে বিদ্যালোচনা পরিত্যাগ করিয়া বিলাসব্যসনে মত্ত হইবে। কি আশ্চর্য বিদ্যানুরাগ! কি মহনীয় নির্লোভত্ব! আর একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। নবদ্বীপাধিপতি রাজা ঈশ্বরচন্দ্র যৎকালে পণ্ডিত রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাঁহার সাংসারিক অবস্থা ও অভাব আকাঙ্ক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তৎকালে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় রাজাকে যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে অতি উচ্চ মহানুভবত্ব ও আত্মগৌরবের ভাব সুপরিব্যক্ত। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ডাইওজেনিজ মহাবীর আলেক্জাণ্ডার দি গ্রেটের প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতেও ঐরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছিল।

এ বিষয়ে রেভারেণ্ড ওয়ার্ড বলেন: "প্রাচীন কালের হিন্দুগণ যে অগাধ জ্ঞান-গৌরবে ভূষিত ছিলেন, এ-কথা কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাঁহারা যে প্রকার বহু বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, প্রায় সকল বিজ্ঞানই তাঁহাদের মধ্যে আলোচিত হইয়াছিল এবং যে ভাবে তাঁহারা এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রতিপন্ন হয় যে, হিন্দু পণ্ডিতগণ বিদ্যাবিষয়ে প্রাচীন অন্য কোন জাতি অপেক্ষাই নিকৃষ্ট ছিলেন না। তাঁহাদের দর্শন ও স্মৃতিগ্রন্থসমূহ যতই অধ্যয়ন করা যায়, ততই পাঠক ঐ সকল গ্রন্থকারের জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হন।"

কলিকাতার মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর পণ্ডিতগণকে অকাতরে অর্থদান এবং তাঁহাদের চতুষ্পাঠি সংস্থাপনে আনুকূল্য করিতেন, তাঁহারই একান্ত যত্নে হাতীবাগান * বাঙ্গালার মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যার অন্যতম কেন্দ্রস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। তিনিই পণ্ডিতদিগের দাবির কথা রাজপুরুষদিগের গোচরে আনয়ন করেন এবং তাঁহাদিগকে উপাধি বৃত্তি ও অন্যান্য পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করাইয়া দেন। পণ্ডিতদিগের অবস্থার উন্নতিসাধনার্থ তাঁহার যত্ন চেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্মার্থ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

"বিদ্যার প্রগাঢ় উৎসাহদাতা বলিয়া চতুষ্পার্শ্বর্তী স্থানের সমস্ত পণ্ডিত তাহার প্রাসাদে সমবেত হইতেন; তদ্ভিন্ন ভারতের দূরবর্তী স্থান হইতে যে সকল পণ্ডিত কার্যবশতঃ কলিকাতায় আসিতেন, তাঁহারাও তথায় আসিয়া আশ্রয় লইতেন। এতদ্দেশ প্রচলিত একটি বহু প্রাচীন ও অতি মহনীয় রীতি অনুসারে ধনবান্ লোকেরা পণ্ডিতদলে পরিবৃত থাকেন, এবং ঐ সকল পণ্ডিত তাহাদিগকে সকল বিষয়ে আপনাদের মতামত জ্ঞাপন করেন এবং তর্কশাস্ত্রে ও মনোবিজ্ঞান

* হাতীবাগান—কলিকাতার উত্তরপূর্বাঞ্চলস্থ একটি পল্লীর নাম। বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের বাসস্থান বলিয়া ইহা প্রসিদ্ধ।

বিষয়ে বিচার করেন। নবকৃষ্ণের সভা যে বহু বিখ্যাত পণ্ডিতে অলঙ্কৃত ছিল, তাহা জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এবং বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের নাম দেখিয়াই বুঝা যায়। তাঁহার সভায় বহুবিষয়ের বিচার হইত এবং বিচারক পণ্ডিতগণকে যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিয়া উৎসাহ দেওয়া হইত। তাঁহার অগাধ ধন ও প্রভূত ক্ষমতা সহায়তায় তিনি বহু দুষ্প্রাপ্য পারসী ও সংস্কৃত হস্তলিখিত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

৺ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "সমাচার চন্দ্রিকা" হিন্দুধর্মের পক্ষাবলম্বী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ১৮২১ অব্দে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা ধর্মসভার মুখপত্র ছিল। ভবানীচরণ এই সভারও সম্পাদক ছিলেন, এবং ৺রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুর উহার স্থাপনকর্তা ও সভাপতি ছিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, হিন্দুধর্মের স্বার্থসংরক্ষণার্থ হিন্দুদিগের উহাই সর্বপ্রথম সাধারণ অনুষ্ঠান। জে. সি. মার্শম্যান্ ভবানীচরণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,— "পণ্ডিত আখ্যাধারী না হইলেও তিনি সাতিশয় বুদ্ধিমান্ ও বিলক্ষণ বিদ্বান্ এবং অতীব উৎসাহশীল ও কার্যকুশল ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া স্বদেশীয়দিগের মধ্যে বিলক্ষণ প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চন্দ্রিকার সুদক্ষ সম্পাদকের জীবিতকালে ইহা দেশের প্রচলিত কুসংস্কারের প্রবল রক্ষক বলিয়া বিবেচিত হইত। ভবানীচরণ যে সকল মত প্রকাশ করিতেন, লোকে তাহা পরম সমাদরে গ্রহণ করিত। পরন্তু এই সমাদরই ইহার উন্নতির একমাত্র কারণ নহে, প্রত্যুত তাঁহার রচনার বিশুদ্ধতা ও প্রাঞ্জল ভাষাও তৎপক্ষে বিলক্ষণ সহায়তা করিয়াছিল।" কয়েক বৎসর মাত্র হইল চন্দ্রিকার জীবনের অবসান হইয়াছে।

তদানীন্তন কালের আর একখানি বিখ্যাত সংবাদপত্রের নাম "সংবাদ-প্রভাকর।" সুকবি ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদকত্বে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। প্রথমে ইহা সপ্তাহে তিন দিন বাহির হইত, পরে ১৮৩৭ অব্দে দৈনিক আকার ধারণ করে। ৺রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, ৺দীনবন্ধু মিত্র, শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু প্রভৃতি খ্যাত্যাপন্ন লেখকগণ ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট শিক্ষানবিশি করিয়া হাত পাকাইয়াছিলেন। তৎকালে সমাজের উপর তাঁহার অপরিসীম প্রভাব ছিল। কিন্তু জীবনের শেষদশায় তিনি দারুণ দুরবস্থায় পতিত হন এবং ৺মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের আশ্রয়ে তাঁহার খড়দহস্থ বাগানবাটিতে বাস করেন। তথায় ঈশ্বরচন্দ্রের কুঞ্জ নামক একটি কুঞ্জ অদ্যাপি তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন: 'তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলিই তাঁহার যশের মূল ভিত্তি; ঐ সকল কবিতা রস-মাধুর্যে পরিপূর্ণ এবং জনসাধারণের অতি আদরের সামগ্রী। জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী, বিশেষতঃ হিন্দুর জীবনের সর্বাবস্থার ঘটনাবলীই, তাঁহার রচনার বিষয়। শরতের দুর্গোৎসবকালীন বা শীতের আগমনী উৎসবকালীন হিন্দু গৃহস্থের হর্ষবিষাদ, হিন্দুচরিত্রের দোষগুণ, তাহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগ,

তাহাদের মাৎসর্য ও বিবাদ-বিসংবাদ, নব্য বাঙ্গালীদিগের নানাপ্রকার দোষ এবং তাহাদের অভিমান ও আকাঙ্ক্ষা এই সমস্ত বিষয় এবং এতাদৃশ অন্যান্য বিষয় তিনি যেরূপ নিপুণতার সহিত যথাযথভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত বিস্ময়াবহ। কবিতাগুলি পাঠ করিলে পাঠকের মনে হয় যেন, তিনি গ্রন্থকারের চিত্রিত দৃশ্যাবলী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং কল্পিত অভিনেতা ও বক্তাদের মধ্যে বাস ও বিচরণ করিতেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র ব্যঙ্গ রসের অবতারস্বরূপ। তাঁহার স্বাভাবিক সরল কবিতার প্রত্যেক ছত্রে অতি উচ্চ-শ্রেণীর রসমাধুর্য দেদীপ্যমান। পরন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় করুণরসাদি কবি-জনোচিত উচ্চশ্রেণীর গুণপনার একান্ত অভাব দৃষ্ট হয়।

তদানীন্তন কালের আর একখানি প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সংবাদপত্রের নাম "সংবাদ-ভাস্কর"। প্রথিতনামা পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ইহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি সাধারণতঃ গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য—এই বিকৃত নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি "রসরাজ" নামে আর একখানি কাগজও বাহির করিয়াছিলেন। তৎকালীন হিন্দুসমাজ ঈশ্বরচন্দ্র ও গৌরীশঙ্করের সরস লিপিযুদ্ধে যারপরনাই আনন্দানুভব করিত। কথিত আছে যে, তাঁহারা এই ব্যাপারে নিরতিশয় অশ্লীলতা, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও কুরুচির পরিচয় দিতেন; পরন্তু বর্তমান সময়ের কোন কোন বাঙ্গালা সংবাদপত্রের পরস্পরের প্রতি কটূক্তি বর্ষণের সহিত তুলনা করিলে, তাঁহাদের সে লেখাও সংযমের অভাব বলিয়াই বোধ হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুর সংবাদ ভাস্করে নিয়মিতরূপে প্রবন্ধ লিখিতেন। এই অধ্যায়ের শেষাংশে সংবাদপত্রের ও সাময়িক পত্রের একটি তালিকা দেওয়া হইল। তালিকা যে সম্পূর্ণ হইয়াছে, একটিও ছাড হয় নাই—এমন কথা বলিতে পারা যায় না।

সোমপ্রকাশ—বাঙ্গালা কাগজের মধ্যে ৺ পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত "সোমপ্রকাশ" সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি অতি সুন্দর বাঙ্গালা লেখক ছিলেন,—তাঁহার লেখার তেজ ফুটিয়া বাহির হইত। ৺ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরপ্রমুখ সুবিচারকেরা তাঁহার লেখার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছেন। বলিতে গেলে, তিনি যেন প্রাচীন ও বর্তমান সংবাদপত্র-সম্পাদন-প্রণালীর সন্ধি-স্থলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তৎকালে সোমপ্রকাশের ন্যায় প্রভাবশালী কাগজ আর ছিল না। দ্বারকানাথ সংস্কৃত ভাষার সুপণ্ডিত ও স্বাধীনপ্রকৃতির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ২৪-পরগনার অন্তঃপাতী চিংড়িপোতা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় আইন জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোমপ্রকাশের প্রকাশ তিরোহিত হইয়া যায়। কিছুদিন পরে পূর্ব সম্পাদকের অধীনে ইহা পুনরাবির্ভূত হয়, কিন্তু এখন ইহার জ্যোতিঃ বিলুপ্ত।

এডুকেশন গেজেট—৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই সাপ্তাহিক পত্রখানি অতীব

দক্ষতা ও বিজ্ঞতার সহিত সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট ইহাতে অর্থ সাহায্য করিতেন। এই কাগজখানি অদ্যাপি জীবিত আছে।

মাসিক পত্রসমূহের মধ্যে ১৮৫১ অব্দে প্রথম প্রকাশিত ও ৺ রাজা রাজেন্দ্র-লাল মিত্র সম্পাদিত "বিবিধার্থ সংগ্রহ" পত্রের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সচিত্র পত্রখানি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইত এবং ইহাতে প্রধানতঃ শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক প্রসঙ্গের আলোচনা হইত। শেষ দশায় ইহা ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহের হস্তে আসিয়া পড়ে। তিনি পূর্ব নামের পরিবর্তন করিয়া ইহার নাম "রহস্য-সংগ্রহ" রাখেন।

বঙ্গদর্শন—৺রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এই মাসিক পত্রখানিও সাতিশয় খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ইহার প্রথম অবস্থায় যে সকল বাঙ্গালা লেখক ইহাতে লিখিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উত্তরকালে খ্যাতিমান্ হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ সৃজনক্ষমতা এবং রচনাশক্তি ছিল। বলিতে গেলে, তিনি বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যকে এক অভিনব পথে পরিচালিত করিয়াছেন। বিদ্রূপবাণবর্ষণ দ্বারা হৃদয়ের মর্মগ্রন্থি ছিন্ন করিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার রচনায় তাঁহার অসামান্য বিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণশক্তি এবং সরস রসিকতা প্রকাশ পাইত। চরিত্রচিত্রণে তিনি যে অদ্ভুত নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহার তুলনা নাই।

বঙ্গবাসী—সুলভ বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রচার বিষয়ে "বঙ্গবাসী"র প্রতিষ্ঠা-তারাই সবিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন ও সাফল্য লাভ করিয়াছেন। লর্ড রিপণের শাসনকালে কতকগুলি স্বাধীনচিত্ত দেশহিতৈষী মহাত্মার যত্নে এই পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ সকল মহাত্মার মধ্যে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ রায় এবং ইহার বর্তমান সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর নাম সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। জন্মাবধি ইহার প্রবন্ধাবলী পাঠকদিগের চিত্তাকর্ষণ করিতে লাগিল, এবং ইহা সত্বরই প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল। এ পর্যন্ত কোন সংবাদপত্রের ভাগ্যে যাহা ঘটে নাই, ইহার ভাগ্যে তাহাই ঘটিল,—বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইতিহাসে যাহা হয় নাই, ইহাই তাহার হইল,—বঙ্গবাসী ১৫ হইতে ২০ হাজার নিয়মিত গ্রাহক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইল। এই অসাধারণ সমৃদ্ধির প্রধান কারণ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর সুদক্ষতা। তাঁহার সুদক্ষ পরিচালন গুণে কেবল যে কাগজখানি অশ্রুতপূর্ব ও অতুলনীয় মর্যাদা ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহা নহে, প্রত্যুত শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সুলেখকগণ ইহার সহিত একমতাবলম্বী হইয়া বঙ্গবাসীর উন্নতির জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের পক্ষাবলম্বন হেতু বহুসংখ্যক শিক্ষিত লোক ইহার সহিত যোগদান করেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি এমন ভাবে হিন্দুধর্মের প্রচার ও ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক আখ্যা

প্রদান করিলেন, এই সেই সমস্ত ব্যাখ্যা বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ওরফে কৃষ্ণানন্দ স্বামীও কিছুদিন ইহাতে লিখিয়াছিলেন। এই-রূপে দিন দিন বঙ্গবাসীর প্রসার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বাঙ্গালায় যাহা কখনও হয় নাই, তাহাই হইল,—সুদূর পল্লীগ্রামবাসীরা, অশিক্ষিত দোকানদারেরা, এমন কি মফঃস্বলে ফেরিওয়ালারা পর্যন্ত বঙ্গবাসী পাঠ করিতে বা উহার পাঠ শ্রবণ করিতে লাগিল। হিন্দুধর্মের বর্তমান ভাব এই অভিনব প্রণালীর প্রচারে যেন নববলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিল। এই সময়ে বঙ্গবাসী "ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশনাল কংগ্রেস" নামক সভার কোন কোন কার্য ও প্রণালীর দোষোদ্ঘাটন করিয়া এবং উহার অমিতব্যয়িতার উল্লেখ করিয়া উহার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিল। ইহাতে অপর পক্ষীয়েরা বঙ্গবাসীর প্রতি বিরূপ হইলেন এবং এমন একখানি কাগজের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন, যাহা রাজনৈতিক বিষয়ে বঙ্গবাসীর বিপরীত মতাবলম্বী হইবে।

হিতবাদী—ঐরূপ একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে একটি জয়েণ্ট স্টক্ কোম্পানির সৃষ্টি হইল, এবং তাঁহাদের যত্নে "হিতবাদী" প্রচারিত হইল। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ইহার সম্পাদক হইলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ খ্যাতনামা লেখকগণ ইহার নিয়মিত লেখক ও পৃষ্ঠপোষক হইলেন। কিন্তু এই কারবার লাভবান না হওয়ায় কিছুদিন পরে ইহা পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদকে বিক্রয় করা হয়। তিনিই ইহার বর্তমান সম্পাদক। তাঁহার সুদক্ষ পরিচালন গুণে হিতবাদী ৩০ হইতে ৪০ সহস্র গ্রাহক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে। পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন নানাবিষয়ে সুপণ্ডিত। তিনি কেবল বাঙ্গালা গদ্য রচনাতেই সুদক্ষ নহেন, পদ্য রচনাতেও সুনিপুণ। তিনি কেবল সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত নহেন, ইংরাজীতেও সুশিক্ষিত।

সঞ্জীবনী—একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত উন্নতশ্রেণীর ব্রাহ্মদিগের যত্নে ইহার জন্ম। সিটি কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ইহার বর্তমান সম্পাদক। ব্রাহ্মদিগের স্বার্থসংরক্ষণ ইহার উদ্দেশ্য হইলেও, যাহাতে সর্বশ্রেণীর লোকের হিতসাধন হইতে পারে, এরূপ বহু বিষয় অপক্ষপাতে ও যুক্তিসঙ্গতভাবে ইহাতে আলোচিত হইয়া থাকে। অতি উদার নীতিতে এবং অত্যন্ত সুবুদ্ধিসহকারে ইহা পরিচালিত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র আছে। এস্থলে সে সকলের উল্লেখ করা হইল না। দুঃখের বিষয় এই যে, স্থানাভাববশতঃ "ভারতী" "নব্যভারত" প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর পত্রগুলির নামোল্লেখ পর্যন্ত করিতে পারিলাম না। এই কাগজগুলি অতিশয় দক্ষতা ও যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইয়া থাকে।

ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি মানব-জ্ঞানক্ষেত্রের তাবৎ বিষয়ে হিন্দুজাতি যে মানসিক ক্রিয়াশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, একটি অধ্যায়ে তাহার

সবিস্তার আলোচনা করা দুঃসাধ্য। ৺রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সুবিখ্যাত সংস্কৃত অভিধান 'শব্দকল্পদ্রুমের' প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। উহা পরে ক্রমান্বয়ে আট খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। ঐরূপ অভিধান এদেশে পূর্বে আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। উহার সম্পাদনে অপরিসীম পাণ্ডিত্য, প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও সুবিস্তর গবেষণার প্রয়োজন হইয়াছিল। উহাতে অর্থব্যয়ও যে প্রভুত হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য, কারণ মুদ্রণকৌশল তাহার অল্প দিন পূর্বেই এদেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল। ৺রামকমল সেন ডাক্তার ক্যারির সহায়তায় ১৮৩০ অব্দে শ্রীরামপুরে তাঁহার ইংরেজী বাঙ্গালা অভিধান প্রকাশ করেন। টড্ সম্পাদিত "জনসন্স্ ডিক্সনারি" নামক অভিধানের অনুকরণে ইহা সঙ্কলিত এবং ১৮৩৪ অব্দে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম ক্যাভেণ্ডিস বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের নামে ইহা উৎসর্গীকৃত হয়। ইহার প্রচারের পূর্বে আরও অনেক অভিধান গভর্ণমেণ্টের উৎসাহে ও সাহায্যে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল।*

৺রামগোপাল ঘোষ সংবাদপত্র-ক্ষেত্রে কি কাজ করিয়াছেন, আমরা এক্ষণে তাহাই সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। "জ্ঞানান্বেষণ" পত্রে তিনি "সিভিস্" (Civis) নামে স্বাক্ষর করিয়া বাণিজ্যশুল্ক সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি "স্পেক্টটর" নামে একখানি কাগজ বাহির করিয়াছিলেন। যে সকল মহাত্মা জর্জ টমসনের সহযোগে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি (পরে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশন) সংস্থাপন করেন, রামগোপাল তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। এই সভার আদি নাম ছিল "ল্যাণ্ডহোল্ডার্স য়্যায়োসিয়েশন" অর্থাৎ জমিদার-সভা। বঙ্গবাসীদিগের হিতকর বহু কার্যানুষ্ঠানেই তিনি মহানুভব ডেভিড্ হেয়ার, ডি. বেথুন এবং ডাক্তার মোয়াটের সহযোগী ছিলেন। রামগোপাল এবং আর কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তি ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর যাহাতে চারিজন ছাত্রকে বিভিন্ন ব্যবসায়ের উপযোগিনী শিক্ষা লাভ করিতে ইংল্যাণ্ডে প্রেরণ করেন, তদ্বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেন। সর্বোপরি তাঁহার প্রধান গুণ, সুন্দর ইংরেজী বক্তৃতা। তাঁহার ন্যায় বাগ্মী বাঙ্গালীদের মধ্যে ইতঃপূর্বে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। গভর্ণমেণ্ট কলিকাতায় গঙ্গাতীরে হিন্দুদিগের শবদাহপ্রথা রহিত করিতে উদ্যত হইলে,

* ঐরূপে প্রকাশিত অভিধানের নাম:

১। গিলক্রাইস্টের হিন্দি-ইংরেজী ও ইংরেজী-হিন্দি অভিধান, ২য় খণ্ড; ২। ফস্টারের বাঙ্গালা ইংরেজী অভিধান (২য় খণ্ড)। ৩। হান্টারের হিন্দি-ইংরেজী অভিধান। ৪। গ্ল্যাডউনের হিন্দি, পারসী ও ইংরেজী অভিধান। ৫। উইলসনের সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান। ৬। ক্যারির বাঙ্গালা-ইংরেজী অভিধান। ৭। হকের ব্রহ্ম-ইংরেজী অভিধান। ৮। মলেসওয়ার্থের মহারাষ্ট্রী-ইংরেজী অভিধান।

রামগোপাল 'জাস্টিস অফ্ দি পীস' গণের সভায় হিন্দুদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় যে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন্ তজ্জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। সেই বক্তৃতার ফলে গভর্ণমেণ্ট স্বীয় সঙ্কল্প পরিহার করিতে বাধ্য হন। তাঁহার জীবনচরিত-লেখক বলেন—"লেখকরূপেই কি, আর বক্তারূপেই কি, আর বক্তারূপেই বা কি বিশুদ্ধ ও সুপ্রণালীসম্মত ইংরেজী ভাষা প্রয়োগে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি যে কোন বিষয়ের আলোচনা বা পক্ষসমর্থন করিতেন, তাহাতে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া এমনই বিভোর হইয়া প্রবৃত্ত হইতেন যে, ইংরেজী ভাব ও ভাষা তাঁহার পক্ষে বৈদেশিক অথবা তিনি ইংরেজ পরিবারের মধ্যে লালিত-পালিত হন নাই, ইহা বিশ্বাস করা দুঃসাধ্য হইত। কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার কক্রেন্ সাহেব একসময়ে বলিয়াছিলেন যে, "স্বদেশীয়দিগের হিতকর সর্ববিষয়ের সমর্থনে রামগোপাল যেরূপ বাগ্মিতা ও আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, অন্য কাহাকেও তদ্রূপ করিতে তিনি কখনও শুনেন নাই।" রামগোপাল জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র। তিনি ১৮১৫ অব্দের অক্টোবর মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৬৮ অব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি কালগ্রাসে পতিত হন। যাঁহারা এ দেশে জয়েণ্ট স্টক্ কোম্পানির প্রথম সৃষ্টি করেন, রামগোপাল তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্স নামক সভার অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন (১৮৫০ খ্রীঃ)। রামগোপালের আচার ব্যবহারগুলি প্রকৃত হিন্দুজনানুমোদিত ছিল না; এজন্য তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধের সময় তাহাকে মহা সঙ্কটে পড়িতে হয়। সে সময়ে তিনি ৺মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের কৃপায় সে সঙ্কট হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হন। বলা বাহুল্য, উক্ত মহারাজ রামগোপালের গুণের সবিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। রামগোপাল মৃত্যুকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৪০,০০০ হাজার টাকা ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি নামক সভায় ২০,০০০ হাজার টাকা এবং তাঁহার যে সকল বন্ধুবান্ধব তাঁহার নিকট ঋণী ছিলেন, তাঁহাদিগকে ৪০,০০০ হাজার টাকা দান করিয়া যান।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ৺প্যারীচরণ সরকার বহুদর্শী শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ ও লোকহিতৈষী বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। তিনি "ভূ-ভারতীয় শিক্ষকগণের শিরোমণি" ও "প্রাচ্য ভূখণ্ডের আর্নল্ড" আখ্যায় অভিহিত হইতেন। তিনি "হিতসাধক" নামে একখানি বাঙ্গালা কাগজ এবং পরে ১৮৬৫ বা ১৮৬৬ অব্দে "ওয়েল-উইশার" (হিতৈষী) নামে একখানি ইংরেজী পত্র প্রকাশ করেন। বঙ্গদেশের মাদক-নিবারণবিষয়ক অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার সংস্রব ছিল। এই সূত্রে একটি মাদক-নিবারণী-সভা স্থাপিত হয়। প্রথমতঃ মহারাজ কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও তৎপরে মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর উহার সভাপতি হন, এবং সেই সময়ে কেশবচন্দ্র সেনও উহাতে যোগদান করেন। প্যারীচরণের হস্তে কিছুদিন "এডুকেশন গেজেট" পত্রের ভার ছিল। তিনি

ছাত্রবর্গের বিশেষতঃ দরিদ্র ছাত্রগণের পরম সহায় ও অভিভাবক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তৎপ্রণীত ফার্স্ট বুক্ অফ্ রিডিঙ্, সেকেণ্ড বুক্ অফ্ রিডিঙ্ প্রভৃতি ইংরেজী শিক্ষার প্রথম পুস্তকগুলি অদ্যাপি সমাদৃত ও নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অধুনা সার রোপার লেথব্রিজ সাহেব ঐ সকল পুস্তক প্রকাশ করিয়া থাকেন, কারণ তিনি উহাদের প্রচারস্বত্ব ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। প্যারীচরণ ১৮২৩ অব্দের ২৩শে জানুয়ারি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭৫ অব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৺প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী কিছুদিন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। বোধহয়, দেশীয়দিগের মধ্যে তিনিই প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় পাটীগণিত ও বীজগণিত বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎকালে এই কার্য যে নিতান্ত দুঃসাধ্য ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ তত্ত্ববিষয়োপযোগী অনেক নূতন নূতন শব্দই প্রস্তুত করিয়া লইতে হইয়াছিল। বহুদর্শী শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া তিনি সুপরিচিত ছিলেন। বহু বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া এবং অনেক ছাত্রকে অর্থ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুদান করিয়া তিনি দেশমধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৮০ অব্দের নভেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

৺কিশোরী চাঁদ মিত্র স্বসময়ের সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রে একজন উৎকৃষ্ট ইংরেজীলেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের একজন প্রকৃত সুহৃদ ছিলেন এবং তাঁহার জীবনচরিত প্রণয়ন করেন। ৺প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮১৪ অব্দে কলিকাতা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। বাঙ্গলা সংবাদপত্র ক্ষেত্রে ও সাধারণতঃ বাঙ্গলা সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যে কাজ করিয়াছেন, তাহার ফল নিতান্ত অস্থায়ী রকমের নহে। রেভারেণ্ড জে. লঙ তাঁহাকে "বাঙ্গালার ডিকেন্স" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল।" "জমিদার ও রাইয়ত" শীর্ষক তাঁহার যে প্রবন্ধ কলিকাতা-রিভিউ পত্রে প্রকাশিত হয়, লর্ড আল্‌বিমাল তাহা পার্লামেণ্টের লর্ড সভার গোচরে আনয়ন করেন। সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মবিষয়ে তিনি বহু প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। "আলালের ঘরের দুলাল" প্রভৃতি বিদ্রূপাত্মক গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় বোধ হয়, তিনিই প্রথম রচনা করেন। তাঁহার জীবনচরিত-লেখক বলেন, তাঁহার একখানি পুস্তকও আকারে বড় নয় বটে, কিন্তু সকলগুলিই সুস্পষ্ট ও সরল ভাষায়,—যে ভাষায় আমরা সচরাচর কথা কহি, সেই ভাষায় লিখিত, এবং সকলগুলিই মৌলিকতাগুণের নিমিত্ত সবিশেষ প্রশংসনীয়। নিকৃষ্ট শ্রেণীর গ্রন্থসমূহ যেরূপ হলাহলরাশি, প্রচণ্ড ক্রোধ ও দারুণ বিদ্বেষের ভাবে পরিপূর্ণ, তাঁহার বিদ্রূপাত্মক পুস্তকে তাহার কোন চিহ্নই দৃষ্ট হয় না। তিনি "মাসিক পত্রিকা" নামে একখানি বাঙ্গালা কাগজ বাহির করেন। ইহা যে প্রতিমাসে প্রকাশিত হইত, তাহা ইহার নাম দ্বারা বুঝা যায়। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর সহিত

একযোগে তিনি বাঙ্গালা "স্পেক্টর" প্রকাশ করেন। জজ টমসন সাহেবের সভাপতিত্বে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি স্থাপিত হইলে প্যারীচাঁদ উহার সম্পাদক হন।

বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে জোড়াসাঁকোবাসী সুপ্রসিদ্ধ ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ যে কাজ করিয়াছেন, তাহার যথোচিত প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহারই যত্নে এবং তাঁহারই প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানাধীনে সুপ্রসিদ্ধ মহাকাব্য "মহাভারত" বাঙ্গালা গদ্যে অনূদিত হয়। মহাভারতের আরও কয়েকখানি বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মূলের প্রকৃতভাব রক্ষায় এবং ভাষায় বিশুদ্ধতা ও উচ্চতায় তাঁহাদের একখানিও কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদের সহিত তুলনীয় নহে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্য বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত ইহার যথোচিত অনুবাদ ও বিশুদ্ধতার তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। উদারহৃদয় মহাত্মা বাঙ্গালা ভাষার যে অপরিমেয় মহোপকার সংসাধন করিয়াছেন, তাহা কখনও বিস্মৃত হইবার নহে। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালা ভাষা পাশ্চাত্য পণ্ডিত-দিগের নিকট অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত; নচেৎ তিনি যে এতদিন তাঁহার পরিশ্রমের অনুরূপ পুরস্কার লাভ করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তদানীন্তনকালে বাঙ্গালা ভাষার সেবায় যে পরিমাণ স্বদেশানুরাগ ও স্বার্থ-ত্যাগের প্রয়োজন হইত, তাহা অতি অল্প লোকেই প্রদর্শন করিতে পারিতেন। এরূপ স্থলে তিনি যে তাহার স্বদেশীয়গণের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র, তাহা কে অস্বীকার করিবে? তিনি বহু গুণী ব্যক্তির সহায় ও সুহৃদ ছিলেন। ঐ সকল গুণী ব্যক্তি পরে সংসার-ক্ষেত্রে বিভিন্ন পথে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালা নাট্যশালার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে তিনি বিস্তর সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার হাস্যরসাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক সামাজিক নক্সা "হুতুম প্যাচা" গ্রন্থে তিনি তদানীন্তন সমাজের ভাল-মন্দ সকল ভাবই বিশদরূপে যথাযথভাবে অতি নিপুণতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। ঐ শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে উহাই সর্বোৎকৃষ্ট,—উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুস্তক এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। হয় তো এমন দিন আসিলেও আসিতে পারে, যখন লোকে হুতুম প্যাচা পড়িবে না, কিন্তু এমন দিন কখনই আসিবে না, যখন হুতুম প্যাচা পড়িয়া লোকে আনন্দ ও উপকার লাভ না করিবে। কালীপ্রসন্ন দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের বংশধর ও জয়কৃষ্ণ সিংহের পৌত্র। এই জয়কৃষ্ণ প্রাচীন হিন্দু কলেজের সংস্থাপন ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। কালীপ্রসন্ন ব্যবসায়ে জমিদার ও জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি জীবিত আছেন।

৺মধুসূদন দত্ত বাঙ্গালা পদ্য-ক্ষেত্রে যে কাজ করিয়া গিয়াছেন, সত্য সত্যই তাহার তুলনা নাই। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন: "মেঘনাদ বধ" অতি উচ্চশ্রেণীর বীররসাত্মক কাব্য; সমস্ত বাঙ্গালা সাহিত্যরাজ্য তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলেও ইহার তুল্য উচ্চভাববিশিষ্ট রচনা আর দেখিতে পাওয়া যায়

না। যাঁহারা উচ্চভাব অনুভব ও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ, তাঁহারা মেঘনাদ বধ পাঠ করিলে যেরূপ ভক্তিবিমিশ্র ভয়ের ভাবে বিভোর হইবেন, বঙ্গীয় অন্য কোন কবির কাব্য পাঠে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই ; অপিচ তাঁহারা মধুসূদনকে অতি উচ্চশ্রেণীর প্রতিভাসম্পন্ন কবি বলিয়া স্বীকার করিবেন, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকবি ব্যাস, বাল্মীকি বা কালিদাস, অথবা হোমার, ড্যান্টি বা সেক্সপিয়রের অব্যবহিত নিম্নাসনে স্থান দিবেন। যশোহর জেলার ১২২৮ অব্দে মধুসূদনের জন্ম হয়। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং অধ্যয়ন সমাপ্ত করার পর কিছুদিন মাদ্রাজে যাইয়া অবস্থিতি করেন। অনন্তর তিনি বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিয়া তিনখানি নাটক, দুইখানি প্রহসন, এবং বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনখানি ও মিত্রাক্ষরছন্দে একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইতঃপূর্বে অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাঙ্গালা কবিতা আর কেহ রচনা করেন নাই। অতঃপর তিনি ইংলাণ্ডে গমন করেন এবং প্রাতঃস্মরণীয় উদারচরিত দাতা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহায্যে ব্যারিস্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। ১৮৭৫ অব্দে মধুসূদনের মৃত্যু হয়। বস্তুতঃ তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে, সেগুলি খ্রীষ্টিয়ানের রচিত, তাহা বিশ্বাস করিতে কোন মতেই প্রবৃত্তি হয় না।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের মতে মধুসূদনের নিম্নেই সুপ্রসিদ্ধ কবি ৺ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসন। তাঁহার কবিতা উচ্চশ্রেণীর মধুর কল্পনা, সৌন্দর্যের অতি উৎকৃষ্ট ভাব, বিশুদ্ধ চিন্তা ও ভাবগাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ। তাঁহার ছোট ছোট কবিতাগুলিতেও উন্নত ও গভীর ভাব প্রকটিত। হেমচন্দ্র অনেকগুলি পদ্যগ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের সরকারী উকিল ছিলেন। ১৮৩৮ অব্দে তাঁহার জন্ম এবং ১৯০২ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনের কবিতাতেও উচ্চশ্রেণীর কল্পনা ও ভাবমাধুর্য প্রকটিত। উঁহার সৌন্দর্য যেন নিত্য নূতন। বাঙ্গালা কবিতা রচনায় আরও অনেকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার ৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু, এবং নারী কবি গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী, কামিনী সেন, মানকুমারী প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর, মনোমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় এবং রাজকৃষ্ণ রায়ও বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ উহার নাটক বিভাগে, সুলেখক বলিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। দীনবন্ধুর লেখায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি লোকের চরিত্র অবিকল চিত্রিত করিয়া সমাজের দোষ সংশোধনের চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহার নাটকীয় চরিত্রগুলি তাহাদের নীচতা ও দুশ্চরিত্রতা প্রদর্শনস্থলেও এমন নিপুণতার সহিত হুবহু চিত্রিত হইয়াছে যে, তজ্জন্য গ্রন্থকারকে শতমুখে প্রশংসা করিতে হয়। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর রচনায়ও ঐ গুণ দৃষ্ট হয়। তাঁহার

বিদ্রূপাত্মক মর্মভেদী সামাজিক নকশাগুলি তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

রামবাগানের দত্তবংশীয়েরা পুরুষানুক্রমে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিতেছেন। এতদ্বংশীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, তন্মধ্যে নীলমণি দত্ত, রসময় দত্ত, রায় শশিচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, ঈশানচন্দ্র দত্ত, যোগেশচন্দ্র দত্ত, কুমারী তরুবালা দত্ত, ও. সি. দত্ত এবং রমেশচন্দ্র দত্ত—এই কয়েকজনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক পরিবারে এতগুলি লেখকের উদ্ভব নিতান্ত বিস্ময়জনক নহে কি? ৺নীলমণি দত্তকে এই বংশের একরূপ প্রতিষ্ঠাতা বলিতে পারা যায়। বাঙ্গালীদের মধ্যে এই নীলমণিই প্রথম ইংরেজী শিক্ষা করেন। তিনি মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের একজন সুহৃদ্ ও সহচর ছিলেন। রসময় দত্তই কলিকাতা ছোট আদালতের প্রথম দেশীয় জজ হন। রায় শশিচন্দ্র দত্ত বাহাদুর বিবিধ বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার বহুমুখীন বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় সুপরিস্ফুট। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে অসামান্য শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি তাঁহার স্বদেশীয়গণের অশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন, সন্দেহ নাই। তাঁহার মহনীয় উপন্যাসগুলি বঙ্গবাসীদিগের পরম সমাদরের সামগ্রী। তিনি ঋগ্‌বেদের যে সঠিক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ইউরোপের বিদ্বৎ সমাজে সমুচিত প্রশংসালাভ করিয়াছে। তাঁহার ঐতিহাসিক গ্রন্থনিচয় তাঁহাকে সুলেখক বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। ফলতঃ তিনি একাধারে ঐতিহাসিক, ঔপন্যাসিক, কবি, পণ্ডিত ও সুলেখক।

৺ সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ৩৪ বৎসরকাল উক্ত বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছিলেন। যে কালে হিন্দু-সমাজ ইংরেজী-শিক্ষাকে ঈর্ষা ও আশঙ্কার চক্ষে দেখিত, কিন্তু উক্ত রাজা বাহাদুর উহার পক্ষাবলম্বন করেন এবং কলেজটিকে সুফলপ্রসূ করিয়া তোলেন। তিনি গভর্ণমেণ্ট-সংস্কৃত কলেজের নিয়মিত পরিদর্শক ও কিছুকাল উহার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। তিনি অনেক সময়ে উহার বার্ষিক পরীক্ষাও গ্রহণ করিতেন। তিনি উদারনীতির পক্ষাবলম্বী ছিলেন ও স্ত্রীশিক্ষার মূল্য বুঝিতেন। মাননীয় বেথুন সাহেব বলিয়াছেন,—"আধুনিক কালে ভারতবাসীদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে স্বদেশীয়দিগকে বুঝাইয়া দেন যে, স্ত্রীলোকদিগকে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন রাখা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা ও দোষের কার্য।" বিভিন্ন বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা পারিতোষিক গ্রহণার্থ তাঁহার ভবনে সমবেত হইত। তিনি স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তিকা প্রচার করিয়াছিলেন, এবং ঐ সকল পুস্তিকায় যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, নিজেও যে কার্যতঃ তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিতেন, তাহা তাঁহার স্বকীয় পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা দ্বারা বেশ বুঝা যায়। তখনকার অধিকাংশ লোকই কলিকাতা-স্কুল-বুক্

সোসাইটির প্রতি সভয়ে দৃষ্টিপাত করিত, কারণ তাহারা মনে করিত যে, উক্ত সোসাইটির প্রচারিত গ্রন্থপাঠের ফলে এতদ্দেশীয়দিগের হিন্দুধর্ম বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ ঘটিবে ; কিন্তু রাধাকান্তের মনে ঐরূপ অমূলক আশঙ্কা স্থান পাইত না। তিনি উক্ত সোসাইটির একজন উদ্যমশীল সদস্য ছিলেন এবং নিজেও কয়েকখানি বাঙ্গালা স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

উক্ত রাজার ক্রিয়াশীলতা নানাদিকে প্রকাশ পাইত। তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশন্ নামক সভার প্রথম আজীবন সভাপতি ছিলেন এবং উহাকে এমনভাবে পরিচালিত করিতেন যে, তাহাতে তাঁহার বিজ্ঞতা ও রাজ-ভক্তির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি কিছুকাল কৃষি ও উদ্যান-সমিতির সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি অনেক কাগজে কৃষিবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি উদ্যানতত্ত্বঘটিত একখানি পারসী গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ প্রস্তুত করেন। বিলাতের রয়াল সোসাইটির উপদেশে ও অনুরোধে ঐ অনুবাদ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। "শব্দকল্পদ্রুম" নামক সুবৃহৎ সংস্কৃত অভিধানের প্রচারই তাঁহার জীবনের মহোত্তম কার্য। এই কার্যসাধনে বহু পরিশ্রম এবং চত্বাংবিংশৎ বর্ষাধিক সময় ও প্রভূত অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত রাজাকে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিতে এবং বিশেষ প্রকারের অক্ষর প্রস্তুত করাইতে হইয়াছিল। এই কার্য দ্বারা তিনি বিশ্বব্যাপী যশঃ লাভ করেন। বিলাতের "রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি" প্যারী নগরের "এসিয়াটিক সোসাইটি", কোপেনহেগেন নগরের "রয়াল সোসাইটি", জার্মানির "ওরিএন্টাল সোসাইটি", সেণ্টপিটার্সবার্গ নগরের "ইম্পিরিয়াল য়্যাকাডেমি", বার্লিন নগরের "রয়াল য়্যাকাডেমি" প্রভৃতি বিদ্বৎসমাজ তাঁহাকে স্ব স্ব সভার অবৈতনিক সদস্যরূপে গ্রহণ করিয়া নিয়োগ-পত্র প্রেরণ করেন। রুষিয়ার সম্রাট ও ডেনমার্কের রাজা তাঁহাকে পদক পাঠাইয়া দেন। ইংল্যাণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে নাইট শ্রেণীভুক্ত করিয়া 'সার' উপাধি প্রদান এবং উপঢৌকনস্বরূপ একটি সুন্দর স্বর্ণপদক প্রেরণ করেন। 'রাজা বাহাদুর" উপাধি তিনি পূর্বেই পাইয়াছিলেন। রাধাকান্ত দেব বহু বৎসর যাবৎ জস্টিস অফ্ পিস্ ও কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট রূপেও কার্য করিয়াছিলেন।

রাধাকান্ত দেবের অনেক গুণ ছিল। তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষায় সুপণ্ডিত, উদারনৈতিক, উন্নতিশীল এবং শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজের প্রসার সাধনে কার্যতঃ সাহায্যকারী ছিলেন। এই সকল গুণ থাকায় তিনি স্বকীয় কায ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার স্বদেশীয়দিগের জীবন ও চিন্তাস্রোতের গতি অনেকটা ফিরাইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সমুদয় সহানুভূতি ও সুমার্জ্জিত আচারব্যবহারের জন্য তিনি সকল শ্রেণীর লোকেরই সমাদর এবং ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সার লরেন্স পীল দীর্ঘকাল তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা

করিয়া এবং তাঁহার আচারব্যবহার লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, রাধাকান্ত ভদ্রতার পূর্ণ আদর্শ এবং সে আদর্শ সর্বদা আমাদের অনুকরণীয়।"

বাঙ্গালা ভাষা, সাহিত্যর পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন বিষয়ে যাত্রা, থিয়েটার ও ঐ শ্রেণীর অন্যান্য আমোদজনক ব্যাপার যে বিস্তর সহায়তা করিয়াছে, সে-কথা এখনও বলা হয় নাই। উহাদের দ্বারা ভারতবাসীদিগের রুচি ও আচার ব্যবহার বহুপরিমাণে পরিমার্জ্জিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। উহারা বৈষ্ণবধর্মের সারতত্ত্ব, রামায়ণ মহাভারতাদি উৎকৃষ্ট ধর্মগ্রন্থসমূহের উপদিষ্ট মানবের কর্তব্যনীতি এবং হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের গভীর নীতিসমূহ জনসাধারণের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। এমন কি, স্ত্রীলোকেরা এবং সুকুমারবয়স্ক বালক-বালিকারাও উহা হইতে মহোপকার লাভ করিয়াছে। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের এবং থিয়েটার সম্প্রদায়ের যত্ন চেষ্টায় আধুনিক বাঙ্গালা গানের এবং সকল গানের রাগ-রাগিণী ও সুরের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে; যাত্রার গানে এখন আর লোকের মন উঠে না, কাজেই সেগুলি বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছে এবং মার্জিত ব্রহ্মসঙ্গীত ও হালকা সুরের থিয়েটারের গান তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের এবং থিয়েটারের চেষ্টায় বাঙ্গালা গানের যে এইরূপ রূপান্তর ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক সময়ে হিন্দুস্থানী ও মুসলমানী সঙ্গীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। ভদ্র ও সৌখীন সমাজে ঐ সকল গানেরই সমাদর ছিল। ঐ সকল গান অতি উচ্চ অঙ্গের রাগ-রাগিণীতে গীত হইত এবং সাধারণতঃ কালোয়াতী গান নামে পরিচিত ছিল। ব্রহ্মসঙ্গীত ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর গানের তখন বড় একটা আদর ছিল না। টপ্পা, গজল প্রভৃতি সুমধুর সঙ্গীতগুলি মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের অতি আদরের বস্তু ছিল। তিনিই ঐ গুলিকে জনসাধারণের আদরণীয় করিয়া তোলেন। "রেইস্ এণ্ড রাইয়ত" পত্রের সম্পাদক ৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উক্ত মহারাজের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্মার্থ এইরূপ:

"সঙ্গীতের প্রতি রাজকৃষ্ণের অসীম অনুরাগ ছিল। তিনি নিজে একজন বিখ্যাত গায়ক ও বাদ্যযন্ত্র-বাদক ছিলেন।...গীতবাদ্য নিপুণ বহু ব্যক্তি রাজকৃষ্ণের নিকট প্রশংসা ও পুরস্কার লাভ করিবার আশায় সুদূর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও দাক্ষিণাত্য হইতে আগমন করিত। তাঁহার এ বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা ছিল বলিয়া তিনি এই বিদ্যার সুন্দর বিচার করিতে পারিতেন। সঙ্গীত বিদ্যাবিশারদ ফকির এবং সন্ন্যাসীরা অর্থস্পৃহাশূন্য হইলেও কেবল সংসারের নীরসতা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া কিয়ৎকাল বিশুদ্ধ শান্তিসুখে অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত রাজকৃষ্ণের নিকট গমন করিতেন।"

কবি, পাঁচালি, কথকতা, আখড়াই প্রভৃতিও আমোদজনক ব্যাপার বলিয়া হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল। এই সকল ব্যাপারের উন্নতিকল্পে ৺মহারাজ

নবকৃষ্ণ বাহাদুর যে আয়াস স্বীকার ও যত্ন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত এন্. এন্. ঘোষ লিখিয়াছেন :

"সুকুমার শিল্পের প্রতি, বিশেষতঃ সঙ্গীতবিদ্যার প্রতি তিনি যে অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন, তাহা সর্বপ্রকারে তাঁহারই যোগ্য। সুবিখ্যাত গীত-রচক হরু ঠাকুর ও নিতাই দাস তাঁহার আশ্রিত মধ্যে পরিগণিত ছিল। যে বাই-নাচকে ইংরেজেরা আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ আমোদ বলিয়া মনে করেন, সেই নাচ নবকৃষ্ণ কলিকাতার সমাজে প্রবর্তিত করেন এবং তাহাকে সর্বসাধারণের আদরের বস্তু করিয়া তোলেন। কবির গান তদানীন্তন হিন্দু-সমাজের প্রধান আমোদের বিষয় ছিল। উহাতে তৎকাল-রচিত কবিতা দ্বারা বাগযুদ্ধ করিবার অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ পাইত। দুই সম্প্রদায় আসরে অবতীর্ণ হইয়া "কবির লড়াই" করিতে প্রবৃত্ত হইত। এক পক্ষ তৎক্ষণাৎ গীত রচনা করিয়া ও শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে গাহিয়া চাপান দিত; অপর পক্ষ সেই অবসরে তাহার উত্তর-সূচক গীত রচনা করিয়া লইত এবং প্রথম পক্ষ নিবৃত্ত হইলে শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে তাহা গাহিত। শ্রোতারা এই অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া বিস্ময়বিহ্বল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আনন্দ ও প্রশংসা-ধ্বনি করিতে থাকিত। এইরূপে বহুক্ষণ গীতযুদ্ধ চলিত এবং অবশেষে শ্রোতারা জয়পরাজয়ের বিচার করিয়া দিতেন। হরু ঠাকুরের পূর্ণ নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। কবিদিগের মধ্যে তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া 'ঠাকুর' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নবকৃষ্ণের ভবনেই এইরূপ আমোদের প্রথম সৃষ্টি হয়,—প্রথম "কবির লড়াই" হয়। হরু ঠাকুর নবকৃষ্ণে এরূপ অনুরক্ত ছিলেন যে, নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তিনি ঐ ব্যবসায় ছাড়িয়া দেন। আখড়াই নামে আর এক প্রকার সঙ্গীতামোদ প্রচলিত ছিল। উক্ত মহারাজ তাহারও একজন প্রসিদ্ধ উৎসাহদাতা ছিলেন। আখড়াই বিষয়ের ওস্তাদ কুলুইচন্দ্র সেন তাঁহার নিকট অনেক উৎসাহ পাইয়াছিলেন। কুলুইচন্দ্রের দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতা রামনিধি গুপ্ত এ বিষয়ের যথেষ্ট উন্নতি করেন। এই রামনিধি সাধারণতঃ নিধু বাবু নামে পরিচিত। এইরূপে সঙ্গীত-বিদ্যার উপাসক বলিয়া তাঁহার যশঃ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইলে সুপ্রসিদ্ধ গীতবাদ্যের ওস্তাদগণ তাঁহার নিকট আগমন করিতেন, কিন্তু কাহাকেও নিরাশ হইয়া যাইতে হইত না।"

সঙ্গীতবিদ্যাবিষয়ে শ্রীযুক্ত রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর যে মহৎ কার্য করিয়াছেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া এ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। লুপ্তপ্রায় ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের পুনরুদ্ধার ও ঐ বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনকল্পে উক্ত রাজা পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করেন নাই; এমন কি আপনার সমস্ত জীবনই নিয়োগ করিয়াছেন। আধুনিক কোন ভারতবাসীই এ বিষয়ে তাঁহার সহিত তুলনীয় হইতে পারেন না। এই উচ্চ কলা ইদানীং এক প্রকার ইতরশ্রেণীর লোকের হস্তেই পতিত হইয়াছিল। উক্ত রাজা ইহাকে সেই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া ভদ্রসমাজে যথোপযুক্ত আসনে স্থাপন করিয়াছেন।

উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীতকলার আলোচনায় তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে অনেকগুলি পুস্তক-পুস্তিকাও প্রকাশ করিয়াছেন।

১৮১৮ হইতে ১৮৫৫ অব্দ পর্যন্ত যে সমস্ত বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, পশ্চাৎ তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল। তালিকাটি রেভারেণ্ড জে. লঙ ১৮৫৫ অব্দে প্রস্তুত করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট অর্পণ করেন।

১৮১৮ হইতে ১৮৫৫ অব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের তালিকা

পত্রের নাম	কখন প্রথম প্রকাশিত হয়	কত দিন জীবিত ছিল	সম্পাদকের নাম	বার্ষিক মূল্য
বেঙ্গল-গেজেট	১৮১৬	১ বৎসর	গঙ্গাধর ভট্টাচার্য	এক টাকা
সমাচার-দর্পণ	১৮১৮	২১ „	জে. মার্শম্যান, শ্রীরামপুর	এক টাকা
সংবাদ-কৌমুদী	১৮১৯	৩৩ „	তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানী-চরণ বন্দ্য	
সমাচার-চন্দ্রিকা	১৮২২		ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	এক টাকা
সংবাদ তিমিরনাশক		১০ „	কৃষ্ণমোহন দাস	
বঙ্গদূত		১৬ „	নীলরতন হালদার	
সংবাদ-প্রভাকর	১৮৩০	২৫ „	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	এক টাকা
সংবাদ-সুধাকর		৩ „	প্রেমচাঁদ রায়	
অনুবাদিকা		২ „		
জ্ঞানান্বেষণ	১৮৩১	১৩ „	দক্ষিণারঞ্জন মুখো ও. রসিক মল্লিক	
সুধাকর		১ „	পি. রায়	
সংবাদ-রত্নাকর		১ „	ব্রজমোহন সিংহ	
সমাচার-শুভ-রাজেন্দ্র			দুর্লভচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	
শাস্ত্রপ্রকাশ		১ „	লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার	
বিজ্ঞান সেবাধীশ			গঙ্গাচরণ সেন	
জ্ঞান-সিন্ধু তরঙ্গ			রসিককৃষ্ণ মল্লিক	
জ্ঞানোদয়			রামচন্দ্র মিত্র	
পাশাবলী			রামচন্দ্র মিত্র	
সংবাদ-রত্নাবলী	১৮৩২		মহেশচন্দ্র পাল	

পত্রের নাম	কখন প্রথম প্রকাশিত হয়	কত দিন জীবিত ছিল	সম্পাদকের নাম	মাসিক মূল্য
সংবাদ-সারসংগ্রহ			বেণীমাধব দে	
সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়	১৮৩৫	২ „	হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	এক টাকা
সংবাদ-সুধাসিন্ধু	১৮৩৭	১ „	কালীশঙ্কর দত্ত	আট আনা
সংবাদ-দিবাকর	১৮৩৭	৬ মাস	গঙ্গানারায়ণ বসু	আট আনা
সংবাদ-গুণাকর	১৮৩৭	৬ „	গিরিশচন্দ্র বসু	আট আনা
সংবাদ-সৌদামিনী		২ বৎসর	কালাচাঁদ দত্ত	
সংবাদ-মৃত্যুঞ্জয়			পার্বতীচরণ দাস	
সংবাদ-ভাস্কর			শ্রীনাথ রায়	এক টাকা
রসরাজ	১৮৩৮	১৭ বৎসর	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য	আট আনা
সংবাদ অরুণোদয়			জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়	
সুজন রঞ্জন			হেরম্বচরণ মুখোপাধ্যায়	
বেঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট গেজেট	১৮৩৯	১৭ বৎসর	জে মার্শম্যান	আট আনা
মুর্শিদাবাদ পত্রিকা	১৮৪০	১ „	গুরুদয়াল চৌধুরী	
জ্ঞানদীপিকা		১ „	ভবানী চট্টোপাধ্যায়	
ভারত-বন্ধু			শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	
বঙ্গদূত		১ „	নীলকমল দাস	
বাদেন দর্শন			অক্ষয়কুমার দত্ত ও প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ	
বেঙ্গলা স্পেক্টেটর		১ „	রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি	
অয়নবাদদর্শন	১৮৪৩	১ „	শ্রীনারায়ণ রায়, বারাকপুর	এক টাকা
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৮৪৩	১২ „	অক্ষয়কুমার দত্ত	আট আনা
সংবাদ-রাজরাণী	১৮৪৪	৬ মাস	গঙ্গানারায়ণ বসু	
সর্বরসরঞ্জিনী				
জগদ্বন্ধু পত্রিকা	১৮৪৬	২ বৎসর	সীতানাথ ঘোষ প্রভৃতি	
সত্যার্ণব	১৮৫৫	৫ „	রেভারেণ্ড ডবলিউ স্মিথ্‌	দশ পয়সা
পাষণ্ডপীড়ন		১ „	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	
সমাচার-জ্ঞানদর্পণ		৩ „	উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়	

পত্রের নাম	কখন প্রথম প্রকাশিত হয়	কত দিন জীবিত ছিল	সম্পাদকেব নাম	বার্ষিক মূল্য
জগদ্দীপক ভাস্কর			মৌলবি রজরালি	চার আনা
নিত্যধর্মরঞ্জিকা			নন্দকুমার কবিরত্ন	আট আনা
ভৈরব দ্বন্দ্ব				
দুর্জন দমন মহা-নবমী			মথুরানাথ গুহ	
কাব্যরত্নাকর	১৮৪৭	১ বৎসর	উমাকান্ত ভট্টাচার্য	
জ্ঞানাঞ্জন		১ "	চৈতন্যচরণ অধিকারী	
হিন্দুধর্ম-চন্দ্রোদয়		১ "	হরিনারায়ণ গোস্বামী	
রঙ্গপুর-বার্তাবহ			গুরুচরণ রায়	চার আনা
জ্ঞানসঞ্চারিণী		২ "	গঙ্গানারায়ণ বসু	চার আনা
সাধুরঞ্জন	১৮৪৭	২ "	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	চার আনা
দিগ্বিজয়			দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	
সুজনবন্ধু			নবীনচন্দ্র রায়	
বন্ধু হিন্দু			উমাচরণ ভদ্র	
আক্কেল গুড়ুম	১৮৪৭	৪ মাস	ব্রজনাথ বসু	
মনোরঞ্জন	১৮৪৭		গোপালচন্দ্র দে	
কানোট্টভ	১৮৪৮	১ বৎসর	মহেশচন্দ্র ঘোষ	
জ্ঞানচন্দ্রোদয়	১৮৪৮	২ মাস	রাধানাথ বসু	
জ্ঞানরত্নাকর	১৮৪৮	১ বৎসর	তারিণীচরণ রায়	
ভৃঙ্গদূত	১৮৪৮	১ "	আনন্দচন্দ্র শর্মা	
সংবাদ অরুণোদয়	১৮৪৮	১ "	পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায়	
সংবাদ-দিনমণি	১৮৪৮	৬ মাস	গোপালচন্দ্র রায়	
সংবাদ-রত্নবর্ষণ	১৮৪৯		মাধবচন্দ্র ঘোষ	
সংবাদ-রোসৌন্দজার			ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোঃ	আট আনা
বারাণসী-চন্দ্রোদয়		২ বৎসর	উমাকান্ত ভট্টাচার্য	
মুক্তাবলী			কালীকান্ত ভট্টাচার্য	
রসমুদ্গর	১০৪৯		গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
রসসাগর	১৮৪৯	৫ বৎসর	রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়	
রসরত্নাকর			যদুনাথ পাল	

পত্রের নাম	প্রথম কখন প্রকাশিত হয়	কত দিন জীবিত ছিল	সম্পাদকের নাম	মাসিক মূল্য
সুজনরঞ্জন			গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত	
মহাজন-দর্পণ			জয়কালী বসু	
কৌস্তুভ-কিরণ			রাজনারায়ণ মিত্র	
জ্ঞানপ্রদায়িনী			বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	এক টাকা
সত্যধর্মপ্রকাশিকা			গোবিন্দচন্দ্র দে	
সর্বশুভঙ্করী	১৮৪৯	৫ বৎসর	মতিলাল চট্টোপাধ্যায়	এক টাকা
সত্যপ্রদীপ		১ "	এম্, টাউন্ সেণ্ড্	আট আনা
সংবাদবর্ধমান			কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	আট আনা
বর্ধমান-চন্দ্রোদয়			রামরত্ন চট্টোপাধ্যায়	
সংবাদ-শুধাংশু	১৮৫২	১ "	রেভারেণ্ড কে. এম. বন্দ্যোঃ	চার আঃ
উপদেশক		৯ "	রেভারেণ্ড জে. ওয়েঙ্গার	দু আনা
সঞ্চারিণী		২ "	শ্যামাচরণ বসু	
সংবাদ-নিশাকর			নীলকমল দাস	
ধর্মাধর্মপ্রকাশিকা				
ভক্তিসূচক			রামনিধি দাস	
দূরবীক্ষণিকা				
জ্ঞানোদয়			চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	চার আনা
জ্ঞানদর্শন			শ্রীপতি মুখোপাধায়	
কাশীবার্তাপ্রকাশিকা			কাশীদাস মিত্র	
মেদিনীপুর ও হিজিলি গার্জিয়ান	১৮৫২	২ বৎসর	এইচ্. ভি. বেলি	
বিবিধার্থ সংগ্রহ	১৮৫২	৪ "	রাজেন্দ্রলাল মিত্র	তিন আনা
জ্ঞানারুণোদয়			কেশবচন্দ্র কর্মকার	চার আনা
সুলভ পত্রিকা	১৮৫৩		তারানাথ দত্ত	দু আনা
সুধাবর্ধন	১৮৫৪			এক টাকা
বঙ্গ বার্তাবহ	১৮৫৪			চার আনা
বর্বশুভকরী	১৮৫৪			চার আনা

দশম অধ্যায়

ইউরোপীয় সমাজ

বৈদেশিক জাতির আচার-ব্যবহার ও রীতি-পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে যাওয়া নিতান্ত দুঃসাহসিকের কর্ম। তাহাদের মনোভাবের ভিতর প্রবেশ করা এবং তাহাদের রুচি ও প্রবৃত্তির সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করা সহজ নয়। নিজ প্রকৃতির ও স্বভাবজাত ধারণার পরিবর্তন করিতে না পারিলে বৈদেশিক আচার-ব্যবহারের মর্ম অবধারণ করিবার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। বৈদেশিক জাতির সামাজিক জীবনের প্রকৃত রহস্য বুঝিতে হইলে উভয়ের সতত ও অব্যাহত সংমিশ্রণ একান্ত আবশ্যক। যে সকল ইউরোপীয় লেখক—যাঁহাদিগের সাধু উদ্দেশ্যের ও সদন্তঃকরণের বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই, তাঁহারাও হিন্দুদিগের সামাজিক জীবন ও আচার-ব্যবহার বর্ণনা করিতে যাইয়া অতি গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এতাদৃশ অবস্থায় হিন্দুরা ইউরোপীয় সমাজের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির বিচার করিতে যাইয়া যে বিষম ভ্রম করিয়া বসিবেন, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? আজন্ম বদ্ধমূল ভ্রান্তসংস্কার দ্বারা বিচার-বুদ্ধি কিরূপ কলুষিত হয়, তাহা কলিকাতা রিভিউ পত্র হইতে পশ্চাদুদ্ধৃত বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

"ইউরোপীয় রমণীদিগের নৃত্য দর্শনে দেশীয়দিগের মনে এক অদ্ভুত ধারণা জন্মে। কতিপয় বৎসর গত হইল, জনৈক দেশীয় ভদ্রলোক ইংরেজদের ভোজ-ব্যাপারের একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অন্যান্য কথার পর উপসংহার-কালে তিনি লিখিয়াছেন, "ভোজের পর তাহারা অতি অশ্লীলভাবে নৃত্য করে—পরস্পরের স্ত্রীকে ধরিয়া টানাটানি করে।"

অতএব এবংবিধ গুরুতর বিষয়ে আমরা নিজে দৃঢ়তার সহিত কোন কথা না বলিয়া, স্বয়ং ইউরোপীয়েরা এতদ্দেশের তদানীন্তন সাহেবসমাজের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাই পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিব।

জনৈক লেখক লিখিয়াছেন, "ইংরেজরা ফ্যাশন বা দেশাচারের যেরূপ আজ্ঞাবহ দাস, অন্য কোনও জাতি সেরূপ নহে।" কথিত আছে যে, ফ্যাশনই তাঁহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা, এবং সেই দেবতার তুষ্টি-সাধনার্থ কোন প্রকার ক্ষতি-স্বীকারেই তাঁহারা কাতর হন না। তাঁহাদের জাতীয় আচার-ব্যবহার ও কুসংস্কার কিরূপ দৃঢ়, তাহা পশ্চাদুদ্ধৃত বিবরণ হইতে বেশ বুঝা যায়: "কলিকাতার ও ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে যে রোগ পীড়ার এত প্রাদুর্ভাব, তাহার একটা প্রধান কারণ এই যে, ইংরেজরা আপনাদের জীবনযাপন রীতি, পরিচ্ছদ-পরিধান-প্রণালীপ্রভৃতি দেশের জলবায়ুর অনুযায়ী করিয়া লইতে চাহেন না। ইংরেজ ভূমণ্ডলের যেখানেই যান না কেন, তিনি আপনার দেশাচারটি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে চাহেন,—'তিনি লণ্ডনেও যেরূপ 'টুপিওয়ালা'

কলিকাতাতেও সেইরূপ 'টুপিওয়ালা'। এ বিষয়ে তাঁহাকে ব্যাটেভিয়া নগরস্থ ওলন্দাজের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। আমস্টার্ডাম নগরে বিস্তর খাল-পরিখা আছে বলিয়া ব্যাটেভিয়ার ওলন্দাজের যবদ্বীপের রাজধানীতেও জলার ভিতর সেইরূপ খাল পরিখা খনন করিয়াছিল,—তাহার ফল হইল মহামারী, জ্বর; সুতরাং যবদ্বীপের ওলন্দাজেরা তদ্দেশীয়দিগের তরবারির আঘাতে যত না হত হইল, ঐ সময় খাল জন্য তদপেক্ষা অধিক মারা গেল। দেখা যায়, ১৭৮০ অব্দে কলিকাতায় অনেকগুলি আকস্মিক মৃত্যু ঘটায় তত্রত্য লোকদিগকে এইরূপ সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; ভদ্রলোকেরা সাবধান হইবেন, যেন প্রখর গ্রীষ্মের সময়ে (জুন মাসে) যথেচ্ছভাবে অত্যধিক ভোজন না করেন, একখানা ইণ্ডিয়াম্যানের (জাহাজের) ডাক্তার আকণ্ঠ গোমাংস ভোজন করিয়া রাস্তায় পড়িয়া মারা গিয়াছেন; তখন তাপমানযন্ত্র ৯৮ ডিগ্রিতে উঠিয়াছিল।"

এতদ্দেশের ইউরোপীয় সমাজের আদিম অব্যবস্থা সম্বন্ধে কয়েকজন সাহেব লিখিয়াছেন যে, তৎকালে সাহেবসমাজে নীতিজ্ঞান অতি অল্পই দৃষ্ট হইত। ১৭৮০ অব্দে হিকি সাহেবের গেজেটে পশ্চাদুদ্ধৃত বিদ্রূপাত্মক প্রশ্নোত্তরটি প্রকাশিত হইয়াছিল:

প্র.। বাণিজ্য কি?	উ.। জুয়া খেলা।
প্র.। সর্বোৎকৃষ্ট গুণ কি?	উ.। ধন।
প্র.। স্বদেশ-প্রেম কি?	উ.। আত্মপ্রেম।
প্র.। প্রতারণা কি?	উ.। ধরা পড়া।
প্র.। সৌন্দর্য কি?	উ.। রঙ্।
প্র.। সময় সম্বন্ধীয় নিয়মপালন কি?	উ.। দ্বন্দ্বযুদ্ধ বা অভিসারের অঙ্গীকার যথাসময়ে পালন।
প্র.। ভদ্রতা কি?	উ.। অমিতব্যয়িতা।
প্র.। সরকারী টেক্স কি?	উ.। গুন্-পালান।
প্র.। জনসাধারণ কে?	উ.। কেহই নয়।

ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দিগের বিবাহ সম্বন্ধে কলিকাতা রিভিউ পত্রে জনৈক লেখক লিখিয়াছেন: "যৎকালে এডিনবরা নগরী ভারতীয় বাণিজ্য-বিপণির মাংসের হাট বলিয়া অভিহিত হইত, সে সময়ে বিবাহের কথাটা প্রাচীন কলিকাতায় একটা গুরুতর ব্যাপার ছিল।" লণ্ডন হইতেও অনেক রমণী-পণ্য আসিত। গ্র্যাণ্ড্ গ্রে লিখিয়াছেন: "সাধারণে ভারতবর্ষে বিবাহকার্য সম্পন্ন করিবার অনুরাগী, ইহা জানিয়া সর্বপ্রকার বাণিজ্যব্যবসায়ে প্রবৃত্তিপ্রবণ ইংরেজ-জাতি প্রতি বৎসর জাহাজ ভরিয়া মধ্যম রকমের সুন্দরী রমণীদিগকে তথায় প্রেরণ করে এবং তাহারা ভারতে উপস্থিত হইবার পর ছয় মাস অতীত হইতে না হইতে পতি-রত্ন লাভ করে। যে সকল সাহেব এ দেশের মাতৃপিতৃহীনা বা অসহায়া রমণীদিগকে মনোনীত না করায় আপনাদের অপরিণীত অবস্থায় বিরক্ত

হইয়া পড়ে, এবং কবে জাহাজ আসিবে বলিয়া হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে, তাহারাই অধীরভাবে এই সমস্ত পণ্যের প্রতীক্ষা করে। অন্যান্য স্থানের ন্যায় তাহারা ঐ পণ্য-দল হইতে আপনাদের মনোমত মাল ক্রয় করিবায় নিমিত্ত সমুৎসুক হয়। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সকল বিবাহ সাধারণতঃ সুখকর হইয়া থাকে।"

উক্ত লেখকই আবার অন্য এক স্থানে সম্পূর্ণ ভিন্ন আর এক প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। খুব তাড়াতাড়ি (অর্থাৎ যথোচিত কোর্টশিপ না করিয়া) যে সকল বিবাহকার্য সম্পন্ন হইত, তাহাদের ফল সাধারণতঃ শোচনীয় হইত। প্রণয় ব্যাপারে ভার্সেলিস নগরের বিচারালয় যেরূপ প্রসিদ্ধ, এক সময়ে কলিকাতাও প্রায় সেইরূপ প্রসিদ্ধ ছিল, এবং ইটালীয় রমণীরা সাধারণতঃ পতিকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকে, কলিকাতার ইংরেজ-মহিলারাও প্রায় সেইরূপ চক্ষে স্বামীকে দেখিত। অতি সামান্যমাত্র রোগে আক্রান্ত হইলেই পত্নী পতিকে ত্যাগ করিয়া ইউরোপে গমন করিত, কারণ তৎকালে পতির প্রতি পত্নীর বা পত্নীর প্রতি পতির অন্তরের টান ছিল না। অনেক স্থলে জাহাজ কেডগিরিতে উপস্থিত হইতে না হইতে পতি আপনার অন্তঃপুর কৃষ্ণকায়া উপপত্নীগণে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিত। কোন কোন স্থলে এরূপও ঘটিয়াছে যে, স্থান পরিবর্তনের উপদেশ দিবার নিমিত্ত পতি ডাক্তারকে উৎকোচ-প্রদানে বশীভূত করিয়াছে। এতাদৃশ অবস্থায় এই সকল বিবাহ সম্বন্ধে লোকে যে নানাপ্রকার কথা বলিবে, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? এ সম্বন্ধে একজন লিখিয়াছেন,- "কলিকাতার বিবাহানুষ্ঠানে হাইমেনের (প্রজাপতির) * সহিত কিউপিডকে (কামদেবকে) অতি কদাচিৎ সন্ধ্যাকালে দেখিতে পাওয়া যায়।" বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হইত; ১৭৭৮ অব্দে এইরূপ প্রথাই দৃষ্ট হয়,—তাহার কত পূর্ব হইতে এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, বলা যায় না। জনৈক লেখক লিখিয়াছেন: "এখানে বিবাহানুষ্ঠানটা সকল পক্ষেরই নিকট সাতিশয় আনন্দজনক; বিশেষতঃ আমার মনে হয়, পাদ্রি সাহেবের আরও আনন্দজনক, কারণ তিনি ঐ অনুষ্ঠান সম্পন্ন কবিবার পারিশ্রমিক প্রত্যেক স্থলে বিশটি করিয়া সোনার মোহর পাইয়া থাকেন। বর ও কন্যার বন্ধুবান্ধবেরা মনোহর বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া নবদম্পতির কোনও আত্মীয়ের বাটীতে সমবেত হন এবং অতি উপাদেয় ভোজ্য-পানীয় দ্বারা পরিতোষিত হন। আর ঐ অনুষ্ঠান জন্য আনন্দপ্রকাশার্থ দেখা-সাক্ষাৎ-ব্যাপারে সমস্ত নগর আলোড়িত হয়।

বোধ হয়, সেকালে কর্তৃপক্ষীয়েরাও বিবাহিত কর্মচারী অধিক পছন্দ করিতেন। বিবাহিত সিভিলিয়ানদিগকে মাসিক ২০০ দুই শত টাকা অতিরিক্ত দেওয়া হইত; অবিবাহিতদিগের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবার পক্ষে ইহা অল্প প্রলোভন নহে।

সুপ্রসিদ্ধ ওলন্দাজ নৌসেনাধ্যক্ষ স্টাভোরিনস্ ১৭৭৩ অব্দে ইউরোপীয় মহিলা-

দিগের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন : "এক ঝুড়ি রত্নালঙ্কার, এক ঘর অতি সুন্দর পরিচ্ছদ ও তাকের উপর সুসজ্জিত রাজ্যব্যবহারযোগ্য বাসনকোসন, এই সকলের বিনিময়ে গার্হস্থ্য সুখশান্তি ক্রয় করিতে হইবে ; পতি হয় এই সমস্ত দ্রব্য প্রদান করিবেন, নচেৎ তাঁহার গৃহ এতদূর গরম হইয়া পড়িবে যে, তাঁহার তিষ্টান ভার হইয়া উঠিবে ; এদিকে পত্নী কিন্তু গৃহস্থালীর কোনও ব্যাপারেই কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করিবেন না, তিনি দাসদাসীর হস্তে সমস্ত অর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত। যেমন সাহেবেরা সাধারণতঃ ৮টা হইতে ৯টার মধ্যে শয্যাত্যাগ করেন। ১॥০টার সময় মাধ্যাহ্নিক আহার প্রস্তুত হয় ; অনন্তর তাঁহারা ৪॥০ টা বা ৫টা পর্যন্ত নিদ্রা যান, তৎপরে যথারীতি বেশভূষা করেন এবং সায়ংকাল ও রাত্রির কিয়দংশ বন্ধুবান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়া বা নৃত্যোৎসবে যোগদান করিয়া অতিবাহিত করেন ; এই সকল নৃত্যোৎসব শীতকালেই ঘন ঘন হইয়া থাকে। ইহারা বহু নরনারী একত্রে আমোদপ্রমোদ ভালবাসেন। সাধারণতঃ গঙ্গার মনোহর তীরের বা মনোরম বক্ষের উপর এইরূপ আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হইয়া থাকে।" ম্যাকিন্টস্ সাহেব এতদ্দেশীয় ইউরোপীয়দিগের জীবনবৃত্তান্ত এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :

"প্রাতে প্রায় ৭টার সময় তাঁহার (সাহেবের) দরওয়ান ফটক খুলে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সরকারগণ, চাপরাসীগণ, হরকরাগণ, চোবদারগণ, হুঁকাবরদারগণ, খানসামাগণ, কেরাণীগণ ও প্রার্থিগণ দ্বারা বারান্দা পরিপূর্ণ হইয়া যায়। হেডবেহারা ও জমাদার ৮টার সময় হলে ও তাঁহার শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করে। তৎক্ষণাৎ একটি কামিনী তাঁহার পার্শ্ব ত্যাগ করে এবং গুপ্ত সিঁড়ি দিয়া—নয় তাহার নিজ প্রকোষ্ঠে অথবা প্রাঙ্গণের বাহিরে নীত হয়। প্রভু আপনার পদদ্বয় শয্যা হইতে বাহির করিবামাত্র যে সমস্ত লোক তাঁহার জাগরণের প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহারা সকলেই সেই গৃহে প্রবেশ করে এবং দেহ ও মস্তক যথাসম্ভব নত করিয়া ও হস্তাঙ্গুলির অন্তঃপৃষ্ঠ দ্বারা স্ব স্ব ললাটদেশ ও পশ্চাৎপৃষ্ঠ দ্বারা গৃহতল স্পর্শ করিয়া প্রত্যেকে তিনবার সেলাম করে। প্রভু অনুগ্রহপূর্বক হয়ত মস্তক ঈষৎ কম্পিত করেন। অথবা তাঁহার কৃপা ও আশ্রয়প্রার্থীদিগের প্রতি একবার কটাক্ষপাত করেন। অনন্তর তাঁহার লম্বা ঢিলা পাজামা উন্মোচন করা হইলে একটি পরিষ্কার ধপধপে শার্ট, প্যান্টালুন, স্টকিং ও জুতা যথাক্রমে তাঁহার উর্দ্ধাদি, জঙ্ঘায়, পাদদ্বয়ে ও পদতলে পরাইয়া দেওয়া হয়। এই বেশপরিবর্তন ব্যাপারে তিনি কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার করেন না, পুত্তলবৎ নিশ্চেষ্ট থাকেন। এই কার্যে ন্যূনাধিক অর্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। তৎপরে ক্ষৌরকার প্রবেশ করিয়া তাঁহার ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করে, নখ কাটিয়া দেয় ও কর্ণমল কষ্কিার করে (অর্থাৎ 'কাণ দেখে') অতঃপর জনৈক ভৃত্য চিলমচি ও 'মগ্' আনয়ন করে, এবং তাঁহার মস্তকে জল ঢালিয়া দেয়, হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া দেয় ও হস্তে তোয়ালে অর্পণ করে। প্রভু তখন মহাড়ম্বরে প্রাতর্ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করেন ; খানসামা চা প্রস্তুত করিয়া ঢালিয়া দেয় এবং এক প্লেট

রুটি বা 'টোস্ট' প্রদান করে। এই সময়ে কেশ-সংস্কারক পশ্চাদ্দেশে আসিয়া আপনার কাজ আরম্ভ করিয়া দেয়, ওদিকে হুঁকাবরদার হুঁকার (গুড়গুড়ির বা ফরসির) নলের মুখটি প্রভুর হস্তে প্রদান করে। একদিকে কেশ-সংস্কারক আপনার কর্ম করিতে থাকে, অপরদিকে সাহেব পর্যায়ক্রমে ভোজন, পান ও ধূমপান করিতে থাকেন। ক্রমে তাঁহার মুৎসুদ্দী বিনীতভাবে সেলাম করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং অন্যান্য অনুচর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক নিকটে গমন করে। প্রার্থীদিগের মধ্যে দুই একজন নামজাদা লোক থাকিলে, তাঁহাদিগকে বসিবার জন্য চেয়ার দেওয়া হয়। এই সমস্ত ব্যাপার প্রায় ১০টা পর্যন্ত চলিতে থাকে। অতঃপর প্রভু অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া পাল্কীর ভিতর প্রবেশ করেন, এবং তাঁহার অগ্রে অগ্রে ৮ হইতে ১২ জন চোবদার, হরকরা ও চাপরাশী স্ব স্ব পদের পরিচায়ক চিহ্ন এবং ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পাগড়ি ও কোমরবন্দ-বিশিষ্ট বিশেষ বিশেষ প্রকারের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া এক প্রকার লাফাইয়া লাফাইয়া ছুটিতে থাকে; তাহারা প্রভুর কিছুমাত্র অসুবিধা না জন্মাইয়া মধ্যে মধ্যে কাঁধ বদল করে। প্রভুর যদি বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে চাপরাসীরা অগ্রগামী হইয়া বেহারাদিগকে পথ প্রদর্শন করে; আর যদি আফিসে কাজ থাকায় তাঁহার উপস্থিতিমাত্র আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তিনি তথায় দর্শন দেন এবং বেলা ২টা পর্যন্ত কাজকর্ম করেন। অতঃপর প্রভু সদলবলে যথেচ্ছ পরিচ্ছদে উপাদেয় মাধ্যাহ্নিক আহারে বসিয়া যান,—পরিচর্যার জন্য প্রত্যেকেরই স্ব স্ব ভৃত্য উপস্থিত থাকে। ইহার পর, মহিলাদিগের উপস্থিতি স্বত্বেও, মদ্যসহ গেলাস আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র হুঁকাবরদারের প্রত্যেকে এক-একটি হুঁকা লইয়া প্রবেশ করে এবং স্ব স্ব প্রভুর হস্তে নল প্রদান করিয়া পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া থাকে ও আগুনে ফুঁ দিতে থাকে। বন্ধুবান্ধবেরা অপর নৈশভোজনে ফিরিয়া আসিবেন এইরূপ আশা থাকায়, তাঁহারা শিষ্টাচারবর্জিত হইয়া অপসৃত হইতে থাকেন ও নিজ নিজ পাল্কীতে প্রবেশ করেন। সুতরাং কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রভু শয়ন-মন্দিরে যাইবার অবসরপ্রাপ্ত হন। তথায় প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার শার্ট পর্যন্ত সমস্ত পরিচ্ছদই খুলিয়া লওয়া হয় ও লম্বা ঢিলা পাজামা পরাইয়া দেওয়া হয়। তখন তিনি শয্যায় শয়ন করেন ও রাত্রি ৭টা ৮টা পর্যন্ত নিদ্রা যান। তৎপরে পূর্বকথিত অনুষ্ঠানগুলি পুনরনুষ্ঠিত হয় এবং প্রাতঃকালের ন্যায় সর্বপ্রকার পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ পরাইয়া দেওয়া হয়। এই সময়ে হুঁকাবরদার আসিয়া নলটি তাঁহার হাতে দেয়। তিনি চা খাইবার টেবিলে উপবিষ্ট হন, ওদিকে কেশ-সংস্কারক আসিয়া আপনার কর্তব্য করিতে থাকে। চা খাইবার পর তিনি একটি সুরম্য কোর্ট পরিধান করেন এবং মহিলাদিগকে শিষ্টাচারসূচক দর্শনদানে গমন করেন। অতঃপর তিনি ১০টার কিঞ্চিৎ পূর্বে প্রত্যাগত হন, কারণ ১০টার সময় নৈশ আহার পরিবেশিত হইয়া থাকে। আহারার্থ সমবেত বন্ধুবান্ধবদল রাত্রি ১২টা ১টা পর্যন্ত তথায় থাকেন

এবং যথাসম্ভব ধীরতা ও ভদ্রতা রক্ষা করেন। অনন্তর তাঁহারা প্রস্থান করিলে প্রভু শয়নমন্দিরে নীত হন। তথায় তিনি দেখিতে পান যে, একটি সঙ্গিনী তাঁহাকে আমোদিত করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে ; তাঁহার সহবাসে প্রভু প্রাতে ৭টা ৮টা পর্যন্ত অতিবাহিত করেন। ইহা অপেক্ষা কিছুমাত্র অধিক ক্লেশ স্বীকার না করিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা অগাধ ধন সঞ্চয় করিয়া থাকেন। সে সময়ে সামান্য কেরাণী হইতে স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল পর্যন্ত সকল শ্রেণীর মধ্যে ও সর্বত্র হুঁকার সমধিক প্রচলন ছিল। গভর্ণর জেনারেল ও তৎপত্নী কর্তৃক প্রচারিত একখানি নিমন্ত্রণ-পত্রের মর্ম এস্থলে প্রদত্ত হইল। তাহা হইতেই এ কথাটি প্রতিপন্ন হইবে।

"মিস্টার ও মিসেস হেস্টিংস......কে অভিবাদন জানাইতেছেন এবং প্রার্থনা করিতেছেন যে, আগামী বৃহস্পতিবারে মিসেস হেস্টিংসের শহরের বাটিতে যে কন্সার্ট ও নৈশভোজ হইবে, তাহাতে তিনি অনুগ্রহ করিয়া উপস্থিত হইবেন। ১লা অক্টোবর, ১৭৭৯।

কন্সার্ট আটটার সময় আরম্ভ হইবে। মিস্টার......কে অনুরোধ করা যাইতেছে, যে, তিনি যেন আপনার হুঁকাবরদার ব্যতীত অপর কোনও ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া না আসেন।

ওয়াল্টার হ্যামিল্টন বলেন, তদানীন্তন কলিকাতাবাসী ইউরোপীয়দিগের মধ্যে প্রাতঃকালের শীতল বায়ু সেবন করিবার নিমিত্ত প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করার প্রথা প্রচলিত ছিল, কারণ সূর্যোদয়ের পূর্বে বায়ু বিলক্ষণ মনোরম থাকে। বর্তমান সার্কুলার রোড ও পেরিনের বাগান * প্রভৃতি স্থানগুলি এক সময়ে শৌখীন-দিগের বিচরণ-স্থল ছিল। অধুনা গোল-দীঘি নামে খ্যাত 'মেছোপুকুর' ও চাঁদপাল ঘাট এতদুভয়ের মধ্যবর্তী আরও কতকগুলি প্রিয় বিহার-ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। পদব্রজে বেড়াইবার প্রথাও প্রচলিত ছিল। কথিত আছে যে, সার উইলিয়াম জোন্স তাঁহার খিদিরপুরের বাড়ী হইতে প্রতিদিন ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটের নিকটস্থ সুপ্রীম কোর্টে হাঁটিয়া যাইতেন† তৎকালে গভর্ণর এবং গভর্ণ-মেণ্টের মেম্বরগণ শোভাযাত্রার আকারে সজ্জিত হইয়া প্রতি রবিবারে গির্জায় হাঁটিয়া যাইতেন। পরন্তু কলিকাতার অদূরস্থিত একটি সুন্দর ঘোড়দৌড়ের

---

* পেরিনের বাগান বর্তমান বাগবাজারের নিকটে কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল। হলওয়েল সাহেব ১৭৫২ অব্দে উহা বিক্রয় করিয়া ফেলেন।

† ইউরোপীয় অধিবাসীদিগের প্রাতে ও সায়াহ্নে পাদচারণার্থ "রেম্পার্-সিয়া ওয়াক" একটি অতি প্রিয় স্থান ছিল। সায়াহ্ন ৫টা হইতে ৮টা পর্যন্ত কেবলমাত্র ইউরোপীয়দিগেরই তথায় বিহারের অধিকার ছিল। ঐ সময়ে দেশীয় লোকদিগের তথায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এই নিয়ম যথাযথভাবে প্রতিপালন করাইবার জন্য কপাটে পোলের নিকট শান্ত্রী (প্রহরী) থাকিত। এই বিহার স্থানটি চাঁদপালঘাট ও দুর্গ এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল।

মাঠই ব্যায়ামের অর্থাৎ গাড়ীর ভিতর বসিয়া ঝিমাইবার প্রসিদ্ধ স্থান ছিল,—উহা প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে হাওয়া খাওয়ার এক প্রকার শৌখীনের মেলা ছিল,—তথায় "লোকের উদরে একগ্রাস হাওয়া প্রবেশ করিতে না করিতে দশ গ্রাস ধূলি প্রবেশ করিত, কারণ তৎকালে ঐ রাস্তায় জল দেওয়া হইত না।"

কলিকাতার সাহেব-সমাজ তৎকালে শৌখীন স্ত্রীপুরুষে পূর্ণ ছিল,—আমোদ-প্রমোদেরও কিছুমাত্র অভাব ছিল না। বর্তমান সময়ের ন্যায় তখনও বিলিয়ার্ড একটি অতি প্রীতিদায়ক ক্রীড়া মধ্যে পরিগণিত ছিল। এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন,—"যে টাকার হারজিত হয়, তাহা শুনিলে শোণিত দারুণ উত্তপ্ত হইয়া উঠে। সাধারণ গৃহস্থালয়ে বিলিয়ার্ড খেলিবার ঘরটি এক প্রকার রাজভবন তুল্য। কফি-হাউসে আট আনা দিলেই তুমি কয়েক ঘণ্টার জন্য বাতির আলোকে সানুচর টেবিল পাইবে,—প্রত্যেক কফি-হাউসেই অন্ততঃ দুইটি করিয়া টেবিল আছে; সুতরাং স্ফূর্তিযুক্ত লোকেরা এখানেও ইউরোপীয়দিগের ন্যায় আমোদ-প্রমোদ করিবার নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা পাইয়া থাকে। সেলবিটির ক্লাব একটা বিখ্যাত জুয়াখেলার আড্ডা ছিল; কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস্ অতি কঠোরতার সহিত প্রকাশ্যে জুয়া খেলা নিবারণ করিয়া দেন।" মিসেস ফ্রে তাস খেলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: "চা খাওয়ার পর ১০টা পর্যন্ত হয় তাসে, না হয় গীতবাদ্যে কাটিয়া যায়, এবং ১১টার সময় নৈশ ভোজন ব্যাপার সম্পন্ন হয়। তাস খেলার মধ্যে ফাইভ্ কার্ডলু সমধিক প্রচলিত, তাহাতে ১ টাকা হইতে ১০ টাকা পর্যন্ত বাজি ধরা হয়। এটা তোমার নিকট অত্যন্ত অধিক বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু এখানে উহা কেহ গ্রাহ্যই করে না। 'ট্রিডিল' ও 'হুইস্ট' খেলারও খুব প্রচলন আছে, কিন্তু মহিলারা শেষোক্ত খেলায় অতি কদাচিৎ যোগদান করেন, কারণ উহাতে বাজির পরিমাণ সাধারণতঃ খুব অধিক না হইলেও পুরুষদিগের মধ্যে অনেক সময়ে বাজি অনেক চড়িয়া যায়, সুতরাং যাঁহারা কেবল আমোদের জন্য খেলায় বসেন, তাঁহারা এই আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন, পাছে তাঁহাদের ভ্রমে অন্যান্য লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সাপ-নৌকা নামক সুদীর্ঘ নয়নমনোহর তরণীতে বাদ্যকরসম্প্রদায় সহ প্রধানতঃ সায়ংকালে নৌকাবিহার করিবার প্রথা সমধিক প্রচলিত ছিল। সাহেবদের আপন আপন প্রমোদ-তরী ছিল; তাঁহারা সময়ে সময়ে বন্ধুবান্ধব-গণকে লইয়া ঐ সকল তরীতে চন্দ্রনগর বা শুকসাগরে প্রমোদবিহারে যাইতেন। ইংরেজ ও ওলন্দাজ উভয় জাতিই বন্ধুবান্ধবগণকে লইয়া সদলবলে আমোদ করিতে ভালবাসিতেন এবং গঙ্গার সুরম্য তীরে ও মনোহর বক্ষে ঐরূপ আমোদের অনুষ্ঠান করিতেন। স্টাভোরিনস্ ১৭৭০ অব্দে লিখিয়াছেন: ময়ূর-পঙ্ক্ষী নামে আর এক প্রকার নৌকা এ দেশে প্রচলিত আছে; উহার গঠনপ্রণালী অতি বিচিত্র। এই সকল নৌকা সাতিশয় দীর্ঘ ও স্বল্পবিস্তার হইয়া থাকে,—সময়ে সময়ে এক একখানি দৈর্ঘ্যে ১০০ ফুটেরও অধিক হয়,

অথচ বিস্তারে ৮ ফুটের অধিক নয়। এই সমস্ত নৌকা ক্ষেপণি-সাহায্যে চালিত হয়,—কোন কোন নৌকায় ৪০ জন দাঁড়ী থাকে। পশ্চাৎস্থিত একটি সুবৃহৎ কর্ণ দ্বারা ইহাদের গতিমুখ নিয়মিত হয়; ঐ কর্ণ কখনও ময়ূরের, কখনও বা অন্ত জন্তুর আকারে গঠিত হয়। একব্যক্তি দণ্ডায়মান থাকিয়া এবং সময়ে সময়ে বৃক্ষশালা সঞ্চালন করিয়া ক্ষেপণি-চালকদিগকে পরিচালিত করে এবং তাহাদিগকে হাসাইবার বা অধিক পরিশ্রম করাইবার নিমিত্ত নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি করিতে ও গল্প বলিতে থাকে। নৌকার পশ্চাদ্ভাগে এক স্থানে স্তম্ভোপরি স্থিত একটি ছাদ থাকে; তরী-স্বামী বন্ধুবান্ধবগণ সহ তদুপরি উপবিষ্ট থাকিয়া স্নিগ্ধ সান্ধ্যসমীরণ সেবন করেন। এই সকল নৌকা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, কারণ এগুলি অতি সুন্দর রঙ্-করা ও গিল্টি করা নানা প্রকার অলঙ্কারে সুসজ্জিত হয়, এবং ঐ সমস্ত সজ্জা অতি উজ্জ্বলভাবে বার্ণিশ করা হয় ও তাহাতে বিলক্ষণ সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়।” ওয়ারেন্ হেস্টিংসের কলিকাতা পরিত্যাগ কালীন তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, “তাঁহাদের বজরা নানা প্রকার ভক্ষ্য বস্তুতে ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যে পূর্ণ হইল, উহাদের উপর নিশান উড়িতে লাগিল ও বাদ্যকর-সম্প্রদায়গণ সুমধুর ঐকতান বাদ্য করিতে লাগিল; এইরূপে সজ্জিত হইয়া তাঁহারা নদীর মোহনাস্থিত ‘সাগর’ পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। লর্ড ভ্যালেন্সিয়া ১৮০৩ অব্দে লিখিয়াছেন যে, তিনি লর্ড ওয়েলেস্‌লির সরকারী বজরায় নদী দিয়া আসিয়াছিলেন; ঐ বজরা হরিৎ ও স্বর্ণ বর্ণে অতি মনোহর রূপে ভূষিত ছিল, উহার শিরোদেশে একটা গিল্টিকরা বিস্তৃতপক্ষ ঈগল এবং পশ্চাদ্ভাগে একটা ব্যাঘ্রের মস্তক ও দেহ শোভা পাইতেছিল; উহার মধ্যস্থলে ২০ জন লোক সচ্ছন্দে থাকিতে পারে।”

আসল কথা এই যে, সেই ধূলিময় পথটিই শকটপরিচালনের একমাত্র রাস্তা ছিল; গঙ্গার ধার দিয়া রাস্তা ছিল না, শহরের বাহিরেও শকটপরিচালনপথ ছিল না; কাজেই তাঁহাদিগকে নদীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। ঘোড়দৌড়টা প্রাচীন কলিকাতার লোকের একটা বিশেষ প্রিয় পদার্থ ছিল। * খিদিরপুরে গার্ডেন রীচের নীচে একটা ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছিল; তদ্ব্যতীত কলিকাতার ময়দানেও একটা ছিল। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে একটা ২০০০ টাকার চাঁদায় প্লেটের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল, এবং তাহাতে কথিত হইয়াছিল যে, সাহেব খানসামারা কলিকাতার ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও মহিলাদিগকে ঘোড়দৌড়ের অবসানে একটি ‘বল্’ দিবে। শিকারের আমোদও যেরূপ, ঘোড়দৌড়ের আমোদও সেইরূপ; উহাতে কেবল যে নিষ্ক্রিয় খাতখনকেরা অঙ্গচালনার সুযোগ প্রাপ্ত হইত এরূপ নহে, তদ্ভিন্ন দেশীয়েরাও মহোপকার লাভ

---

* লর্ড ওয়েলেস্‌লি কিছুদিন কলিকাতায় ঘোড়দৌড় রহিত করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু রেনি সাহেব বলেন—“গভর্ণর জেনারেলের ভ্রূকুটি সত্ত্বেও কোন কোন কৌতুকপ্রিয় কৌশলে উহার যোগাড় করিয়া লইতেন।”

করিত, কারণ তৎকালে কলিকাতার উপকণ্ঠভাগে চিতাবাঘের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব থাকায় দেশীয় লোকদিগের অনেকেই বন্য জন্তুর হস্তে মারা পড়িত। শূকর শিকারই অতি প্রিয় আমোদ ছিল এবং তদুদ্দেশ্যে বিগত শতাব্দীতে কলিকাতায় ১৫ মাইল দক্ষিণস্থ বকরা নামক স্থানই মনোনীত হইত।

স্ফূর্তিখেলার তখন বড়ই বেশী প্রচলন ছিল। শৌখীন সমাজ ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাটবাজার করিতেও ভালবাসিত। এ সম্বন্ধে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন: "সাহেবদিগের দোকানগুলি, বিলাসিতাসূচকই হউক বা প্রয়োজনীয়ই হউক, নানাপ্রকার ইউরোপীয় পণ্যের ভাণ্ডারস্বরূপ, এবং নিষ্কর্মা ও শৌখীনদিগের প্রত্যূষে মিলনস্থল; ইহারা তথায় মিলিত হইয়া দিবসের কুৎসা প্রচার করিতে থাকে এবং অতি উচ্চ মূল্যে পিঞ্চেন্ বেক্ সাহেবের খেলনা বা ট্যাভিস্টক্ স্ট্রীটের স্বল্পমূল্য অকিঞ্চিৎকর ভূষণ ক্রয় করে। পরিচ্ছদ প্রস্তুতকারক দরজিরা পূর্বকালে প্রচুর লাভ করিত। মার্টিন নামক একজন দরজির বিষয় উল্লিখিত আছে যে, সে ১০ বৎসর কাজ করার পর দুই লক্ষ টাকা লইয়া ইউরোপে প্রতিগমন করে। মহিলাদিগের পরিচ্ছদ প্রস্তুতকারিণীরাও অতি প্রাচীন কাল হইতে কলিকাতায় বসবাস করিতেছে। কলিকাতার মহিলারা লণ্ডনের মহিলাদিগেরই ন্যায় বেশভূষা করিত, প্রভেদের মধ্যে এই যে, ইহাদের ফ্যাশন্ বৎসর খানেকের মধ্যে পুরাতন হইয়া পড়িত।

ইউরোপীয় শব-সৎকার-সাধকদিগের ব্যবসায়ও বিলক্ষণ লাভজনক ছিল: এমন কি এক একটি বর্ষাকালেই ৫০,০০০ হাজার টাকা আয় হইত। কথিত আছে যে, ১৭৮০ অব্দে কলিকাতার বাড়ীর উপরতলায় দুইটি কুঠরী এবং একটি হলের ভাড়া ছিল ১৫০ টাকা। সৌখীন অংশে উহার ভাড়া ৩০০ হইতে ৪০০ টাকা পর্যন্ত ছিল। 'বাংলো' বাড়ীর ভাড়াও ঐরূপ উচ্চ ছিল। কাপ্তেন উইলিয়ামসন্ কয়েক প্রকার খাদ্যদ্রব্যের একটি সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; স্থানাভাববশতঃ এস্থলে তাহার সবিস্তার উল্লেখ করিতে পারা গেল না। কথিত আছে যে, স্টাভোরিনসের সময়ে অর্থাৎ ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বা তৎসমকালে "কলিকাতায় কেবল শীতকালেই মটর, কলাই ও কপি পাওয়া যাইত: গ্রীষ্মকালে কিঞ্চিৎ 'স্পিনেজ' (পূতিকা) ও শশা ব্যতীত অন্য কিছুই পাওয়া যাইত না; কিন্তু ১৭৮০ অব্দে গোল আলু, মটর ও করাসী কলাই অত্যন্ত আদরণীয় হইয়াছিল। কথিত আছে যে, ওলন্দাজেরাই তাহাদের উত্তমাশা অন্তরীপের উপনিবেশ হইতে আলু আনাইয়া এদেশে প্রথম উহার চাষের সৃষ্টি করে।" তাহাদের নিকট হইতে ইংরেজরা বৎসর বৎসর সর্ব আহার্য উদ্ভিদের এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় গাছপালার বীজ লইতেন। তাহারা আমাদিগকে নানাপ্রকার দ্রাক্ষালতাও দিয়াছে; ঐ সকল লতা হইতে অসংখ্য ডালপালা কাটিয়া লইয়া বঙ্গদেশের ও উপর অঞ্চলের সর্বত্র প্রেরিত হইয়াছে। বোধ হয়, ওলন্দাজেরাই ইংরেজদের হৃদয়ে উদ্যানের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার

করিয়া দিয়াছে। চুঁচুড়াতে তাহাদের নিজেরই একটি উদ্যান ছিল; উহা উপর্যুপরি নির্মিত তিনটি প্রস্তরবেদিকার উপর প্রস্তুত হইয়াছিল এবং উহার পশ্চাদ্ভাগে বৃক্ষকুঞ্জসমূহ দণ্ডায়মান ছিল। জিরেটে ফরাসীদেরও একটি অতি সুন্দর বাগান ছিল। ১৮৮০ অব্দে হিকির গেজেটে নানাস্থানের কতকগুলি বাগান-বাড়ীর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, যথা—বৈঠকখানায়, বালিগঞ্জে, টালায়, কমোডোর রিচার্ডসনের বাগানবাড়ী, রসাপাগলার ডনক্যান্ সোর নামক স্থানে অতি মনোহরভাবে অবস্থিত। জন্ রেলের বাগানবাড়ী, চৌরঙ্গিতে সিপাহী বারিকের পূর্বদিকে ও লবণ-জলের হ্রদে যাইবার প্রধান রাস্তা হইতে ৪০০ গজ দূরে অবস্থিত; আলিপুরের নিকট কুলপি রোডের উপর অবস্থিত একটি হল, তিনটি কুঠরা ও দুইটি বারান্দাবিশিষ্ট একটি বাগানবাড়ী। ক্রফ্‌ট সাহেব গভর্ণর জেনারেল (ওয়ারেন্ হেস্টিংস) ও তৎপত্নী এবং আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ ভদ্রলোককে নিজের শুকসাগরস্থ বাগানে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন; উহা এক্ষণে নদীগর্ভে নিমজ্জিত।

সেকালে সাহেবদিগের মধ্যে পদভেদে মর্যাদাভেদের অত্যন্ত প্রাবল্য ছিল। কথিত আছে যে, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কই প্রথম এই অবস্থার বিপর্যয় ঘটান। গভর্ণমেণ্ট হাউসে তিনি যে সমস্ত লেভি (দরবার) করিতেন, তাহাতে সমাজের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিতেন; ইহাতে সিভিলিয়ান্ ও কৌলীন্যাভিমানী অন্যান্য সাহেবেরা নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেন। মিসেস্ কিণ্ডার্সলি নিজ ভ্রমণবৃত্তান্তে (১৭৬০-১৭৬৮) লিখিয়াছেন: "ভারতীয় ইংরেজ পরস্পরের সাহায্যার্থ যেমন অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন, ভূমণ্ডলের আর কোন অংশেই লোকে তদ্রূপ করে না।" বস্তুতঃ এ কথাটি অদ্যাপি বিশিষ্টরূপে সত্য। অত বড় সুপণ্ডিত যে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার তিনিও ভারতীয় ইংরেজদিগের স্বজাতি-প্রেমে বিস্ময়বিমূঢ় হইয়াছিলেন।

তদানীন্তন ভারতীয় ইংরেজদিগের আতিথেয়তার কথা বহু পর্যটক বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতা-সহকারে খ্যাপন করিয়াছেন। কথিত আছে যে, যাঁহার বাটিতে আতিথ্য গ্রহণ করা যায়, তাঁহার অর্থ ও ভৃত্যবর্গ অতিথির ইচ্ছাধীন। এ সম্বন্ধে এক ব্যক্তি পশ্চাল্লিখিতরূপ কৌতুকাবহ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: প্রাতরাশটিই একমাত্র সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন আহার,—স্ব স্ব রুচি অনুসারে যাহার যাহা ভাল লাগে, সে তাহারই হুকুম করে, পক্ষান্তরে মাধ্যাহ্নিক আহার, চা ও নৈশ আহার যেন এক এক প্রকার রাজকীয় লেভি। ১২টার সময় একটা আহারের ব্যবস্থা হয়; তাহাতে পর্য্যুষিত শূকরমাংস, কুক্কুটশাবক, এবং একপ্রকার শীতল সুরামিশ্রিত শরবত থাকে। ১০টার সময় লঘু নৈশ আহারের ব্যবস্থা, তৎসহ দুই এক গেলাস অনুগ্র সুরা, রুটি পিষ্টকাদির ছিলকা ও পনীর; তৎপরে ১১টার সময় হুঁকা ও শয্যা। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিবসে কতকগুলি লোককে ওল্ড্ কোর্ট হাউসে বেলা ৩৷০ টার সময় মাধ্যাহ্নিক

আহারে নিমন্ত্রণ করেন। কূর্ম ও পেরু নিমন্ত্রিতদিগের রসনা জলসিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। রাত্রি ৯৷৷০ টায় একটি 'বল্‌' নাচের ব্যবস্থা হইয়াছিল। রাত্রি ১০টায় নৈশ আহারের ব্যবস্থা হয় ও প্রত্যুষে ৪টায় মজলিস ভাঙ্গিয়া যায়।

পানীয় সম্বন্ধে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন: নিত্য প্রয়োজনীয় সাংসারিক দ্রব্য-জাতের মধ্যে মদ্যই সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যয়সাধ্য, কারণ প্রচলিত রীতি বলিয়াই হউক, অথবা ঔষধরূপেই হউক, সামান্য ভৃত্য পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রতিদিন এক এক বোতল মদ্য পান করে, আর ভদ্রলোকেরা তাহার চতুর্গুণ পান করেন। বীয়ার ও পোর্টার পিত্তজনক বিবেচিত হওয়ায় অতি অল্পই ব্যবহৃত হইত। ম্যাডীরা ও ক্ল্যারেট এই দুইটিই অতি প্রিয় পানীয় ছিল, তবে সাইডার এবং পেরিও কখন কখন পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইত। মহিলারা প্রতিদিন এক এক বোতল ক্ল্যারেট পান করিতেন, আর ভদ্র সাহেবরা পাঁচ টাকা বোতলের তিন-চারি বোতল খাইয়া ফেলিতেন। ২০ বৎসর পূর্বে যখন কতকগুলি লোক মফঃস্বল অঞ্চলে প্রত্যহ এক ডজন বীয়ার খাইয়াও কিছু হইল না বলিয়া মনে করিত, সে বীয়ার-পান-প্রবৃত্তি অপেক্ষাও ইহা বহুগুণে নিকৃষ্ট। দেশী বীয়ার নামে আর এক প্রকার পানীয়ের প্রচলন ছিল। এতৎসম্বন্ধে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন: "আহারের সময়ে কৃত্রিম উপায়ে শীতলীকৃত মদ্য পান করা হইয়া থাকে বটে, তথাপি গ্রীষ্মঋতুর উপযোগী দেশী বীয়ার নামক এক প্রকার উপাদেয় পানীয় সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্ততঃ এরূপ সময়ে বিশেষতঃ 'কালিয়া' ভোজনের পর, এতাদৃশ তৃপ্তিজনক পানীয় আর নাই। সমগ্র পানীয়ের এক-পঞ্চমাংশ পোর্টার বা বীয়ার, এক গ্লাস তাড়ি, কিঞ্চিৎ খাঁড় গুড় এবং একটু আদা বাটা অথবা কমলালেবুর বা পাতিলেবুর শুষ্ক খোসা এই কয়েকটি দ্রব একত্রে মিশ্রিত করিয়া দেশী বীয়ার প্রস্তুত করা হয়।"

গৃহসজ্জা সম্বন্ধে মিসেস কিণ্ডার্সলি লিখিয়াছেন: "গৃহসজ্জা যারপরনাই দুর্মূল্য এবং এখানে পাওয়াও দুঃসাধ্য; সেইজন্য এমন একটি প্রকোষ্ঠ দেখা যায় না যে, তাহার সমস্ত সজ্জা একজাতীয় হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা আপনাদের গৃহসজ্জা ইউরোপীয় জাহাজের বা চীনদেশ হইতে আগত জাহাজের কাপ্তেনদিগের নিকট হইতে যে কোনও প্রকারে সংগ্রহ করিত, অথবা দেশীয় আনাড়ি সূত্রধর-দিগের দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া লইত, কিংবা বোম্বাই হইতে আনাইয়া লইতে বাধ্য হইত; কিন্তু বোম্বাই হইতে আনাইতে হইলে আদেশ দিবার তিন বৎসর পরে তাহা আসিয়া উপস্থিত হয়।"

কাঁচের জানালা তখন অত্যন্ত দুর্মূল্য ছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস ও তাঁহার ন্যায় অত্যল্পসংখ্যক লোকেরই কাঁচের জানালা ছিল।

খ্রীষ্টোৎসব (বড়দিন) সম্বন্ধে মিসেস্‌ ফে. লিখিয়াছেন: "এখানে খ্রীষ্টোৎসব উহার সর্বপ্রকার প্রাচীন আমোদ-প্রমোদের সহিত পালিত হইয়া থাকে। উৎসবের দিন ইংরেজ ভদ্রলোকের বাসভবনের বাহ্য দৃশ্য এরূপ নবভাব ধারণ করে

যে, তাহাতে মন আনন্দরসে নিমগ্ন হয়। প্রধান প্রধান প্রবেশদ্বারের উভয় পার্শ্বে বড় বড় কদলী বৃক্ষ স্থাপিত হয়, এবং তোরণ ও স্তম্ভগুলি মনোহরভাবে বিন্যস্ত পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইয়া অতি সুন্দর দৃশ্য প্রদর্শন করে। মুৎসুদ্দী হইতে অতি সামান্য চাকর পর্যন্ত সকল ভৃত্যই উপঢৌকনস্বরূপ মৎস্য ও ফল আনয়ন করে। সত্য বটে, অনেক স্থলে এই সকল উপঢৌকনের প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা হয় তো অধিক আমাদিগকে প্রতিদান করিতে হয়; কিন্তু তথাপি ইহা আমাদের বড়দিনের সম্মানের চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। নগরের ভদ্র সাহেব-দিগকে বড়লাটের প্রাসাদে একটি সরকারী 'খানা' দেওয়া হয়, এবং মেমসাহেবদের জন্য সায়ংকালে একটি সুন্দর 'বল্ নাচ' ও নৈশ ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। ইংরেজী বৎসরের প্রথম দিবসে (বর্ষ-প্রবেশ-উৎসবে) এবং রাজার জন্মদিনোৎসবে এই সমস্ত ব্যাপার পুনরনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পর্তুগীজ ভৃত্যদিগের প্রভাবে যে এই ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ ঐ জাতি ধর্মোৎসব সম্পর্কে আড়ম্বর ও জাঁকজমক দেখাইতে ভালবাসে। ১৭৮০ অব্দের বড়দিনে প্রাতঃকালে তোপ দাগিয়া উহার সূচনা করা হয়; গভর্ণর জেনারেল কোর্ট হাউসে একটি প্রাতঃভোজ এবং মধ্যাহ্নে একটি উপাদেয় 'খানা' দেন; সেই খানার সময়ে লালদীঘির সুবৃহৎ তোপখানা হইতে রাজসম্মানার্থ অনেকগুলি তোপ দাগা হয় এবং প্রত্যেকবার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে এক এক 'বখা পেয়ালা লাল শরাব' পান করা হয়। সায়াহ্নে একটি 'বল্' নাচের অনুষ্ঠান হইয়া উৎসবের অবসান হয়।"

পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে কেবলমাত্র গভর্ণর এবং কাউন্সিলের প্রাচীনতম সদস্য গাড়ী* ব্যবহার করিতেন। এখনকার মত পাকা রাস্তা অতি অল্পই ছিল; তাহার উপর দিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে ও আরামে গাড়ী হাঁকান যাইতে পারিত না। যে কয়েকটি রাস্তা ছিল, তাহা ধর্মের ষাঁড়, উষ্ট্র ও হস্তীতে পূর্ণ থাকিত। উল্লিখিত আছে যে, ১৮০৫ অব্দ পর্যন্ত কলিকাতার রাস্তায় হস্তী চলিতে দেওয়া হইত।†

---

* পাদরি লঙ্ সাহেব বলেন,—যে কিরাঞ্চি গাড়ীর অধুনা এত অনাদর তাহাই দেশীয় ভদ্রলোকদিগের শৌখীন যান ছিল; ইহা ইংরেজদিগের প্রাচীন পারিবারিক কোচ গাড়ীর অনুকরণ।" আরও কয়েক প্রকার গাড়ী সে সময়ে প্রচলিত ছিল।

† ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে লিখিত আছে:

"কয়েক সপ্তাহ হইল, হাটেন্‌ম্যান্ সাহেব স্বীয় পত্নী ও তিনটি সন্তান সমভিব্যাহারে একখানি গাড়ীতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। তাঁহারা এস্‌প্ল্যানেড রো নামক স্থানে পুষ্করিণীর অপর দিকে একটি হস্তী দেখিতে পাইলেন, হাতী দেখিয়া ঘোড়া দুইটি খেপিয়া গেল এবং গাড়ীখানা ব্র্যাডি সাহেবের বাড়ীর সন্নিহিত শিকলের উপর লইয়া ফেলিল; তাহাতে গাড়ী উল্টাইয়া গেল।"

পাল্কিই সুবিধাজনক যানরূপে সমধিক ব্যবহৃত হইত। স্টার্ণডেল সাহেব লিখিয়াছেন যে, পাল্কিবাহকেরা চৌরঙ্গি যাইতে হইলে দ্বিগুণ ভাড়া চাহিত, কারণ চৌরঙ্গি তখন শহরের বাহির বলিয়া বিবেচিত হইত।

স্টার্ণডেল সাহেব লিখিয়াছেন : "এক শতাব্দী পূর্বে এক বিষয়ে কলিকাতার অবস্থা বর্তমান সময় অপেক্ষা ভাল ছিল।" তিনি কলিকাতার আটটি হোটেলের অস্তিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা—(১) লণ্ডন, (২) হার্মনিক,—বর্তমান পুলিশ কোর্টের বাটী ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে ; (৩) ইউনিয়ন্, (৪) সেণ্ট পলস্ গীর্জার নিকট রাইটের নিউ ট্যাভার্ণ, (৫) কলিকাতা এক্সচেঞ্জ, (৬) ক্রাউন্ এণ্ড য়্যাঙ্কর,—বর্তমান এক্সচেঞ্জ বাটী, (৭) বেয়ার্ডের হোটেল, এবং ডেকার্স লেনে মুরের ট্যাভার্ণ (ডেকার্স লেন সে-সময়ে একটি শৌখীন অঞ্চল বলিয়া গণ্য ছিল)। গ্যালে নামক ফরাসীয় ট্যাভার্ণ প্রাতঃরাশ ও অন্যান্য প্রকার খানার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এতদ্ব্যতীত, ১৮০০ অব্দে ১১টি "পঞ্চ-হাউস" (একপ্রকার শুঁড়িখানা) ছিল, এবং নানা দেশীয় কয়েকজন সাহেব নাবিকদিগের ও অন্যান্য লোকের নিমিত্ত সহরের নানাস্থানে ভোজনালয় ও বাসবাটি স্থাপন করে। এই সমস্ত আড্ডায় বিলিয়ার্ড খেলিবার টেবিল রাখা হইত এবং বীয়ার, লেমনেড প্রভৃতি নামে নানাপ্রকার মদ্য বিক্রয় করা হইত।

কথিত আছে যে, সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের পূর্বে তথায় একটি থিয়েটার ছিল ; সিরাজ ও তাঁহার সৈন্যগণ পূর্বতন দুর্গ আক্রমণ করিবার নিমিত্ত থিয়েটারটিকে তোপখানায় পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭৭৫-৭৬ অব্দে সাধারণের চাঁদায় উহা পুনর্নির্মিত হয়। চাঁদাদাতাদিগের মধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস, জেনারেল মন্সন, রিচার্ড বারওয়েল, সার ইলাইজা ইম্পে প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। সাধারণতঃ সখের অভিনেতারাই এই থিয়েটারে অভিনয় কার্য্য সম্পন্ন করিত। ইহার সহিত একটা বল্ নাচের ঘরও সংলগ্ন ছিল। নাচ সম্বন্ধে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন :

"আমার নিজের কথা বলিতে হইলে, আমার যেন মনে হয়, ইউরোপীয় সুন্দরীদিগের গণ্ডদেশ হইতে স্বাভাবিক গোলাপী রঙ্ বিদূরিত হইয়া তৎপরিবর্তে যে মলিন পাণ্ডুবর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহা অপেক্ষা তাম্রবর্ণ বদনের সমুজ্জ্বল দীপ্তি লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ ; আর এখানকার ইউরোপীয় সুন্দরদিগের মুখের বর্ণ দেখিলে কবর হইতে উত্থিত ল্যাজেরসের কথা মনে পড়ে। ইংরেজ-রমণীরা অতিরিক্ত নৃত্যপ্রিয় ; প্রখর-গ্রীষ্ম-তাপিত বঙ্গদেশের পক্ষে এরূপ অঙ্গচালনা একান্ত অনুপযোগী। আমার মতে, অপেক্ষাকৃত শীতল দেশের পক্ষে ইহা যতই উপযোগী হউক না কেন, যে দেশের লোক ভদ্রতার অনুরোধে যাহা অপরিহার্যরূপে আবশ্যক তদতিরিক্ত বস্ত্রদ্বারা দেহ আবৃত করে না, সে দেশে এরূপ নৃত্যকে কতকটা অশ্লীল বলিয়াই বোধ হয়। কল্পনানেত্রে ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার হৃদয়ের প্রেমপুত্তলি গ্রীষ্ম-তাপে মৃতপ্রায়া, প্রত্যেক অঙ্গ থর থর কাঁপিতেছে, প্রত্যেক প্রত্যঙ্গ শ্রমে

বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, বৃহদাকার স্বেদবিন্দুসমূহ তাঁহার বদনমণ্ডলে মুক্তাকারে সজ্জিত হইয়াছে, আর তাহার নৃত্য-সহযোগী প্রত্যেক হস্তে এক একখানি মস্‌লিন রুমাল লইয়া তাহার মুখমণ্ডল মুছিয়া দিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিতেছে।"

লর্ড ভ্যালেন্‌সিয়া ১৮০৩ অব্দে লিখিয়াছেন;—"কলিকাতায় ক্ষয়কাসের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব; আমার মনে হয়, তাহাদের অবিরাম নৃত্যই ইহার প্রধান কারণ,—দারুণ গ্রীষ্মের সময়েও তো এ নৃত্যের বিরাম নাই; আবার এইরূপ প্রবল অঙ্গচালনার পরই তাহারা বারান্দায় যায় এবং দেহে শীতল সমীরণ সেবন ও আদ্র বায়ু গ্রহণ করে।"

একাদশ অধ্যায়

হিন্দু-সমাজ

অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়টি যেরূপ গুরুতর এবং ইহার সকল তত্ত্বের সম্যক্ অনুধাবন অধুনা যেরূপ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, অন্য কোন বিষয় সেরূপ নহে। দুঃখের বিষয় এই যে, এ বিষয়ের গুরুত্ব সাধারণতঃ স্বীকৃত হয় না। সর্বপ্রকার কুসংস্কার-বর্জিত হইয়া সামাজিক প্রশ্নসমূহের আলোচনা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের সামাজিক গঠন এরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, আমরা যত শীঘ্র এই সমস্ত বিষয়ের ও বর্তমান অবস্থার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, আমাদের সকলের পক্ষে ততই মঙ্গল। ভাবী ঘটনাবলী পূর্বাহ্ণেই আপনাদের ছায়া নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত ছায়া হইতে বিচার করিয়া দেখিলে, যে সকল ইতোমধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে, সেগুলি বস্তুতই অত্যন্ত ভীতিজনক। তাহাতে উন্নতির আভাস কিছুই পাওয়া যায় না। একটা ইংরেজী প্রবাদবাক্য আছে,—'চক্‌চক্ করিলেই সোনা হয় না।' এই বাক্য বর্তমান হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে বেশ খাটে। আরামদায়ক বর্তমান অবস্থা আপাত-মনোরম ও সুখকর বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহার ভাবী ফল শুভজনক হইবে না। সমাজের বর্তমান অবস্থার গুরুতর ভাব সকলেরই হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য। পাশ্চাত্য দেশের তথা-কথিত উৎকৃষ্ট সভ্যতার আড়ম্বর ও প্রখর দীপ্তি আমাদের নয়নকে এমন অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে এবং মনোহর বর্তমান ভাবে আমরা এতদূর বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের সামাজিক জীবনের যাবতীয় গুরুতর প্রশ্নই আমরা নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত মীমাংসা করিয়া ফেলি। হিন্দুসমাজ যে উত্তরোত্তর ভাঙিয়া যাইতেছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। দিন দিন ইহার সংগঠন প্রবল ধাক্কা খাইতেছে। যে বিষম ঝঞ্ঝাবাতে ইহা পর্যুদস্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা কাটাইয়া উঠিতে পারিবে কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ। আমাদের পশ্চাদ্ভাগে নীরবে এক বিষম বিপ্লব চলিতেছে, এবং অতি পুরাকালে যাহা কিছু সংগঠিত ও যুগে যুগে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে, এই বিষম বিপ্লবের প্রবল স্রোতে তাহা ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এই বিপ্লবের প্রকৃতি এবং

ইহার অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্ব পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। এক কথায় বলিতে গেলে, ইহাকে অরাজকতা বলা চলে, এবং ইহার আবশ্যম্ভাবী ফল বিনাশ।

হিন্দুসমাজ আমাদের সম্মুখে যে আদর্শ সংস্থাপন করিয়াছেন, আমরা তাহাতে আর সন্তুষ্ট নহি। যে-কোন বৈদেশিক আদর্শ দেখিয়া আমরা তৎক্ষণাৎ বিমুগ্ধ হইয়া পড়ি, তাহারই অনুসরণ করিবার নিমিত্ত আমরা সর্বপ্রকার কৌশল সাগ্রহে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই ও নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করি। আমাদের মনের ভাবসকল যেন কেমন গুলাইয়া গিয়াছে। সমাজের বন্ধন দিন দিন শিথিল হইতেছে। পরন্তু সাহসের সহিত এই অনিষ্টকর অবস্থার গতিরোধ করিতে হইবে। যেদিন সামাজিক বন্ধনসমূহ অন্তর্হিত হয় এবং লোকে সমাজের প্রতি অনুরাগবিহীন ও সমাজের হিতার্থে কার্য করিবার প্রবৃত্তিহীন হইয়া পড়ে, সেদিন মানুষের সুখের পক্ষে বড়ই দুর্ভাগ্যের দিন। আমাদের এখন সেই দিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। চতুর্দিকে উচ্ছৃঙ্খল ভাবের প্রাবল্য দৃষ্ট হইতেছে। সমাজের একতা ব্যাহত হইয়াছে। স্বাধীনতাবলম্বন প্রবৃত্তির নিন্দা করা আমাদের অভিপ্রায় নহে। সময়ে সময়ে উহাদ্বারা মহৎ কার্য সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সঙ্গে মনুষ্যমাত্রেরই স্বদেশের প্রতি প্রীতি এবং স্বসমাজের আচারব্যবহারের প্রতি অনুরাগ থাকা আবশ্যক। কোন ব্যক্তিই প্রকৃতার্থে বিশ্বাসী হইতে পারে না। প্রত্যেক জাতিরই কতকগুলি বিশেষ ভাব ও প্রকৃতি আছে, তদ্বারা উহাকে অন্যান্য জাতি হইতে পৃথক্ করিয়া চিনিয়া লওয়া যায়। বিশাল মানবজাতির এক মহান্ উদ্দেশ্য সাধন সকল জাতিরই চরম লক্ষ্য বটে এবং তাহারই প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকল জাতি কাষ করিতেছে বটে, তথাপি কিন্তু প্রত্যেক জাতি আপনার অবস্থা ও জ্ঞানের পরিমাণ ও উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে এক এক নির্দিষ্ট পথে কাজ করিয়া যাইতেছে। এই জন্যই পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার আচার-ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি-গত স্বাতন্ত্র্য পাশ্চাত্য জগতে একটি মহৎ গুণ, এ দেশে তাহাই অনেক সময়ে ঘোর স্বার্থপতায় পরিণত হইয়াছে। যে ভোগবিলাসময় জীবনযাপনপ্রণালী পাশ্চাত্য জগতে বহু উৎকর্ষসাধক গুণের উত্তেজক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, আমাদের সম্বন্ধে তাহাই বিপরীত ফল প্রসব করিয়াছে। বিভিন্ন জাতির বিশেষ বিশেষ ভাব কিরূপে উৎপন্ন ও পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহা ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়। উহারা যুগযুগান্তর ধরিয়া নীরবে উৎপন্ন হইয়া আসিয়াছে। এক এক জাতির ধর্ম, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও বৃত্তিব্যবসায় দ্বারা উহারা নির্ধারিত হইয়াছে। উহাদের নির্ধারণ পক্ষে দেশের জল-বায়ুর অবস্থাও সামান্য কারণ নহে। বকল্ সাহেবও ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

জাতিমাত্রেরই নিজের একটি ধর্ম আছে ; সে ধর্মটি তাহার সবিশেষ উপযোগী এবং তাহাতেই সেই জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি। আদি নিবাসীদিগের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রচারেও তাহাদের মধ্যে সভ্যতাবিস্তার হয় নাই। তাহাতে ঐ সকল

অসভ্যজাতির নৈতিক অবস্থা বা জ্ঞান-বুদ্ধি উন্নত করিতে পারে নাই। এই সমস্ত অসভ্য জাতির মধ্যে কেহ কেহ ইউরোপীয়দিগের আচারব্যবহারের অনুকরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা তদনুপাতে কোন বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কথিত আছে যে, ভগবানের আদেশ পালন করিবার নিমিত্ত,—কোনও সুমহান ভাব কার্যে পরিণত করিবার জন্য,—জাতিসমূহের জন্ম হইয়াছে,—অথবা প্রকৃত কথা বলিতে হইলে, তাহারা সেই ভগবান কর্তৃক এই সংসারে প্রেরিত হইয়াছে। সেই সুমহান উদ্দেশ্য তাহাদের যাবতীয় জাতীয় মনোভাব ও কার্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় এবং বিশেষ বিশেষ গুরুতর ব্যাপার উপলক্ষে জাতীয় জীবনে প্রকাশ পায়। হিন্দুর পক্ষে ধর্মই ভগবানের সেই মহদুদ্দেশ্য। এই ধর্ম কথাটির ইংরেজী প্রতিশব্দ নাই, কারণ 'ধর্ম' বলিলে হিন্দু যাহা বুঝে, ইংরেজী কোন শব্দ দ্বারাই তাহা প্রকাশ করা যায় না। হিন্দুর ধর্ম শব্দে যে ভাব বুঝায়, তাহা মানুষের চিন্তায়, বাক্যে ও কার্যে প্রকাশ পায়, এবং যতকাল আত্মার মুক্তি না ঘটে, ততকাল জন্মজন্মান্তর ব্যাপিয়া তাহা প্রকৃতির কার্যকরী শক্তিরূপে তাহার ক্রিয়াসমূহকে নিয়মিত করে। হিন্দু-জাতির বিশেষ গৌরবের বিষয় এই যে, মানুষের মুক্তিলাভের নিমিত্ত ভগবান্ যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তদনুসারে তাহারা অপনাদের নির্দিষ্ট কর্ম সম্পন্ন করিয়াছে। মানুষ যে আত্মোন্নতিসাধনে ভগবান্‌কে আত্মার ভিতর উপলব্ধি করিতে পারে, ইহা তাহারা আপনাদের জীবনে প্রতিপন্ন করিয়াছে, এবং যে পথে চলিলে ভগবানের নিকট উপস্থিত হওয়া যায়, সে-পথ তাহারা উন্মুক্ত করিয়াছে। তাহাদের চরম লক্ষ্য সাধন কল্পে চেষ্টা করিতে করিতে হিন্দুজাতি এমন একটি দার্শনিক তত্ত্ব ও ধর্মের আবিষ্কার করিয়াছে যে, তাহা জগতে অদ্বিতীয়। বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা পর্যবেক্ষণ করিয়াই তাহারা সন্তুষ্ট হয় নাই, প্রত্যুত তাহারা আপনাদের মনোবৃত্তিনিচয় যথাসম্ভব বিকশিত করিয়াছে, এবং সাধারণতঃ 'যোগ' নামে খ্যাত বিশেষ প্রণালী দ্বারা সুস্পষ্ট অন্তর্দর্শনশক্তি লাভ করিয়াছে। এই যোগবলে তাহারা কাল ও স্থানের দূরত্ব বিলুপ্ত করিয়াছে,—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান তাহাদের নিকট মধ্যাহ্নের সূর্যের ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছে।

উচ্চতর নীতিজ্ঞান সহ এই অদ্ভুত শক্তি বিকাশ করিতে সমর্থ হওয়ায় ঋষিরা অবিমিশ্র সুখময় স্থান যে স্বর্গ, তাহাও ত্যাগ করিয়াছেন এবং মানব-জাতির গুরু অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা হইয়াছেন। তাঁহারাই আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতিসাধনের উপযোগী করিয়াছেন। বিশ্বের সমস্তই যে এক ও অদ্বিতীয়, ইহাই হিন্দুদের বিশ্বাস; তাহারা মানুষ ও খনিজ ধাতুতে প্রকৃতপক্ষে কোনও প্রভেদ দেখিতে পায় না, কারণ বিশ্বের যাবৎ বস্তুই সেই অদ্বিতীয় পুরুষের বিকাশমাত্র। এইরূপ জ্ঞানবশতঃ হিন্দুরা সামান্য কীটপতঙ্গ ও বৃক্ষের প্রতি সমভাবে দয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং হিন্দুদের লক্ষ্য অতি উচ্চ হইলেও তাহারা অতি নীচের প্রতি লক্ষ্য রাখারও অত্যাবশ্যকতা

উপলব্ধি করিয়াছে, এবং তদনুসারে যে ধর্মের আবিষ্কার করিয়াছে, তাহা 'সনাতন ধর্ম' অর্থাৎ সর্বকালের উপযোগী ধর্ম নামে অভিহিত হইয়াছে; এই ধর্ম সর্বাবস্থাতেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ। হিন্দুরা ইহাও বিশ্বাস করে যে মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ভগবানকে প্রাপ্ত ও সম্পূর্ণ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে যে অসংখ্য জীবন অতিক্রম করিতে হইবে, বর্তমান জীবন সেই সুদীর্ঘ জীবনশৃঙ্খলের একটি কণা মাত্র; এই হেতু তাহারা সাংসারিক তাবৎ বিষয়কে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করে, এবং চিত্তের প্রশান্ততা রক্ষা করিয়া,—অর্থাৎ সৌভাগ্যগর্বে স্ফীত বা দুর্ভাগ্যদুঃখে ভগ্নোদ্যম না হইয়া—ক্রমাগত আপনাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে যত্নশীল থাকে। হিন্দুদের পাপপুণ্যের ধারণা কিছু বিশেষ রকমের। মানুষের ধর্মের সহিত সংস্রব না থাকিলে কোন কার্যই তাহাদের নিকট পুণ্যজনক বা পাপজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না। মানুষের ধর্মই তাহার উন্নতির অবস্থার পরিচায়ক। ইহা সর্বজনবিদিত যে, জাতিবিশেষ ও ব্যক্তিবিশেষ তাহাদের উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে; আর যে কাজ একের পক্ষে হিতকর তাহাই অন্যের পক্ষে অহিতকর বিবেচিত হইয়া থাকে। ক্রমোন্নতির এই নীতিসূত্রে অবগত থাকায় প্রাচীন ঋষিরা সমগ্র হিন্দুজাতিকে চারি প্রধান ভাগে অর্থাৎ জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

জন্ম দ্বারাই মানুষের জাতি নির্ধারিত হয়; আর হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, মানুষের 'কর্ম' (অর্থাৎ পূর্বজন্মের কার্যাবলী) অনুসারে বিধাতা তাহার জাতি নির্ধারণ করিয়া দেন। হিন্দু জানে, কর্মানুসারে ফলভোগ-নীতি কেবল সাংসারিক বিষয়ে নহে, আধ্যাত্মিক বিষয়েও তুল্যরূপ সত্য। সুতরাং এই কর্মনীতিই হিন্দুধর্মের মূল সূত্র। এই নীতির মর্ম এই যে, কর্ম মাত্রেই (মনের চিন্তা এবং অভিলাষও কর্মের অন্তর্গত) উপযুক্ত ফল প্রসব করে, এবং যত দিন মানুষের কর্মে আসক্তি থাকে, তত দিন সেই ফল তাহাকে ছাড়ে না,—ইহজন্মেই হউক বা পরজন্মেই হউক, সেই কর্মফল তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে। মানুষ ইহজন্মে সুখ বা দুঃখ যাহা কিছু ভোগ করে, তাহার যথোপযুক্ত কারণ আপাততঃ দেখা না গেলেও বুঝিতে হইবে, তাহা উহার পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল। যত দিন কর্মফলে মানুষের আসক্তি থাকে, ততদিন সেই কর্মের ফলভোগ করিবার নিমিত্ত তাহাকে পুনঃপুঃ জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। আসক্তিশূন্য হইয়া অর্থাৎ ফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যখন কর্ম করিতে পারা যাইবে, তখনই কর্ম এবং কর্মকর্তার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবে। আর ইহা করিবার একমাত্র উপায়, নিজের স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞানবর্জিত হওয়া ও আত্মজ্ঞান লাভ করা। এইভাবে কর্ম করিলে তাহার ফল মানুষের নিজের উপর না পড়িয়া সমস্ত বিশ্বের উপর পতিত হয়, সুতরাং অধিকতর কার্যকর হয়। এইরূপ মুক্তিলাভই হিন্দুর চরম লক্ষ্য, এবং হিন্দুশাস্ত্রসমূহ এই মুক্তিলাভের পথ প্রদর্শন করিতেছে। এ বিষয়ের যথোচিত

উপদেশদানই ব্রাহ্মণদিগের প্রধান কর্তব্য, কারণ তাঁহারা যেভাবে জীবন যাপন করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহারাই এই কার্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কর্মফলে দৃঢ় বিশ্বাস সন্তোষ, কারণ হিন্দুমাত্রেই জানে যে, তাহার অদৃষ্ট সে নিজেই করিয়া লইয়াছে। হিন্দুধর্মের প্রধান কয়েকটি ভাব সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল :

শ্রীযুক্ত এন. এন. ঘোষ স্বপ্রণীত মহারাজ নবকৃষ্ণের জীবনচরিত্রে লিখিয়াছেন —"হিন্দুধর্ম কেবল কতকগুলি নীতির সংগ্রহমাত্র নহে, প্রত্যুত ইহা অদৃষ্টের ব্যাখ্যা। ইহা মানুষের উৎপত্তি ও চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অনেক বিশেষ কথাই আমাদিগকে বলিয়া দেয়। ইহা আমাদিগকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ লাভ করিবার ও পরলোকের সহিত সংযোগসাধন করিবার উপায় প্রদর্শন করে।" হিন্দুর চরম লক্ষ্য সুখ নহে,—মুক্তি ; সুতরাং হিন্দুর নিকট ইহজীবন সেই পরিমাণে মূল্যবান, যে পরিমাণে ইহা তাহাকে মুক্তিলাভকাল পর্যন্ত জন্মজন্মান্তর ব্যাপিয়া সেই মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়। চারি জাতির কর্তব্য ও জীবনযাপনের নিয়মাবলী প্রধানতঃ সংহিতাসমূহে নিবদ্ধ আছে। যে সকল ঋষি ঐ সকল সংহিতা প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের নামানুসারে উহাদের নামকরণ হইয়াছে, কিন্তু সাধারণভাবে উহারা 'স্মৃতি' নামে পরিচিত।

কখন কি ভাবে জাতিভেদ প্রথম প্রচলিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। * হিন্দুধর্ম কর্মসাধন বিষয়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম নামে অভিহিত। শ্রীযুক্ত এন. এন. ঘোষ লিখিয়াছেন,—"হিন্দুজাতির প্রথম চারি শ্রেণী বিভাগের সময় ব্যবসায়ের বিভিন্নতা অপেক্ষা নৈতিকপ্রকৃতির বিভিন্নতার উপরই অধিক নির্ভর করা হইয়াছিল। জাতিভেদের বাহ্যভাব দেখিলে, ব্যবসায় ভেদই ইহার মূল বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি ও চরিত্রের ভিন্নতাই ইহার মূল। বিভিন্ন জাতির ভেদসূচক রেখা অতীব দৃঢ়তার সহিত নির্ধারিত হইয়াছে। পিতার জাতিই পুত্রের জাতি। পুরাকালে যখন হিন্দু রাজারা রাজত্ব করিতেন, এবং ঋষিরা বিধিপ্রণয়ন ও প্রয়োগ করিতেন, সে সময়ে যাহাই ঘটিয়া থাকুক না কেন, ইহা নিশ্চিত যে, আজি কেহই এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে নীত হইতে পারে না, বা কেহ স্বয়ং ইচ্ছা বা চেষ্টা করিয়া এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে যাইতে পারে না। হিন্দুরা মনে করে, মানুষের জাতি তাহার পূর্বজন্মকৃত কর্মের অবশ্যম্ভাবী ফল, এবং তাহাদের বিশ্বাস এই যে, মানুষ ইহজন্মে যেভাবে জীবন যাপন করিবে, তদনুসারে পরজন্মে তাহার জাতি নির্ধারিত হইবে। জাতিভেদই হিন্দু-সমাজনীতির মূল।

মোটামুটি বলিতে হইলে, এমন কোনও রাজ্য এ পর্যন্ত দেখা যায় নাই, যেখানকার অধিবাসীরা কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞান ও সভ্যতা লাভ করিয়া পরিণামে

* ঋগ্বেদে জাতিভেদপ্রণালীর উল্লেখ আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, খ্রীষ্টের জন্মের ৩০০০ বৎসর পূর্বে ঋগ্বেদ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দুরা বলেন, ইহা অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

আপনাদের শ্রেণীবিভাগের বা জাতিভেদের উপকারিতা উপলব্ধি করে নাই। ধর্মই সকল স্থলে এরূপ শ্রেণীভেদের মূল নহে। মূল যাহাই হউক না কেন, শ্রেণীবিভাগ বা জাতিভেদ সর্বত্রই যে হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। লোকের প্রবৃত্তি বা অবলম্বিত বৃত্তিই 'এই শ্রেণীবিভাগের প্রধান কারণ। রাজাও এই শ্রেণীবিভাগের সামান্য কারণ নহে, যেহেতু স্বীয় প্রজাবর্গের সামাজিক ভাবের পরিবর্তন করিবার রাজার বিশিষ্টরূপ ক্ষমতা আছে। রাজার এই বিশেষ ক্ষমতার পরিচালন দ্বারা ইউরোপীয়সমূহের কিরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান ও বর্ণনা করিতে হইলে বর্তমান প্রবন্ধের আকার আয়তন বহু পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। সেইজন্য সে চেষ্টায় ক্ষান্ত হইতে হইল। হিন্দু ও অন্যান্য সভ্য জাতি সৎকার্যের সমাদর করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সকল কার্যের পুরস্কার নির্ধারণে তাঁহাদের বিলক্ষণ মতভেদ দৃষ্ট হয়। হিন্দুমতে, মানুষ সৎকার্য দ্বারা পূর্বজন্মে (ইহ জন্ম নহে) উচ্চতর ও বিশুদ্ধতর পদলাভের অধিকারী হয়। সেইজন্যই অদ্যাপি দেখা যায় যে, শূদ্র অতি উচ্চপদ ও ধনসম্ভোগ করিলেও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক সম্মান প্রাপ্ত হয় না।

রুশিয়ার নিহিলিস্টদিগের উত্থান, ১৮০০ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্সের বলক্ষয়-কর সামাজিক বিপ্লব ও অরাজকতা প্রভৃতি ইউরোপের বিষম সমাজ-বিপ্লবের ন্যায় কোনরূপ বিপ্লবসূচক গোলযোগ যে আমাদের দেশে ঘটে নাই, ইহাই সুখের বিষয়। পাশ্চাত্য সমাজনীতির গুণ ইউরোপের সামাজিক জীবনের বিবিধ জটিল অবস্থায় ইতোমধ্যেই প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

শিল্পবিজ্ঞানের সহায়তায় ও ধনদ্বারা সভ্য সর্বপ্রকার সুখ ও ভোগবিলাস সংগ্রহ করাই পাশ্চাত্যদিগের চরম লক্ষ্য। প্রাচীন হিন্দুদিগের লক্ষ্যের সহিত কি বৈষম্য! হিন্দু সাংসারিক সুখদুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন। কিরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়, কিরূপে পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিরূপে পরব্রহ্মের সহিত যোগ সাধন করা যায়—এই সমস্তই তাহার চরম লক্ষ্য। এই প্রাচীন আদর্শ হইতে অধঃপতনের কথা ভাবিতে চিত্ত বিষাদময় হইয়া উঠে। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সমাজের মূলভিত্তি ক্রমশঃ শিথিল হইতেছে। বর্ক সত্যই বলিয়াছেন: "যে আঘাতে প্রাচীন আচার-ব্যবহার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা অপেক্ষা ভয়ের কারণ আর কিছুই হইতে পারে না। প্রাচীন মত ও সংসারনীতি অপনীত হইলে যে ক্ষতি হয়, তাহার পরিমাণ নির্ধারণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেই মুহূর্ত হইতে আমাদিগকে শাসনে রাখিবার যন্ত্র আমরা হারাইয়া বসি।"

প্রকৃত হিন্দুর জীবনে কি উচ্চ আদর্শ, কি মহান্ আত্মত্যাগ, কি উদার ও স্বর্গীয় চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে! শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্নিময়ী ভাষায় বলিয়াছেন—"রাম ও যুধিষ্ঠির অপেক্ষা মহত্তর চরিত্র আমরা কোথায় পাইব? রামায়ণ ও মহাভারতে যে নীতি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তদপেক্ষা উচ্চতর উপদেশ আমরা কোথায় পাইব? সত্যপালনের পুণ্য, মাতাপিতার আদেশ-

পালনের কর্তব্যতা, অবশ্য কর্তব্য কর্মসমূহের সম্পাদনের আবশ্যকতা, পাতিব্রত্যের শ্রেষ্ঠ পুণ্যজনকত্ব, সত্যের পবিত্রতা, মিথ্যা-কথনের উৎকট পাপ, এই সমস্ত বিষয় এরূপ চিত্তদ্রাবকভাবে ওজস্বিনী ভাষায় উপদিষ্ট হইয়াছে যে, যাহারা নিতান্ত অমনোযোগের সহিত রামায়ণ পাঠ করে, তাহাদের মনেও উহাদের ভাব গভীর-রূপে অঙ্কিত হইবেই হইবে। পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—"সংসারে মিথ্যাবাদীর স্থান হয় না।" রামায়ণকার ইহার অনুমোদন করিয়া স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাম অগস্ত্যমুনির আশ্রমে যাইয়া যৎকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, সেইসময়ে মহর্ষি বলেন,—"মিথ্যাবাদী পরলোকে আপনার মাংস আপনি খাইয়া থাকে।"

এইরূপ একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, বুদ্ধদেব যৎকালে স্বীয় আশ্রমে ধ্যান-মগ্ন, সেই সময়ে একটি বিধবা তাঁহার নিকট যাইয়া আপনার মৃত পুত্রের পুনর্জীবন প্রার্থনা করে। বুদ্ধ বৃদ্ধাকে উত্তর করেন, যে বাটিতে মৃত্যু প্রবেশ করে নাই, সেই বাটি হইতে তুমি যদি কিঞ্চিৎ সরিষা আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমার পুত্রের পুনর্জীবন লাভের উপায় হইতে পারে। বৃদ্ধা সানন্দে চলিয়া গেল, কিন্তু সেরূপ বাটি কোথাও খুঁজিয়া পাইল না। তখন সে হতাশ হইয়া বুদ্ধের নিকট প্রত্যাগত হইল এবং নিবেদন করিল যে, যে বাটিতে কেহ কখনও মরে নাই, এরূপ বাটি সংসারে নাই। যেরূপ মৃত্যু-বর্জিত বাটি নাই, সেইরূপ দোষ-বর্জিত সমাজও নাই। সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিলে সকল সমাজেই দোষ বাহির করিতে পারা যায়। পরন্তু ছিদ্রান্বেষণ অপেক্ষা গুণগ্রাহিতা অধিকতর হিতকর।

যে সমাজ নানাপ্রকার বিপ্লব ও কালের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া দণ্ডায়মান আছে এবং যে সমাজে সংসারের সকল বিভাগেই বহু সুপ্রসিদ্ধ লোকের উদ্ভব হইয়াছে, সে সমাজ নিতান্ত হেয় হইতে পারে না। হিন্দুসমাজ বহু অগ্নিপরীক্ষা অতিক্রম করিয়াছে। পুনঃপুনঃ বৈদেশিক আক্রমণে সমাজের স্বাভাবিক উন্নতি বহু পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছিল। পরন্তু ঐ সকল আক্রমণ সত্ত্বেও হিন্দুসমাজ আপনার জীবন অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। ধর্মের বিশেষত্বই ইহার জীবন ধারণশক্তির মূল। ধর্মই এ দেশের সমাজ গঠনের মূলভিত্তি,—ধর্মই হিন্দু-জাতিকে প্রাচ্য জাতিসমূহের মধ্যেও অতুলনীয় ও স্বতন্ত্র করিয়াছে। সুতরাং আমাদের সমাজতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে ধর্মতত্ত্বের আলোচনা স্বতঃই আসিয়া পড়ে। ভারতের ইতিহাসের একটি আশ্চর্য ঘটনা এই যে, মুসলমানেরা হিন্দুস্থানের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইবার পূর্বেই বৌদ্ধধর্মের সহিত হিন্দু-ধর্মের বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছিল এবং হিন্দুধর্ম আপনার প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মুসলমানদিগের অভ্যুদয় ও উন্নতি-জগতের ইতিহাসে একটি মহা সঙ্কটকাল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কারণ প্রাচীন ও আধুনিক জগতের মধ্যবর্তী অন্ধকারময় যুগের প্রারম্ভ মুসলমানদিগের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটিয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই বিষম সঙ্কটকালে ভগবৎ প্রেরিত কয়েকজন মনীষী হিন্দুসমাজে আবির্ভূত হইয়া হিন্দুদের আচার-ব্যবহার

ও কার্যপ্রণালী নির্দিষ্ট করিয়া দেন। প্রেস্কট যথার্থই বলিয়াছেন যে, "মুসলমানেরা বন্যার ন্যায় আপতিত হইয়া প্রাচীন সভ্যতা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল ও তাহার চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত করিয়াছিল।" ঐ সময়ে প্রাচীন ভূমণ্ডলের অর্ধাংশ ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। একমাত্র ভারতবর্ষই অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনার বিশেষত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। জাতিভেদ প্রণালীর গুণে গ্রাম্য-সমিতিসমূহ সমাজে এক একটি ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্ররাজ্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। ইসলামধর্মের শক্তি এই সুদৃঢ় গঠনপ্রণালী ভেদ করিতে পারে নাই। এই প্রথার গুণে যে সহিষ্ণুতাশক্তি বিকশিত হয়, তাহাই হিন্দুচরিত্রের মূল; উহারই বলে হিন্দুরা অগ্নি ও তরবারির গতিরোধে সমর্থ হইয়াছিল। হিন্দুকে 'মৃদু-প্রকৃতি' বলা হয় বটে, কিন্তু উহা নিন্দাসূচক নহে। কারণ হিন্দু, পরদ্রোহী নহে,—হিন্দু স্বধর্মে অটল ও ক্লেশসহিষ্ণু।

ভূয়োদর্শন দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, অনুকরণ সকল স্থলে সমাজের উন্নতি ও সুখ সাধনের কারণ হয় না,—উহা সকল সময়ে আমাদের উপকারজনক হইতে পারে না। লোকে যথার্থই বলিয়াছেন,—"বীজ উপযুক্ত মৃত্তিকা পাইলেই অঙ্কুরিত হয়; মনোমুগ্ধকর নীতি ও সিদ্ধান্ত পাইলেই লোক অনেক সময় তাহা অবলম্বন করিয়া বসে, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে বলিবার যে অনেক কথা আছে, তাহা ভুলিয়া যায় এবং যে সমস্ত সুযুক্তি দ্বারা তাহারা রক্ষিত ছিল, তাহা অগ্রাহ্য করে।" অতএব কোনও নূতন বিষয়ই সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা করা উচিত নয়, পরন্তু সমাজের বিশেষ বিশেষ ভাবগুলি প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য। এ সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলার যাহা বলিয়াছেন, তাহা বড়ই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলিয়াছেন,—"যাহারা আপনাদের অতীত ইতিহাসে ও সাহিত্যে গৌরব বোধ না করে, তাহারা আপনাদের জাতীয় চরিত্রের প্রধান অবলম্বন হারাইয়া বসে।"

অন্যান্য সকল সমাজের ন্যায় আমাদের সমাজেরও কতিপয় বিষয়ে সংস্কার আবশ্যক। উপরন্তু আশা করি, এই সংস্কার-সাধনে, এ স্থলে যে সকল মূলনীতি সংক্ষেপে আলোচিত হইল, তাহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইবে না, অথবা এ বিষয়ে কোনরূপ হঠকারিতা প্রদর্শিত হইবে না, কিংবা অবস্থার কথা সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কোন বিষয়ের ধ্বংসসাধন করা হইবে না।